(গল্প-ভারতী)

শীতের অর্ঘ্য

T59.6
005

গল্প-ভারতী

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

24

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

সম্পাদক
শ্রীমৃগেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

C.U.L

প্রকাশক
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
ভারতী সাহিত্য ভবন লিঃ
২৭৮বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা

মূল্য—তিন টাকা বার আনা

152980

মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
কাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৩।৫, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গল্প-ভারতী সহায়ক সমিতি

গল্প-ভারতীর অগণন পাঠকবর্গকে আনন্দের দিতে জানাইতেছি যে, গল্প-ভারতীর অনেকগুলি ঘাটতি দেখা দিয়াছে। এই প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীর সহযোগিতা আমরা লাভ করিয়াছি। গল্প-ভারতীর সহায়ক সমিতির মুখবন্ধের জন্য, আমাদের আর দুইটি কৃতী লেখক লিখিতে পারিয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিতেছি। সুতরাং বর্তমানে গল্প-ভারতীর সহায়ক-সমিতি নিম্নলিখিত মুখবন্ধের দ্বারা পুনর্গঠিত হইল—

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, ডি-ফিল (অক্সফোর্ড)
,, অশোক সাহানী, পি-আর-এস
,, অবিনাশ ঘোষাল
কালিদাস নাগ, ডি-এট্-লিট্ (প্যারিস)
,, পশুপতিনাথ মিত্র, এম্-এ, ডক্টরেট রাষ্ট্রতত্ত্ব অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, নরেন্দ্র দেব,
,, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
,, বনফুল
,, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক মুকুল
,, বেণীমাধব বড়ুয়া, ডি-লিট্
,, রাধাবিনোদ পাল, ডি-এস
,, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-এইচ-ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-লিট্ (প্যারিস)
,, সজনীকান্ত দাস, সম্পাদক, শনিবারের চিঠি
,, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক, উদয়াচল
,, সরোজকুমার রায় চৌধুরী
,, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পি-এইচ-ডি

—এই গ্রন্থে আছে—

১। [illegible]	[illegible]
২। [illegible]	[illegible]
৩। [illegible]	[illegible]
৪। এক্‌খানি চিঠি	[illegible]
৫। [illegible]	[illegible]
৬। [illegible]	আশাপূর্ণা দেবী
৭। পরদেশী	যতীন্দ্রনাথ মিত্র
৮। শক্তি তত্ত্ব	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৯। [illegible]	নরেন্দ্র দেব
১০। অপরাজিতা	গীতা দেবী
১১। স্বাধীনতার সন্ধান	ফাল্গুনী দাস
১২। অবচ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩। বিলাতীর	অমরেন্দ্রকুমার মিত্র
১৪। ছাড়াছাড়ি	সুবোধ বসু
১৫। পতিতারীতে	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
১৬। [illegible] পথে	অশোক চট্টোপাধ্যায়
১৭। [illegible] আসর	সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
[illegible] (উপন্যাস)	ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
[illegible] স্মৃতি	রামনাথ বিশ্বাস

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র

"বিশ্ববাণী"

আগামী ফাল্গুন মাস হইতে "বিশ্ববাণী" নব বর্ষে পদার্পণ করিল। এই নূতন বছর হইতে বিশ্ববাণী পরিবর্তিত আকারে সুন্দর আর্ট ছাপার পৃষ্ঠার প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতে চলিল। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, মূর্তি-শিল্প, সঙ্গীত, ধর্মতত্ত্ব, জীবন-চরিত, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিদ্বান্ গবেষণা ও মনীষী পূজিত ব্যক্তিদের আলোচিত প্রবন্ধ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া ইহা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের তথ্যপূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যান এবং তাঁর অপ্রকাশিত ইংরাজী-বাংলা রচনাবলী ও পত্রাবলী 'বিশ্ববাণী'র বিশিষ্ট সম্পদ। ইহা ছাড়া দেশবিদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের রহস্যময় ও ইউরোপের বিচিত্র ঘটনাবলীপূর্ণ অপ্রকাশিত জীবন-কাহিনীও ইহার পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করিবে।

বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা ঃ ষাণ্মাসিক দুই টাকা ঃ প্রতি সংখ্যা ছয় আনা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"বিশ্ববাণী"

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বাপুজী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাপুজী,

যমুনা-তটে তোমার চিতাগ্নি-শিখার দিকে চাহিয়া বাংলা-দেশের একজন সাহিত্য-সেবী তোমার আত্মার উদ্দেশ্যে তাহার অন্তরের নতি জানাইতেছে।

আজ যেখানে মৃত্যু-বাণ-বিদ্ধ হইয়া তোমার তপস্যা-পূত দেহ ভূমি-শয়ন লইয়াছে, বহু বহু শতাব্দী আগে, সেই ভূ-খণ্ডেই ভারত-ইতিহাসের পূর্ব-অভিব্যক্তির রূপক-স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেইখানেই একদা এক পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভারতের আদি মহা-কবির ধ্যানকে সফল সার্থক মূর্তি দিবার মহাপ্রয়াস করেন। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ধর্মের বন্ধনে, এক কল্যাণের বন্ধনে এক মহা-ভারত রূপে তিনিই প্রথম রূপ দিবার মহৎ আয়োজন করেন। তাঁহার সেই ধ্যানের মহা-শ্রীরত, পুরুষোত্তমের সেই সাধনার মহা-ভারত, তাহাই হইয়া ভারত-ইতিহাসের চরম ভবিতব্যতা। বহু যুগ ভারতবর্ষ চেষ্টা করিয়াছে সেই চরম ভবিতব্যতাকে সার্থক করিয়া তুলিতে, পারিবার সে আজ হইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষের ইতিহাস বাহিরের শত-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজেও

নিজের সেই পরম সত্তাকে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই। বিংশ-শতাব্দীতে তুমিই পুনরায় ভারত-ইতিহাসের সেই খণ্ড প্রাণ-মূর্ত্তিকে নিজের ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছ; বাহিরের শত প্রলোভন শত মোহ, শত বিরোধকে অস্বীকার করিয়া একমাত্র তুমিই ভারত-ইতিহাসের সেই মর্ম্ম-সত্যকে, বেদ-ব্যাসের সেই আদি-স্বপ্নকে, পুরুষোত্তমের সেই অসমাপ্ত সাধনাকে বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে। তাই, তোমার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতের অতীত জীবন আজ ইতিহাসের অনিশ্চয়তার কাল-সমুদ্র পার হইয়া, এক সম্পূর্ণ-সুন্দর সমগ্র মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের প্রাণ-বস্তুকে তুমি প্রলয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ, হে মহা-ভারতের শেষ স্বপ্ন-দ্রষ্টা, তোমাকে প্রণাম।

বাপুজী,

তাই তুমি ছিলে শুধু একটী যুগকে পরিব্যাপ্ত করিয়া নয়। তুমি ছিলে একটা সমগ্র ইতিহাসকে পরিব্যাপ্ত করিয়া। তাই তোমার জীবনের মধ্য দিয়া তোমার পূর্ব্ব-বর্ত্তী ভারত-পথের মহা-পথিকদের সকলের পদ-ধ্বনি ধ্বনিয়া উঠে। সেই বিরাট তীর্থ-যাত্রীদলের মধ্যে তুমি ছিলে তাঁহাদের শেষ-প্রতিনিধি; তাই তুমি তোমার স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিলে ভারত-ইতিহাসের সেই সব পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের অসমাপ্ত দায়িত্বের ভার...পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুগের, সকল শতাব্দীর, সকলের আশীর্ব্বাদকে একটী জীবনের পরিপূর্ণ পাত্রে তুমিই কুড়াইয়া সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলে আমাদের জন্য। তোমার মধ্য দিয়া তাই আমরা আবার দেখিলাম, নিরঞ্জনা-তীরে বোধি-দ্রুম মূলে সিংহাসন-ত্যাগী রাজার কুমারের মানবের-দুঃখ-হরণের জপ, তোমার মধ্য দিয়া দেখিলাম, কলিঙ্গের রণক্ষেত্রের রুধির-প্রবাহের মধ্যে মহারাজ অশোকের করুণাশ্রুধারাপ্লুত দিব্যানন, তোমার বাণীর মধ্য দিয়া আবার শুনিলাম জগতের সেই দিগ্বিজয়ী রাজার অস্ত্র-সাধনার বৃহৎ ভুলের মহৎ আত্ম-স্বীকার বাণী, ইতিহাসের জীর্ণ পাতার আড়ালে স্বচক্ষে আবার দেখিলাম, ভারতের দিকে দিকে অবিনাশী পর্ব্বত-গাত্রে আবার লিখা হইতেছে নূতন অক্ষরে অশোকের অনুশাসন-লিপি, বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী...দেখিলাম, প্রয়াগে, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন-তীরে পুনরায় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন দানে নিজেকে রিক্ত করিয়া দিয়া ভগ্নীর নিকট হইতে পীত পরিধেয় বসন ভিক্ষা করিয়া লইতেছেন···দেখিলাম, শাণিত অস্ত্র লইয়া নয়, জীর্ণ তালপাতার পুঁথি হাতে লইয়া, ভারতের সৈনিকের দল নয়, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ জ্ঞানভিক্ষু নগ্নপদে হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে, চীনে, জাপানে আবার চলিয়াছেন ভারতের সহিত নূতন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, শুনিলাম আবার ভারতের মধ্য-যুগের মিলন-প্রয়াসী সাধকের দল, কবীর, দাদু, মীরা, নানক, নূতনকরিয়া মিলনের দোঁহা রচনা করিতেছেন; দেখিলাম

আবার শ্রীচৈতন্য তাঁহার পার্শ্বচরদের লইয়া ভয়বিক্ষুব্ধ ভারতের পথে পথে চলিয়াছে নাম-সংকীর্তনে প্রেমের অভয়-বাণী বিতরণ করিয়া···দেখিলাম, পাশ্চাত্যের বস্তু-স্রোতে, পরানুগ্রহ, পরানুকরণ আর পরধর্মিতার অন্ধকারে পুনরায় রামমোহনের আত্মমর্যাদা-দীপ্ত বলিষ্ঠ উন্নত ভঙ্গী, শুনিলাম দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে সর্ব-বিভেদের অন্তরে মানব-ধর্মের অবিরোধ সত্তা স্বর, বেলুড়ে গঙ্গার তীরে অস্পষ্ট বাতাসে শুনিলাম বিবেকানন্দের শেষ দীর্ঘশ্বাস, শুনিলাম তোমার জীবনের প্রতিটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সেই মহাপুরুষের আচণ্ডাল মানবকে সমাধিকারের মহা-আহ্বান, নর-রূপী নারায়ণের সেবা-ব্রতের অমর-বাণী। দেখিলাম তোমার জীবনে ভারতের মহাকবির আরব্ধ সেই বিশ্ব-মৈত্রী-যজ্ঞের হবি-পুষ্ট শিখা, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এক আকাশের চন্দ্রাতপতলে সেই কোন দিক্-ভেদ,—বাপুজী, দেখিলাম তোমার একক জীবনে ভারত-ইতিহাসের সেই পূর্ব-পূর্ব সকল শতাব্দীর, সকল যুগের, সকল যুগ-নায়কের একটী সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি, ভারত-সাধনার দিব্য সম্পূরক-মূর্তি তুমি, তোমাকে প্রণাম।

বাপুজী,

জাগতিক ক্ষেত্রে শতাব্দীর অনাচারে আর অভিশাপে ভারতবর্ষ যে মর্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, যে-আত্মসম্মান-বোধ ভারতবাসী ভুলিতে চলিয়াছিল, তোমার একক জীবনে তুমি তাহা ফিরাইয়া আনিয়াছ, অসীম রিক্ততার দৈন্য সত্ত্বেও ভারতবাসীরূপে আমাদের মর্যাদাকে তুমি অতল-অন্ধকার-গহ্বর হইতে বারে বারে উদ্ধার করিয়া বিশ্ব-জগতের স্বীকৃতির দিবালোকে তুলিয়া ধরিয়াছ, ভারতের মর্যাদার মানদণ্ড তোমার জীবন, তোমাকে প্রণাম।

বাপুজী,

হিংসার প্রতিযোগিতায় অন্ধ জগৎ মরণ-বাঙন মত্ততায় যখন তাহার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া শুধু আত্মধ্বংসেরই অস্ত্র নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে, তুমিই একমাত্র জগতের সমস্ত উপহাস আর বিদ্রূপকে মাথায় বহন করিয়া সেই বীভৎস ক্রম-বর্ধমান হত্যার প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য মানবের হাতে দিয়া গিয়াছ নূতন অস্ত্রের সন্ধান, যাহার প্রয়োগে রক্ত-স্নাতা ধরণী আবার একদিন ফিরিয়া পাইবে তাহার শান্তি-শুভ্র উষা-মূর্তি, মানব-সভ্যতার সেই মহা-অপঘাত-সঙ্কট সমগ্র বিশ্ব-মানবতাকে তুমি সজাগ করিয়া তুলিয়াছ, তোমাকে প্রণাম।

বাপুজী,

মানব-সভ্যতার সনাতনী এই আর্য্য-ভূমি, যাহাকে আজ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া আমরা জানি, যে সার্ব্বভৌম, বহু জন্মের বহু-সেবার আড়ালে যাহার অবিনাশী প্রাণ-বস্তু ক্রমশ দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছিল, যাহার চিরন্তন উৎস-মুখ সাময়িক আচার ও অনুষ্ঠানের উপল-খণ্ডে শুকাইয়া আসিতেছিল, সেই চিরশিশু সব-ভাবে-সহ সর্ব্বাত্মীয় ধর্ম্মকে তুমি তোমার সাধনার শতাব্দীর ক্লেদ-মুক্ত করিয়া পুনরায় বসুধিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তাই, একদা যাহারা চৈতন্যকে অহিন্দু বহিষ্কার চিঠি মারিয়াছিল, রামপ্রসাদকে মাতাল বলিয়া সমাজ-চ্যুত করিয়াছিল, রামকৃষ্ণদেবকে পাগল বলিয়াছিল, বিবেকানন্দকে ফিরিঙ্গী সন্ন্যাসী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মের সেই দুষ্ট-ব্রণেরাই পুনরায় অহিন্দু বলিয়াই তোমাকে হত্যা করিল…

মৃত্যু- বিলুপ্তমান চৈতন্যের মধ্যেও তুমি তাঁহাদের জন্যই তোমার আরাধ্য দেবতার নাম স্মরণ করিয়া কৃষ্ণলীলা-পুটে নির্বাক ক্ষমা চাহিয়া গেলে, হে আত্মসমর্পণ-যোগী, হে আর্য্য-শ্রেষ্ঠ, তোমাকে প্রণাম

বাপুজী,

আজ যে-যুগ-সন্ধিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার মূল প্রেরণাগুলি বিজ্ঞান আর প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতির নৈতিক মূল্যের, জীবনের প্রতিদিনের দেনা-পাওনা হইতে বহিষ্কার-করিয়া দিতে চলিয়াছে : [illegible], তিতিক্ষা, ক্ষমা, সারল্য, সত্যবাদিতা আজ শুধু শিশু-শিক্ষার পুঁথির পাতাতেই আবদ্ধ, বিংশ-শতাব্দীর অতিবিজ্ঞ নাগরিকদের উপহাসের বস্তু, প্রাচীন পৃথিবীর অপ্রচলিত মুদ্রার মতন আজিকার জীবনের বাণিজ্যের ব্যাপারে তাহার আদান-প্রদান অচল। আজ বাহিরে যাহাকে বলি ভাল মানুষ, অন্তরে তাহাকে "বোকা" বলিয়া করুণা করি। এই বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক বৈশ্যবৃত্তির বিরুদ্ধে, জগতের উপহাসকে মাথায় লইয়া, জীবনের প্রতিদিনের কাজে তুমি সেই আদিম নৈতিক মূল্যকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছ এবং দেখাইয়াছ, জগতের দেনা-পাওনার বাজারে এখনো তাহাদের ব্যবহারিক মূল্য এতটুকুও কমে নাই। বাপুজী, তোমার প্রতিদিনের প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজের মধ্য দিয়া তুমি জগতের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে এক নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছ, তাহা দিন নয়, জীবনের প্রতিটী জীবন্ত মুহূর্ত্ত দিয়া তোমার নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর [illegible] লইয়া তুমি মহাকবি রূপে গড়িয়া তুলিয়াছ, হে জীবন-কাব্যের মহাকবি, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

বাপুজী,

একদিকে জ্ঞানশক্তি, অন্য দিকে বিজ্ঞানের নব নব আয়ুধ, একদিকে পরাধীনতা, অন্য দিকে পুরস্কারপরবশ, একদিকে লক্ষ-ভরা-ক্ষেত, অন্যদিকে পেটভরা সুঠন, একদিকে ভয়, অবিশ্বাস আর ব্যর্থ আক্রোশ, অন্যদিকে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য আর আত্মতৃপ্তি। পূর্ব আর পশ্চিমের সম্বন্ধ যেখানে ঘৃণায় বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে, সেখানে তুমি পশ্চিমের সমস্ত উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াও, আধিপত্য জাতিতে অক্রোধ আর মৈত্রীর অলিখিত চুক্তিকেই বিশ্বত্রাণের একমাত্র উপায় স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছ···তাই যাহাদের হাত হইতে এতবড় সাম্রাজ্য সংগ্রাম করিয়া অর্জন করিলে, তাহাদের মধ্যেই গড়িয়া তুলিলে তোমার মৈত্রী-গোষ্ঠি। বাপুজী, জয় হইতে তুমি কাড়িয়া লইয়াছ বিজয়ের দম্ভ, সংগ্রাম হইতে কাড়িয়া লইয়াছ শত্রুতার প্রতিযোগিতা, তাই তোমার কুরুক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অক্ষৌহিণী রহিল অটুট, নিজেকে শুধু দিলে বিসর্জন। জগতের রণ-নীতির হে মহাসংস্কারক, তোমাকে প্রণাম।

প্রণাম তোমাকে হে আর্য্য শ্রেষ্ঠ।
প্রণাম তোমাকে হে ভারত-শ্রেষ্ঠ।
তোমাকে প্রণাম হে মানব-শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ—

আততায়ীর দিক্‌নলের হত্যার পর একদিন আর্ল মাউন্টব্যাটেন মহাত্মাজীর রেকাবগঞ্জ গৃহ-আঙিনায় তিন তালগাছের দেখা পান। আততায়ী গুরুকে বিশ্বাস করেন, খুব সংগোপনে অনুসরণ করে, তেন এতো লোকে দিক্‌নলের দলে অন্তর্ভুক্ত করে।

যুদ্ধ উত্তর দিয়েছিল, অহিংসাই, He was Humanity!
এমনই ভারতবাণী আজ [illegible] এই উপমায় পরিচয় করে।

শেষ-আবির্ভাব

(১)

যমুনার তীরে রাজঘাটে চিতাগ্নির শিখা ক্রমশঃ নিভে এলো। শোক-বিমূঢ় জনতা একে একে যে-যার ঘরে আবার ফিরে গেল। শেষ-রাত্রির শিশির-সিক্ত অন্ধকারে একা বসে আছি, শুনছি, একটানা একটা অস্পষ্ট কান্নার ধ্বনি। শুনতে শুনতে কখন অভ্রান্তঃ হয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নতুন জায়গায় বসে আছি। দিন কি রাত, কিছুই বুঝতে পারছি না। আলো-অন্ধকারে-মেশানো এক অদ্ভুত আবছায়া চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে আছে। বহুদূর দৃষ্টি যায়, দৃষ্টিকে ব্যাহত করবার মত কোন কিছু চোখে পড়ে না। মাথার ওপর বিরাট ছাতির মতন ঘন কালো আকাশ, নেপথ্যীন মহাশূন্যতা। তার সুদূরতম প্রান্তে, অনেক বড় হীরের টুকরোর মতন কি একটা ঝিলিক। চারিদিকের সেই নিরাবয়ব স্থির অস্পষ্টতার মধ্যে শুধু তারই আলোক-কম্পন গতির স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

আপনার মনে বিস্মিত হয়ে ভাবছি, এ কোথায় এলাম? সামনের ঐ দীপ্যমান হীরকখণ্ডটুকুই বা কি? এমন সময় শুনি খুব কাছেই কে যেন আমার অন্তরের সেই প্রশ্নের কথা জানতে পেরে উত্তর দিয়ে উঠলো, ঐ যে দেখছো, মসী-কৃষ্ণ শূন্যতার বুকে জ্বলছে হীরকখণ্ড···ঐ হলো তোমাদের পৃথিবী!

—তোমাদের পৃথিবী?

—হাঁ, তোমাদের পৃথিবী···একদিন আমরাও ছিলাম ঐ পৃথিবীর অধিবাসী···কিন্তু আজ আর নই!

বিস্মিত হয়ে দেখি, সামনে এক মানব-মূর্তি, মানুষ বলে চিনতে একটুকু দেরী হয় না, তবুও কেমন যেন মনে হয়, ও-দেহ যেন-মাংস দিয়ে গঠিত নয়।

—বিস্মিত হচ্ছো? একদিন তুমিও আমাদের মতন এই নতুন দেহ পাবে। মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের দেহ ত্যাগ করে প্রত্যেক মানুষকেই এই সূক্ষ্ম শরীরে কিছুকাল বাস করতে হয়। বড় যন্ত্রণাদায়ক এই অতিথি! আমাকে-তোমাকে-এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তা জানি না, জানবার কোন উপায়ও নেই।

—কতকাল এই দেহ ধারণ করে আছ?

—প্রায় এক হাজার ন'শো বছর···এই দীর্ঘকাল ধরে আমরা শুধু তিনটী অশরীরী জীব এই বিরাট মৃত দেশে চিহ্নহীন ভাগ্যহীন অস্তিত্ব বহন করে চলেছি···

—আর সুজন, তারা কোথায়?

—ঐ তো তোমার পাশেই!

পাশে চেয়ে দেখি, ম্লানমুখে দুটী ছায়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম ছায়া বলে, যখন মানুষের দেহ ধারণ করেছিলাম, তখন আমার নাম ছিল, ফুডাস্···

ফুডাসের নাম শুনে চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমিই কি তাহলে যিশুর প্রিয় অনুচরদের মধ্যে···

—হাঁ···আমিই সেই অভিশপ্ত জীব···আর আমার নিত্যসঙ্গী ঐ যে দুজন, একজন হলেন রোমের প্রতিনিধি পন্টিয়াস্ আর অন্যজন হলেন প্যালেস্টাইনের সেই সময়কার ইহুদীদের প্রধান পুরোহিত···এঁরই প্ররোচনায় আমি সোনাকিতক টাকার লোভে, যিনি জগতে আমাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, তাঁকে প্রতারণা করি···

—ফুডাস্! ফুডাস্!

দেখি বৃদ্ধ ইহুদী পুরোহিতের দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠলো। তিনি গর্জন করে উঠলেন কে বেটী পাষণ্ড? তুমি না আমি? আমার অপরাধ, সেদিনকার ইহুদীদের আমি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় হিতৈষী বলে মনে করতাম, তাই তাঁকে বুঝতে পারিনি···কিন্তু তুমি?

—আমি তাঁকেও পারিনি, তুমি আর পন্টিয়াস্ এতখানি নির্বোধ হতে পারবে···এত বড় অবিবেচক হবে যে সামান্য একজন চোরের মুখে তাঁকেও জলে চেরেক দিয়ে বেঁধে ফেলবে।

এতক্ষণ তৃতীয় ছায়া নীরব হয়েই ছিল। ফুডাসের কথায় সে জেগে উঠলো।

—আমিও ফুডাস্, অপরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিজের অপরাধকে লুকোতে চেষ্টা করছো? বার বার তোমাকে বুঝিয়ে বলেছি, আমি না হয়ে যদি রোমের আর কোনও সন্তান সেদিন প্যালেস্টাইনের শাসক হতো, তাহলে সেও ঠিক আমারই মতন বিচার করতো। আমরা রোমান্, তোমাদের ইহুদীদের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোন প্রয়োজনই আমাদের ছিল না। আমি ছিলাম সেখানে শুধু সাম্রাজ্যের শান্তি, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। তাই একজন নিরীহ ছুতোর মিস্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে তোমরা যখন

অন্তর্যামি হে তৈ আরম্ভ করছে, দুর্বেশা আমার প্রাসাদের সামনে এসে চীৎকার করতে সুবিধাবোধ করে, আমি তোমাদের কথা কর্ণপাতও করিনি। বার বার তোমাদের বলেছি, তোমাদের ধর্মের ব্যাপার তোমরা নিজেরাই করে নাও। কিন্তু, এই পুরোহিত, সেদিন ধর্মান্ধতার দিক-বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই নিরীহ লোকটির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনলো···সে নাকি বলেছে, সে-ই তাদের রাজা! আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, প্রবলপ্রতাপান্বিত সীজারের বিরুদ্ধে লড়বে অসহায় সেই ক্ষীণ দুর্বলদেহ লোকটা? কিন্তু তা সত্ত্বেও, তোমরা ইহুদীরা আইনের কথা তুলে বিচারের জন্যে আমাকে যখন উত্যক্ত করে তুলে, তখন পাছে আমার বিরুদ্ধে আমার প্রতিপক্ষরা একটা অভিযোগ খাড়া করবার সুযোগ পায়, সেই আশঙ্কাতেই সেসময়ে আমি বিচার করতে রাজী হই এবং প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারেই আমি বিচার করি···তোর বলি হয়ে থাকে, তাহলে তোর সেই আইন-পদ্ধতির, আমার নয়। তবে হাঁ, আজ আমি বুঝেছি, আমার অপরাধ কোথায়; আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম একজন সামান্য ইহুদীর মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু আর ভাবতে পারিনি···

সহসা সেই ঘুমাবার বছর আগেকার মৃত পৃথিবী এমনভাবে আমার সামনে সজাগ সজীব হয়ে দেখা দেবে, একথা কল্পনাও করতে পারিনি। কি বলবো, ঠিক করতে না পেরে তাদের ছায়ামূর্তির দিকে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছি, এমন সময় পন্টিয়াস্‌ই আবার বলতে সুরু করলো, অপরাধ কার, কর্ম, কার দোষ, তা আজ বিচার করে কি লাভ? ডুডাস্, তোমার পাপের সংস্পর্শেই আজ আমরা তিনজন এই অনন্ত নির্বাসনে সমান-ভাবেই ভোগ করে চলেছি·····জগৎ কোনদিন আমাদের দুজনকে হয়ত ক্ষমা করতে পারে কিন্তু তোমাকে কোনদিন ভুলবে না ডুডাস্!

দেখলাম, ডুডাস্ কোন কথা না বলে নীরবে সেই দীপ্যমান হীরকখণ্ডের দিকে চেয়ে রইলো। হয়ত [illegible] আমি তীব্র আগ্রহ থেকে পন্টিয়াসকে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, আমরা [illegible]

—তা জানি না। প্রত্যেক শতাব্দী শেষ হলে একবার করে স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত এই সব বিভিন্ন পাপ-গ্রহ পরিদর্শন করে যান·····

—এই রকমের তাহলে আরো অন্য সব গ্রহ আছে?

—নিশ্চয়ই। মহাশূন্য কোলে ছোট ছোট দ্বীপের মতন অসংখ্য পাপ-গ্রহ আছে। এক গ্রহের সঙ্গে অন্য গ্রহের একমাত্র যোগসূত্র হলো, শতাব্দীর শেষে সেই দেবদূতের একবার আবির্ভাব। তাঁর মুখ থেকেই তখন অন্য পাপ-গ্রহবাসীদের সংবাদ পাই···

জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তিনি শতাব্দীর পর একবার করে পরিদর্শনে আসেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পন্টিয়াস বলেন, জানি না, তিনিই বা কি উদ্দেশ্য···তবে যুগের পর যুগ থেকে এইটুকুই জানতে পেরেছি, আমাদের আবার পৃথিবীতে নর-রূপে জন্ম গ্রহণ করতে হবে···এবং সেই নর-জন্মে আমার আমাদের সঙ্গে

ভগবান আবির্ভূত হলেন···সেই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়···সেই অমাবস্যার মানব-ভ্রূণে যদি তাঁকে চিনতে পারি···যদি তাঁর ইঙ্গিত মতের সঙ্গে হতে পারি·····

—কিন্তু কবে সে-সময় আসবে ?

—তা জানি না। তবে দেবদূতের মুখ থেকে শুনেছি, সেদিন এই সব বিভিন্ন পাপ-গ্রহবাসী নিজেদের কৃত-অন্যায়ের জন্যে সকলে একসঙ্গে সত্যিকারের অনুতপ্ত হবে···যেদিন পরিদর্শন করতে এসে তিনি দেখতে পাবেন, সকলের মন একই অনুশোচনার তীব্রতায় পুনরায় মর্ত্য-জীবনের কথের মধ্যে নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত হয়েছে, সেইদিনই নাকি আসবে আমাদের, আমাদের মুক্তির আহ্বান···

কৌতূহলের মাত্রা বেড়েই চলে। জিজ্ঞাসা করি, এখনও কি এই সব পাপ-গ্রহবাসীরা অনুশোচনার সে-তীব্রতা অনুভব করে নি ?

—অন্য গ্রহের খবর জানি না কিন্তু আমাদের এই গ্রহের এই আমরা তিনটি প্রাণী, যতই কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি না কেন, পৃথিবীতে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। শুনেছি, পৃথিবীতে নাকি চারিত্রিক থেকে এত অনাচার আজ পর্যায়ে বেড়ে উঠেছে যে, ভগবানের প্রিয় দূতের পুনরাবির্ভাবের সময় হয়েছে আবার···

এমন সময় মনে হলো যেন একটা ভূমূল ঝড় কাছাকাছি কোথাও উঠেছে···তীব্রবেগে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে···

বিস্মিত হয়ে পুটিয়াসের মুখের দিকে চাইতে দেখি, তাঁর মুখ আনন্দে যেন হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আমার জিজ্ঞাসার আগেই তিনি বলেন, স্বর্গ থেকে দূতের আসবার সময় ঠিক এই রকমই আলোড়নের শব্দ হয় কিন্তু এখনও তো সময় হয় নি। আজ, শব্দটাও যেন তীব্রতর মনে হচ্ছে···

পটিয়াসের কথা শেষ হতে না হতে দেখি, অন্ধকার আকাশ ভেদ করে যেন একটা আলোর শিখা বেরিয়ে এলো। সে-আলোতে দৃষ্টি আহত হয়ে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যায়। চোখ খুলতে সামনে দেখি, অসংখ্য ছায়া-মূর্তি...

ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম বলে, তাদের বাইরের চেহারার রেখা থেকে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, তারা বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন শতাব্দীর লোক। মনে হয় যেন, চোখের সামনে দেখছি জগতের পরিচিত ইতিহাসের একটা সজীব সচিত্র সংস্করণ···

সেই ছায়া-মূর্তির অরণ্য থেকে প্রাচীন গ্রীকের মত দেখতে সম্রান্ত-দর্শন এক মূর্তি জুডাসের দিকে এগিয়ে আসে···বলে, তুমিই জুডাস, না ? আমি হলাম সেসিলিয়াস্···শোন নি আমার নাম ?

জুডাস্ ঘাড় নেড়ে জানায়, না।

বেসিলিয়াস্ নিজের পরিচয় নিজেই দেয়, পরিচয় দিতে লজ্জা করে···আমিই এথেন্স সম্রাটদের প্রধান-বিচারক। আমার সঙ্গে, এই তিনজন হলেন, আমার নির্যাতনের নিত্য সঙ্গী, মিলিটাস্, অনিটাস্ আর লাইকন্ এঁদেরই অসাধারণ আইন-জ্ঞান সেদিন সক্রেটিসকে দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী বলে প্রমাণিত করে। আর আমাদের পেছনে দেখছো যে বিরাট দল, সেই দলে আছে গ্রীসের সেই সময়কার বিচার-বিভাগের পাঁচশো একজন লোক, যাঁদের ওপর ভার ছিল ন্যায়-অন্যায় বিচারের।

বিস্মিত হয়ে বলে উঠি, পাঁচশো একজন! একি আদালত, না মেলা বাট?

বেসিলিয়াস্ বলে, তোমরা স্কুলে তোমাদের পাঠ্য ইতিহাসে যেটুকু দেখেছ, তাই পড়ে আমাদের ওপর তোমরা এমন বিরূপ হয়ে গিয়েছ যে, এই দেহ নিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে যেতে রীতিমত ভয় করে। কিন্তু তবুও আমরা যাবো···আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো···তাই আজ মরিয়া হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সকলে মিলে আমরা গিয়ে শরণাপন্ন হবো ব্রহ্ম-লোকের দেবতাদের। তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, আবার আমরা আবির্ভূত হবো পৃথিবীতে···আমাদের অনুশোচনায় আবার ভগবানকে আমরা টেনে নিয়ে যাবো পৃথিবীতে···তাই ভুডাস্, দেবদূতকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের গ্রহে এসেছি। অন্য সব পাপ-গ্রহের অধিবাসী সবলেই এসেছে···বাকি ছিলে শুধু তোমরা···

ভুডাস্ উঠে দাঁড়ায়, আমরাও প্রস্তুত!

বেসিলিয়াস্ দেবদূতকে বলে, তাহলে, বন্ধু, আমাদের নিয়ে চলো ব্রহ্মলোকে।

দেবদূতের চরণে মাথা রেখে আমি বলি, প্রভু, সে-মহাদুঃখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

—আসুন।

(২)

ব্রহ্মলোকের আলোক-প্রাসাদের প্রথম দরজা পেরিয়ে দেবদূত পাপ-গ্রহ-বাসীদের আহ্বান করে বলেন, এইখানে আছেন দেবী ধন···ধন্ অফ আর্ক নামে যাঁকে তোমরা পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিলে···

ছায়া-মূর্তিদের ভেতর থেকে একটী দল বেরিয়ে আসে। কয়েকজন ফরাসী, আর তাদের সামনে জুয়ান্ অফ আর্ক।

তাদের নিয়ে দেবদূত দেবীর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হন।

মঞ্চের অগ্রভাগে যিনি ছিলেন, তাঁকে ডেকে দেবদূত বলেন, বোভে-র বিশপ, সামনেই দেবীর আসন।

চোখ তুলে চাইতেই দেখে, সামনেই দেবী জন। দেবীর পাদদেশে বসে আছেন, সৌম্য-দর্শন একজন ফরাসী। বোভে-র বিশপ অনায়াসেই তাঁকে চিনতে পারেন, তাঁর আদালতে জন অফ আর্কের বিচারের সময় যে-সব জুরার ছিলেন, তাঁদেরই একজন, যাঁহার জন কেরার্ন। জুরারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেদিন বলেছিলেন আইন-অনুসারে জন অফ আর্ক কোন অন্যায় কথা বলেন নি বা অন্যায় আচরণ করেন নি। তাঁকে দেখে বিশপ লজ্জায় মাথা নত করেন। কেরার্ন স্মিতমুখে উঠে এসে বিশপের হাত ধরেন। বলেন, লজ্জিত হবার কিছু নেই, দেবী তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করেছেন!

বোভে-র বিশপ মাথা তুলে করজোড়ে দেবীকে সম্বোধন করে বলেন, দেবী, অনুশোচনার দগ্ধ অন্তরে আজ আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। সেদিন আদালতে ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরা আপনাকে ডাইনী বলে প্রমাণিত করে, তাদের কথায় সায় দিয়ে আমিই আপনাকে পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিই।

বিশপ হয়ত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেছন দিক থেকে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, দেবী, যদিও সেদিন আপনার বিচারে আমি উপস্থিত ছিলাম না তবুও আমারই বই থেকে আইনের নজীর তুলে ওরা আপনাকে অভিযুক্ত করেছিল। সেই অপরাধে ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আজন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

স্মিতহাস্যে দেবী জিজ্ঞাসা করেন, কৈ, আপনাকে তো আমি দেখি নি?

বৃদ্ধ উত্তর দেন, না দেবী, আমিও আপনাকে দেখি নি। হতভাগ্যের নাম সেন্ট টমাস্ এ্যাকুইনাস্, আমার গর্ব ছিল, মধ্যযুগের সমস্ত বিক্ষিপ্ত ধর্ম মতকে একত্র করে, মানুষের ধর্মজীবন সুপরিচালিত করবার জন্যে একটা প্রামাণ্য বিওকথীয় বই লিখবো। লিখেও ছিলাম। কিন্তু সেদিন কল্পনাও করি নি, আমার বই-এর নজীর তুলে ওরা আপনাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবে।

দেবী হেসে বলেন, শাস্তি ওরা দিতেই। তবে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি দিয়ে ওরা বিবেকের দংশন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। ধর্মের এমনি মহিমা যে, এতবড়ও পাপীও তার জঘন্যতম পাপ কাজের জন্য একটা ন্যায়-সঙ্গত অজুহাত খোঁজে। আজ সত্যি আমার হাসি পায়, যখন ভাবি, সেই সময়কার সত্যজগতের দুটো সেরা আক্ত, ইংলণ্ড আর ফ্রান্স, মেয়ে হয়ে আমি পুরুষের পোষাক পরেছিলাম বলে সেদিন আমাকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করলো।

বোভে-র বিশপ স্মিতমুখে বলেন, দাঁড়ালো, সেদিন বুঝতে পারি নি, একটা যুগের ধর্মবিশ্বাস বা অন্ধত্ব জগতের চলমান জীবনের ইতিহাসে তার স্থান কতটুকু। সেদিন তাই ফ্রান্সের অন্যতম প্রধান বিচারক আমি সত্যি সত্যি মনে করতাম, মেয়েমানুষ হয়ে আপনি যে পুরুষের পোষাক পরে থাকেন, সেটা একটা ঘোরতর অপরাধ।

দেবী হেসে বলেন, তবুও বিচারের শেষ দিকে কারাগারে আমি আমার পোষাক পরিবর্তন করে মেয়েদের পোষাকই পরি।

ফ্রিদা বলে ওঠেন, সে-কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আদালতে সওয়াল-জবাব শেষ হয়ে গেলে, শেষবারের মতো আপনার মত পরিবর্তিত হল কি না জেনবার জন্যে আমি কারাগারে আপনার সঙ্গে দেখা করি। চুকেই আপনার নারী-বেশ দেখে আমার মনে আনন্দই হয়, বিশ্বাস করুন।

—যা পরিবর্তন করলে কিছু যায় আসে না, তা আমি পরিবর্তন করবো না কেন? কিন্তু সেই সঙ্গে তোমরা চাইলে, যা আমার অন্তরের ধর্ম, অ-পরিবর্তনীয়, তাকেও পরিবর্তন করতে···তাতে আমি রাজী হবো কেন?

—কিন্তু যা বিশ্বাস করুন, আজ আর বলতে কোন বাধা নেই···সেদিন আইনে আমার হাত-পা বাঁধা ···তার ওপর কিছু ইংরেজরা, তারা আপনাকে শাস্তি দেবে বলেই আপনাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনে নিয়েছিল এবং আমাকে সেদিন কারাগারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে, বেডফোর্ড তার সঙ্গীদের নিয়ে কারাগারের দরজায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল, এই আশা নিয়ে যে আমি ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসবো। কি বল বেডফোর্ড, আমি সত্যি বলছি না?

বেডফোর্ড আর ওয়ারউইক পাশেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্রূপের প্রশ্নে মাথা তুলতে দেখা গেল, বেডফোর্ডের চোখে জল। অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে বলে উঠলো, সেদিনের উত্তেজনা থেকে বহু দূরে চলে আসার ফলে আজ বুঝতে পারছি, সেই সব সাময়িক হার-জিতের মূল্য কতটুকু। কিন্তু বিশ্বাস করুন দেবী, সেদিন বারবার একজন নারীলিকার কাছে পরাজিত হয়ে ইংলণ্ডের সমস্ত সামরিক প্রতিভা লজ্জিত, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ওয়ারউইক আর আমি ফিরে গিয়ে ইংলণ্ডে আর মুখ দেখাবো কি করে, সেই কথাটাই সেদিন আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। তাই আপনাকে আর্থিক নিষ্কৃতি দিতে পারবো, তাতে করে আমাদের ক্ষুণ্ণ অহমিকা-বোধ কিছুটা তৃপ্ত হবে, সেই জন্যে আপনার অনুরোধী রাজার ও তাঁদেরোদের কাছ থেকে আপনাকে কিনে নিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেই ছায়া-মূর্তির জনতার ভেতর থেকে কে যেন আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। সবাই চেয়ে দেখে তাঁদেরোদে শিশুর মত কাঁদছে। সামনের দিকে এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে সে কেঁদে ওঠে, আমাকে ক্ষমা কর দেবী···

দেবীর নির্দেশে কেয়ার্ন তাকে হাত ধরে টেনে তোলেন।

দেবী জিজ্ঞাসা করেন, কত টাকাতে তুমি সেদিন আমাকে বেচে দিয়েছিলে?

ঘাড় নীচু করে তাঁদেরোদে বলে, দশ হাজার লিভার:

বেডফোর্ড তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলে, সেই সঙ্গে যে ক'মাস আপনি ফ্রান্সের হাতে বন্দী-দশায় থাকবেন, মাস-পিছু ভাড়া হিসাবে আরো তিন শো লিভার···তার চেয়ে যদি বেশী চাইতো, আমি তা-ও দিতাম! সেদিন আত্মাভিমান আমাকে এতখানি অন্ধ করে দিয়েছিল! তাই কারাগার থেকে বিদায় নেবার সময় যখন আমাকে জানালো, আপনি রাজী হন নি,···

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিপদ বলে উঠলো, আমিও মনে আছে, তুমি উল্লসিত হয়ে বলেছিলে, It's done।

—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা আজ আপনাকে জানাবো দেবী! বেডকোর্ড স্পষ্ট করে বলতে আরম্ভ করে, আজ অনুশোচনায় আমার সমস্ত অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। মনে আছে দেবী, কারাগারে একবার আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন?

—হাঁ, মনে আছে। দুজন ডাক্তার আমাকে চিকিৎসা করতে আসেন।

এতক্ষণ ওয়াংটাইক চুপ করেছিল। বলে উঠলো, দ্বিতীয় ডাক্তারটিকে আমিই পাঠাই!

—আমাদের ডাক্তার পাঠানোর এই আগ্রহ দেখে, মনে করবেন না যে, আপনার জন্যে আমরা উতলা হয়ে উঠেছিলাম, বেডকোর্ড বলে।

পেছনদিক থেকে একজন ফরাসী এগিয়ে এসে বেডকোর্ডকে লক্ষ্য করে বলে, তোমার কথা শুনে সেদিন যে-অপরাধ করেছিলাম, তার জন্যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। ডাক্তার হয়ে তোমার কথা শুনে কি অন্যায়ই না করেছিলাম।

সে-কথার ভ্রূক্ষেপ না করে বেডকোর্ড বলে, ইনিই সেই ডাক্তার, গুরেলমাস্ ও ফামেরা...

গুরেলমাস্ দেবীর দিকে এগিয়ে এসে বলে, আমি আপনাকে পরীক্ষা করে বুঝলুম, খানিকটা রক্ত মোক্ষণ করে দিলেই আপনার জ্বর নেমে যাবে

কিন্তু আমি জানতাম, রক্ত-মোক্ষণ করার একটা বিপদ আছে, তাতে রোগীর প্রাণহানি ও ঘটতে পারে। সেদিন আমার প্রয়োজন, আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা। আপনাকে প্রকাশ্য ফাঁসী দিতে পারলেই আমাদের খুন আত্যাভিমান এবং সাময়িক মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হতে পারে, এই ছিল তখন আমার ধারণা। তাই রক্ত-মোক্ষণ করতে ডাক্তারকে অনুমতি দিই নি। যদি মরে যান! যার আত্যাভিমান!

দেবী মিষ্ট-ভাষণে বেডকোর্ডকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তোমরা এখন আমার কাছ থেকে চাও, বল?

বেডকোর্ড উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছনে যেন কিসের একটা তুমুল শব্দ উঠলো। সবাই চেয়ে ফিরিয়ে দেখে, আরো অসংখ্য ছায়াপ্রাণী সেখানে এসে সমবেত হয়েছে...তাদের সামনে জুডাস্।

জুডাস্ দেবীর দিকে এগিয়ে এসে করজোড়ে বলে, দেবী, আমি জুডাস, পাপ-প্রবাসী অনুতপ্ত সমস্ত ছায়াপ্রাণীদের আজ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। প্রভু যিশু আমাকে ক্ষমা করেছেন...

তার পেছনে একজন গ্রীক কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, আমি সেনেকিয়াস্। ফরাসীনী সক্রেটীস্ও এই হতভাগ্য বিচারককে ক্ষমা করেছেন।

বেডফোর্ড নতজানু হয়ে বলে, দেবী, আমাদের পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরা আত্ম-বলিদান করবো। মানুষের ইতিহাস যুগে যুগে যে-ভুল করে এসেছে, এবার আমরা পৃথিবীতে তাকে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন করে দেবো……

দেবীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বলেন, অহরহ পৃথিবীর চারদিক থেকে উঠছে আর্তনাদ। আর্ত মানুষ মুক্তির জন্যে দিবারাত্রি প্রার্থনা করছে…হে ভগবান, কবে আসবে আবার তোমার মঙ্গল-দূত? তাই তিনি সংগোপনে পুনরায় পাঠিয়েছেন তাঁর দূতকে, পৃথিবীতে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষণা করবার জন্যে। কারণ এবার তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হবেন…পৃথিবীর পুঞ্জীভূত সমস্ত বেদনা নিঃশেষে দূর করবার জন্যে।

সেই সংবাদে ফুডাস্, মোসলিয়াস, বিশপ, বেডফোর্ড সকলেই সচকিত হইয়া ওঠে। ফুডাস্ বলে,

—তাহলে তাঁর দূত ইতিমধ্যেই গিয়েছেন পৃথিবীতে? দেবী, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের যাবার অনুমতি এনে দিন্…

এমন সময় দূর থেকে শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর রোল ভেসে এলো…সেই সঙ্গে কিন্নরীদের সুমধুর কণ্ঠে স্তব-গান শোনা গেল…ক্রমশ সঙ্গীত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো…

সকলে সচকিত হয়ে দেখে, ছায়া-পথ দিয়ে চলেছে বিরাট শোভাযাত্রা, চন্দ্র-সূর্য-তারকার দল আগে আগে চলেছে আলোক-বর্তিকা হাতে, দেববালারা দুধারে ছড়িয়ে চলেছে মন্দার-কুসুম, মধ্যে আলোক রথে এক জ্যোতির্ময় মহাত্মা…

দেবী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, চিনতে পারেন, ভগবানের প্রেরিত শেষ মঙ্গল-দূতকে।

এমন সময় দিগন্তরে শোনা যায় আকাশ-বাণী, ভগবানের প্রেরিত শেষ মঙ্গল-দূত মানবের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে চলেছেন স্বর্গে।

ধরণীর অন্তর থেকে একটা অবিরাম ক্রন্দন-ধ্বনি ছায়া-পথের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছে মাটীর পৃথিবীকে। হায় মহাত্মা! হায় হায় পৃথিবী।

ম্লান হয়ে যায় পাপ গ্রহ-বাসী সকলের মুখ। মাথা নীচু করে প্রস্তর-নীরব দাঁড়িয়ে থাকে।

ছায়া-পথ অতিক্রম করে চলে যায় শোভাযাত্রীর দল।

বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুডাস্ বলে, হায় দেবী! বুঝেছি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। জানি না পৃথিবীর আলো-বাতাসে কি আছে, বারবার ভগবান্ তাঁর মঙ্গল-দূতকে পাঠালেন, আর বার বার পৃথিবী তাঁকে চিনতে না পেরে লাঞ্ছিত করে প্রত্যাখ্যান করলো? এ ভুলের কি শেষ হবে না?

[illegible]-তারী-যজ্ঞ সুরু হবে দেবী বলেন, তাই ভগবান এবার নিজে আবির্ভূত হবেন···আবির্ভূত হবেন [illegible]। তাঁর এক হাতে থাকবে মুক্তা, আর এক হাতে থাকবে কৃপাণ, বাহন হবে তাঁর প্রলয়ের চতুরঙ্গ [illegible]···[illegible]তে তাঁর কোন বিলম্ব হবে না পৃথিবীর লোকদের। সেই আগত-প্রায় মহা-লয়ের জন্যে তোমরা অপেক্ষা করে থাকো, বৈ-যার পাপ-গ্রহে। বিদায়।

ম্লান, মন্থর, নিঃশব্দে ছায়া-মূর্তিরা একে একে আবার মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে···

ক্রমশঃ অন্ধকারে দীপক-রঙের মত আলোক-কম্পন জ্বলতে থাকে পৃথিবী···

সে-কম্পনে ছুটে ওঠে বন্দিনীর আর্ত-হৃদয়ের আকুল স্পন্দন···

মানব-ইতিহাসের প্রেত-মূর্তি

আজও পৃথিবীর বহু আদিবাসীরা তাদের বাড়ি-ঘর-দোরের কাছে মরা [illegible] করে, নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে, আমেরিকার ইতিহাস এমনি এক মহাযজ্ঞের মধ্যে কোন ঘুঘু পাখী আর হুপাহিতি করে কোন দিন ফেরেনি!

নিমন্ত্রণকর্তা, যজ্ঞকারী সেদিন খুব আনন্দ পর্যন্ত আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে—ঠিক যে-আনন্দ হয়েছিল, সেই ত্রিযামীয় যজ্ঞে।

আর তাদের হৃদয়ের মধ্যে আজ একজন সাক্ষাৎ হলো—বহুদিনে। মানব-ইতিহাসের ভিন্ন প্রেত-মূর্তি।

একখানি চিঠি

পত্র-ভারতীর পাঠার পাঠিকার লিখিত এই পত্রখানি এখানে প্রকাশিত করিলাম। সাধারণত, পত্র-ভারতীতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা কাহিনীর আকারেই প্রকাশিত হয়। কাহিনী বলিতে, একটী মানুষের অন্তরের একটী মুহূর্তের কাহিনীকেও বোঝায়। সে বিচারে হয়ত, এই পত্রখানিকেও কাহিনী বলা যাইতে পারে। এবং ইহা সেই বহু ছাত্র পাঠিকারও মন। এই পত্রে লেখক যে বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, আজ আমরা বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি—

সম্পাদক

পত্রভারতী সম্পাদক সমীপেষু,

মহাত্মা গান্ধীর হত্যা আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে যে হাহাকার তুলেছে, তার মধ্যে একটী জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটী হলো জাতির মানসিক প্রস্তুতির কাজে কংগ্রেসের অবহেলা। এই বিরাট জাতি দীর্ঘ দুই শত বছরের পরাধীনতার ভিতরে শাসকদের কাছ থেকে, সভ্য রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিকরূপে নিজেদের গড়ে তোলবার কোন শিক্ষার সুযোগ পায় নি। খাঁচা বাঁধার মত এই বিরাট জনতার মন নিরবিয়ব হয়ে পড়ে আছে। এবং যখনি যে পারে তার নিজের স্বার্থের ছাপ তার উপর বসাবার চেষ্টা করছে! তাই শত পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আকর্ষণে এই জনতা নিজেদের সংহত শক্তিকেই ক্ষুণ্ণ করে চলেছে! অথচ রাষ্ট্রের পক্ষে জনতার সংহত একমুখী শক্তিই সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস। একমাত্র একটা প্রাণবন্ত মানসিক প্রস্তুতির শিক্ষা আয়োজনই এই একান্ত প্রয়োজনীয় সংহতিকে গড়ে তুলতে পারে। এই মানসিক প্রস্তুতির অভাবের দরুণই আজ দাঙ্গার আর মড়কে, প্রত্যেক বৎসরে যে লোকক্ষয় হয়, একটা বিরাট যুদ্ধে তা হয় না। এবং এই মানসিক প্রস্তুতির অভাবের দরুণই জনতার শক্তি আজ যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি গঠনের কাজে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারতো, তা করে নি। জাতির পক্ষে এটা সবচেয়ে বড় অপব্যয়, এত লোকবল থাকা সত্ত্বেও আজ ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির উৎপাদন ক্রমশঃ কমেই চলেছে। তাই দুদিক থেকেই এই বিরাট জাতি আমাদের সব-আশার প্রত্যেকে প্রাণহীন করে দিচ্ছে। আজকের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এইটেই সবচেয়ে

বই চাওয়া। অথচ কংগ্রেস রাষ্ট্রের ভার নিয়েও, এখনও পর্যন্ত জাতির মানসিক প্রস্তুতির এই একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেষ্টা এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্ম-প্রণালীর ওপর ছেড়ে দিয়ে আছেন। আশা করেছিলাম, নতুন মন্ত্রীত্ব গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে, এই বিষয় নিয়ে প্রত্যেক প্রদেশে একটা স্বতন্ত্র মন্ত্রীত্ব গঠিত হবে, যেটি তাদের কাজ হবে, বিদ্যুৎ-বেগে জাতির মনকে রাষ্ট্রের নব-আদর্শের ধর্মে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করে তোলা। পুরাতন আমলাতন্ত্রের যে প্রচার-বিভাগ আছে, এবং তার কার্য্য-পদ্ধতির যা রীতি-নীতি, আজকের দুনিয়ায় তা একেবারে অচল। দুঃখের বিষয়, এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সেই পুরাতন প্রাণ-হীন প্রচার বিভাগকেই টেনে নিয়ে চলেছেন। অধিকাংশ ব্যাপারেই দেখি, অগ্রগতি মানে, পুরাতনের শব দেহকে নিয়ে পুষ্প মালো চন্দনে সাজানোর চেষ্টা। সোভিয়েট রাশিয়া এই দিকে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীতে নিত্য নতুন যে সব উপায় উদ্ভাবন করে জনতার ও জাতির মনকে একমনা করে তুলেছে সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনৈতিক ধর্মের সঙ্গে আমাদের হয়তো অমিল থাক না কেন, তার এই বৈজ্ঞানিক প্রচার-পদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আজ এক অদ্ভুত প্রাণবন্ত প্রচার-কার্য্যের সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়া, নিজের দেশের জনতাকে গড়ে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে, নিঃশব্দে জগতের জনতাকেও তার দিকে আকর্ষণ করে নিচ্ছে। আজ তার সাহিত্য, ছায়াচিত্র, সংবাদপত্র, বেতার, রঙ্গমঞ্চ, সম্মিলিতভাবে যেন এক নিঃশব্দ অভিযান সুরু করেছে যে, তাকে রোধ করা কোন মানুষী প্রাচীরের দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ ভারতবর্ষের মত অভিভূত জনতার দেশে এই বৈজ্ঞানিক প্রচার-কার্য্য সকলের চেয়ে আজ বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের কাছ থেকে তার কোন উদ্যোগ আমরা এখনও পর্যন্ত পাচ্ছি না। আজ ষ্টালিন লেনিনের বই বিনামূল্যে সুন্দর ভাবে ছাপিয়ে এত কম দামে তারা জগতের বাজারে ছেড়ে দিয়েছে যে, দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরে সাধারণেও তা আজ নিঃশব্দে অনায়াসে এসে ঢুকে পড়েছে। অথচ মহাত্মাজীর লেখা বই বাজারে খুঁজে বার করে কিনতে হয়। এবং তার মূল্য সাধারণ পাঠকদের ক্ষমতার বাইরে। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত চেষ্টা ছাড়া, কংগ্রেসের আজও পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র নেই, কোন নিয়মিত ডাক-প্রচারের সাধারণ ব্যবস্থা নেই। অথচ সেখানে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সংবাদপত্র এবং পুস্তক- নিয়মিত জনতার মনে খানিকটা বিরুদ্ধ ক্ষেত্র তৈরী করে চলেছে। জনতার মানসিক প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই মহাত্মা প্রার্থনা-সভার আয়োজন করেন। কিন্তু সবই এই একটী লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং উদাহরণের উপর কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। আজও পর্যন্ত প্রাদেশিক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিনের যে প্রোগ্রাম ইথরে ছাড়া হয়, তার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নেই, তার পেছনে কোন নতুন আদর্শের সুপরিকল্পিত রূপ-রেখা নেই। আজও পর্যন্ত তা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচমিশেলী একটী ছেলে ভুলানো সময়-কাটানো শব্দের কোলাহল। বেতারের মধ্যে

যে অসম্ভব সম্ভাবনা আছে, তার যৌল-আনা সদ্ব্যবহার করবার সময়ই হলো এটা। যার তাকে অস্ত্র কারো অপ-ব্যবহার করা, তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার মতনই রাষ্ট্রকর অপপ্রয়োগ।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যিকলের উপযুক্ত আবহাওয়ার প্রশ্ন আজ সকলেই আকুল স্বরে উঠেছেন। আমার মনে হয়, ভারতের আত্মিক এই দারিদ্র্য প্রতিকারের একটা প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হিসাবে তোলাই হচ্ছে এখন একটা উপায়। আজ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমস্ত আধুনিক সুযোগসহ আতির ও অমরতার মনকে পাড় দেবার জন্যে দরকার, এমন কি মুনাফাশিকারীদের বিমুক্ত করতে হবে। তার জন্যে চাই রাষ্ট্রের একটা সমগ্র আয়োজন। এবং সেই সমগ্রতাকেই আজ রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিভাগ বলে বিবেচনা করতে হবে। দেশে যুদ্ধ কতদিনের স্থায়ীত্ব লাভ করবে, এ জিনিস তা নয়। অবস্থার মনকে নিশ্চাস ফেলবার অবকাশ ও দিয়ে, বিশ্বপ্রকৃতির তার ভূমিষ্ঠ অবস্থার মুখে প্রতিদিনের উপর্যুপরি আঘাত করতে হবে।

ইতি—মুসাফির।

সম্পাদিকা

উপর্যুক্ত পত্রিকা মুসলমান্ত্রের দীর্ঘ আড়-বন্ধনের সন্ধীরের মাঝখানে পড়ে আমার নিরুপায়তা নিয়ে গেছে।

বীরিত নিমন্ত্রণের যে ভার আমার ওপরে ছিলেন, নিয়ত নিরুপায়তা তা সম্পূর্ণ করলেন আমেরিকার মুসলমান্ত্রের অবত বিলম্ব।

আমন্ত্রণকারীর দৈন্য হলো তাঁর বীরদের সম্পূর্ণতা

আর এক কলঙ্কিত দিনের স্মৃতি

খিস্টপূর্ব অব্দাবার ৪৭০ বছর আগে সক্রেটীস গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। জগতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ বলে আজও লোকে তাঁর নাম শ্রদ্ধার উচ্চারণ করে। একবার বাজারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাজারে নানারকমের বিলাস সামগ্রী দেখে তিনি বলেছিলেন, আমি কি দুঃখী, কত কম জিনিষ হলে আমার চলে।

কিন্তু তাঁকে মরতে হয়েছিল বলতে বিষ-পান করে। মাত্র সত্তর বছর বয়সে। এথেন্সের যুবকদের তিনি নষ্ট করে দিচ্ছেন এই অপরাধে তাঁর বিচার হয় এবং বিচারে তাঁর বিষ-প্রয়োগে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এমনি ভাবেই অনেকের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়।

এই মানুষই যিশুখৃষ্টকে জন্ম-দিন করেছিল, কারণ তাঁর অপরাধ তিনি বলেছিলেন, ভালবাস!

সেকালে গ্রীসের একটী ছোট্ট প্রদেশের রাজা, সেই কথা বলার জন্য পাদ্রিদলকে ভয়ে বিশ্বাসে করেছিল, রাজ্যকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

নিজের দেশকে ভালবাসার অপরাধে। জন অব আর্ককে তাইনি ভুল পুড়ে মরতে হয়েছিল।

এই অর্থে অসহিষ্ণুতার ভুলে পাপে ভরা মতান্ধতার রাজপথ ভরা। আজও আমাদের মধ্যে আবার সেই আদিম বর্বরতা মানুষকে ছিন্ন করে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে ভস্মা করছে।

সক্রেটীস নিজে কিছু লিখে যাননি। তাঁর শিষ্য প্লেটো তাঁকে অমর করে রেখে গিয়েছেন তাঁর বইতে সক্রেটীসের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি প্লেটো তাঁর বই-তে লিখে রেখে গিয়েছেন। সেখান থেকে সংকলন করেছেনমহাভারতের সেই অবিস্মরণীয় মৃত্যু-প্রার্থী নচিকেতার মতো থেকেই এখানে গল্প ভারতীয় পাঠকদের জন্য আহরণ করে এনেছি।

এখেক্রেটীস্ একজন নাগরিক। ফাইডোন সক্রেটীসের একজন শিষ্য, যিনি মৃত্যু সময় উপস্থিত ছিলেন।

এখেক্রেটীস্—যেদিন সক্রেটীস বিষপান করেছিলেন, সেদিন তো তুমি তাঁর কাছেই ছিলে!

ফাইডোন—হাঁ, বন্ধু, আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম!

এখেক্রেটীস্—জানতে বড় ইচ্ছে হয়, এই মহাপুরুষ সেদিন কি ভাবে সেই বিষের পাত্র গ্রহণ করেছিলেন! অনেককাল এথেন্স থেকে কোন লোক আমাদের এ-অঞ্চলে আসে নি, যে তার মুখ থেকে শুনবো সত্য ঘটনা কি হয়েছিল। আমরা শুধু শুনেছি যে, তিনি বিষপান করে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যার কাছ থেকে আমি এই সংবাদ শুনি, সে আমাকে তার বেশী আর কোন সংবাদ দিতে পারে নি।

ফাই—তাঁর বিচারের কথা তোমরা শোন নি?

এখে—হাঁ, তা শুনেছিলাম। তবে শুনলাম যে বিচার হয়ে যাবার অনেকদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। সাধারণত বিচারের পরেই তো দণ্ডগ্রহণ করতে হয় কিন্তু তাঁকে এতদিন ধরে কেন মৃত্যুর অপেক্ষায় কারাগারে বসে থাকতে হয়েছিল?

ফাই—যখন তাঁর বিচার শেষ হয়ে যায়, সেই সময় হঠাৎ এক দৈব-ঘটনা ঘটে। ডীলসে প্রতিবৎসর যে নৌকোখানা যায়, সে বছর ঠিক বিচারের আগের দিন তা যাত্রা করে!

এখে—তার সঙ্গে সক্রেটীসের বিচারের কি সম্পর্ক? আর প্রতি বৎসর ডীলসে নৌকাখানা যায়-ই বা কেন?

ফাই—তা হলে বলি শোন। এথেন্সবাসীদের বিশ্বাস যে এই নৌকো করেই একদিন মহাবীর থিসেয়ুস্ ডীলসে আপলো দেবের মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেদিন আপোল্লো তাঁর অসীম করুণায় তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাই এথেন্সবাসীরা শপথ করেছিল, প্রতি বৎসর এই নৌকো যোগ্য-প্রতিনিধিসহ তারা ডীলসে আপলো দেবের মন্দিরে পাঠাবে। সেই সঙ্গে তারা আইন করে যে যতদিন না সেই নৌকো ফিরে আসে, ততদিন পর্য্যন্ত, রাজদ্বারে দণ্ডিত কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হবে না। এখন বুঝলে কেন সক্রেটীসকে মৃত্যুর অপেক্ষায় এতদিন ধরে কারাগারে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল?

এখে—আমরা বিস্ময়ে ভাবি সেই মহাপুরুষ কি ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন কি তাঁর কাছে তাঁর আত্মীয়রা ছিল ?, না, তিনি একা নীরবে সেই বিষের পাত্র গ্রহণ করেছিলেন ? কি কথা তিনি বলেছিলেন ? যদি তোমার অবসর থাকে…

কাই—সে-কথা বলবার প্রচুর অবসর আমার আছে। আমি সমস্ত ঘটনা, মৃত্যুকে সামনে রেখে তাঁর প্রত্যেক আলাপ তোমাকে শোনাব, কারণ আমার জীবনে তার চেয়ে মধুর স্মৃতি আর কিছু নেই।

এখে—তুমি বল, এ রকম আকুল শ্রোতাও তুমি আর পাবে না !

কাই—সে-মুহূর্তের কথা স্মরণ করে আজও আমি অভিভূত হয়ে যাই, তবে বেদনায় নয়। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি, তোমাকে বোঝাতে পারবো না। যাকে জীবনে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি, তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে, দেখছি তিনি মৃত্যুর পাত্র মুখে তুলে নিচ্ছেন কিন্তু কোন শোক হলো না ; কারণ মনে হলো বীরের মত তিনি যেন মৃত্যুকে সাথী করে দেবতাদের আহ্বানে স্বর্গলোকে চলেছেন—শোক তাঁর জন্যে কি করে হবে ? অথচ তখন আমরা কখনো কেঁদেছি, কখনও পাগলের মত হেসে উঠেছি।

এখে—সেখানে তখন কে কে উপস্থিত ছিলেন ?

কাই—সেখানে আমরা দশ-বার জন উপস্থিত ছিলাম।

এখে—কি বল্লেন তিনি ?

কাই—আমরা যেদিন শুনলাম যে ডীলস্ দ্বীপ থেকে নৌকো ফিরে এসেছে, তারপরের দিন ভোর না হতেই আমরা কারাগারে, যেখানে তিনি থাকতেন, উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা করবার অনুমতি পেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, সেদিন তাঁর পায়ের শৃঙ্খল খুলে দেওয়া হয়েছে…তাঁর সামনে তাঁর স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে দাঁড়িয়ে…আমাদের দেখে তাঁর স্ত্রী পাগলের মত কেঁদে উঠলেন…তিনি স্মিত-মুখে ইঙ্গিত করলেন তাঁকে বাড়ী নিয়ে যেতে …আমাদেরই কয়েকজন তাঁকে বাড়ী পৌঁছতে গেল…বিছানার উপর বসে শৃঙ্খল-মুক্ত পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে তিনি প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে যেমন তত্ত্ব-কথা আলোচনা করতেন, তেমনি আলোচনায় মেতে উঠলেন, যেন জগতে কোথাও কিছু হয় নি…আজই যে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে সে-কথা যেন তিনি ভুলেই গিয়েছেন……

[ফাইডোন বা এথেন্সের কথা থেকে, প্লেটো আদালতের অনুমতির পরে কারাগারে নিয়ে গিয়েছেন, সেই সেদিনে যখন তিনি তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে শেষ আলাপ করছেন—সেই আলাপ, প্লেটো কথাবার্তার মতনই লিখে রেখে গিয়েছেন···তাঁর অমর গ্রন্থে।—সেখানে আমরা দেখি, মহাজ্ঞানী পুরুষটি কি ভাবে মৃত্যুকে সামনে রেখে, জীবন-মরণ, সত্য-মিথ্যা, ধর্মাধর্ম, আকাশ-পৃথিবী, মানুষ আর তার মন সম্বন্ধে কি গভীর আলোচনা করে গিয়েছেন। শিষ্যরা প্রশ্ন করছেন, আর সক্রেটীস্ তার উত্তর দিচ্ছেন। সেই উত্তর গুলির মধ্যে প্লেটো মানবের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর অন্তরের অন্তরতম কথা গুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই কথাবার্তার মধ্যে কোথাও কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, কোন রাগ নেই, কোন আক্রোশ নেই। কোন চঞ্চলতা নেই। তখনও পর্যন্ত তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নানা রসিকতা পর্যন্ত করছেন। আমরা সাধারণ মানুষ। মৃত্যু আমাদের বিচলিত করে। আমাদের সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস মৃত্যুর দরজায় এসে থেমে যায়। মৃত্যুর কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা ঋষি, তাঁরা চেয়েছেন মৃত্যুকে জয় করতে। তাঁরা বলেন যে এই মাটীর মানুষের মনে এমন এক শক্তি আছে যা মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। আমরা সাধারণ মানুষ জানি না সে শক্তি কি। তবে মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতেই তার দিব্য প্রকাশ দেখতে পাই, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষদের জীবনে। সেদিন এথেন্সের কারাগারে আমরা তার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলাম। সক্রেটীসের সেই অমোঘ কথন প্লেটো লিখে রেখে গিয়েছেন। এখানে সেই কথাবার্তার অংশ সংক্ষিপ্ত করে, অন্তিম ঘটনার ইঙ্গিত শুধু দেওয়া হলো। ক্রিটো, সিমিয়াস প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য সেদিন তাঁর কাছেই ছিল। তাদের আলাদা আলাদা নাম না দিয়ে, শুধুশিষ্য বলেই এখানে উল্লেখ করা হলো। তাঁর গ্রীষ্টক বিষয় দিয়ে, তিনি শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করলেন—]

সক্রেটীস্—বড় বিচিত্র জিনিষ, এই সুখ। লোকে ভাবে দুঃখ বুঝি সুখেরই বিপরীত। কিন্তু আসলে তাদের দুটো-একই মাথা একটা। ঈশপস্ এই নিয়ে একটা গল্প লিখলে পারতেন।

শিষ্য—ভাল কথা, আমাদের মুখে শুনে একজন কবি জিজ্ঞাসা করছিলেন, আপনি সহসা কারাগারে বসে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন?

সক্রে—তাকে বলো, আমি যে কবিতা লিখছি, কোন কবির প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য নয়। এই কারাগারে বসে ঈশপের গল্পগুলি আমি কবিতায় লিখতে আরম্ভ করি, মনকে শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখবার জন্যেই আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ছন্দ-সাধনা করছি...তোমরা জান, কবিতা লেখা কখনও আমার অভ্যাস ছিল না···

অন্যশিষ্য—যে লোকটীর ওপর আপনাকে বিষ দেবার ভার আছে, সে আপনাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে, যাতে আপনি তাকে বেশী কথা না বলেন।

সক্রেটীস্—কেন?

শিষ্য—বেশী কথা বলে আমরা উত্তেজিত হয়ে থাকবো—তখন একবার বিষ খেলে হয়তো মৃত্যু না-ও হতে পারে···অথচ যন্ত্রণা হবে···তখন তাকে আবার বিষ দিতে হবে···

সক্রেটীস—তার কাজ সে করবে, যদি তিনবার দরকার হয়, তিনবারই দেবে.. কিন্তু তার কথা এখন থাক্···মৃত্যু কি তা আমি জানি···কালই মৃত্যু আসবে আমাদের এই নিদ্রা আশ্রয়···অনন্ত জীবন ধরে আমরা মৃত্যুরই অপেক্ষা করছি···যখন সেই মৃত্যু কাছে আসে তখন আনন্দিত না হয়ে বিচলিত হবার কি আছে ?

শিষ্য—কিন্তু আপনি যদি চলে যান, কে আমাদের সেই সান্ত্বনার দীক্ষা দেবে ? কে আমাদের মৃত্যু-জয়ী মন্ত্র আর শেখাবে ?

সক্রেটীস—বিপুল এই পৃথিবী···কত সাধু-সজ্জন এই পৃথিবীতে আছেন। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে তাঁদের অনুসন্ধান কর···তার জন্যে কোনও পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হয়ো না···

শিষ্য—আমাদের বহু প্রশ্নই অমীমাংসিত রয়ে গেল···এই মহা-দুর্দৈব এলে···

সক্রেটীস—দুর্দৈব কাকে বলছো তুমি। কবিরা বলে রাজহংস যখন জানতে পারে, তার মৃত্যু আসন্ন তখন নাকি মৃত্যু-ভয়ে সে বিলাপ করে। তার সেই কাতর বিলাপ, তার অন্তিম গানে তার ভয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। রাজহংসেরা যখন জানতে পারে যে মৃত্যু আসন্ন, তখন আগে সে যে-ভাবে গান গাইতো তার চেয়ে ঢের জোরে মুহুর্মুহু গান গেয়ে ওঠে। কেন জান ? আনন্দে ! সে জানতে পারে, সে যে-দেবতার পাখি, তাঁর কাছে যাবার লগ্ন তার এসেছে···তাই তার শেষ-গান এত সুন্দর। তাই বন্ধু, আমার যখন সমাধি দেবে, তোমরা কেউ শোকে চোখের জল ফেলো না। ভেবো না যে তোমরা সক্রেটীসকে সমাধি দিচ্ছ, তোমরা সমাধি দিচ্ছ শুধু সক্রেটীসের দেহকে।

[এই ভাবে কথায় কথায় অপরাহ্ণ হয়ে এলো। প্রতিদিন অপরাহ্ণে যেমন স্নান করেন, সেদিনও তিনি তেমনি স্নান করে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের অন্য সব স্ত্রীলোকেরা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের চোখে জল। তিনি কিছুক্ষণ পরে তাঁদের চলে যেতে বললেন। তারা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। এমন সময় যে-কারারক্ষী বিষ দেবে, সে উপস্থিত হলো—]

কারারক্ষী—সক্রেটীস, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বহু লোকের হাতে বিষ তুলে দিয়েছি কিন্তু আপনার মত কোন লোক দেখি নি···তারা সমস্তক্ষণ সময় থাকে, আমাকে গালাগাল দেয়, অভিশাপ দেয়···আপনি এতদিন আছেন, এক দিনের জন্যও একটা কটু কথা বলেন নি···আপনি বুঝতে পেরেছেন, আমি কেন এখানে এসেছি···

সক্রেটিস্—তুমি বিচলিত হয়ো না বন্ধু! যাও, আমি প্রস্তুত! তুমি বিষ নিয়ে এসো! লোকটা কি ভদ্র! যাও, তোমাদের একজন কেউ গিয়ে বিষ নিয়ে এসো!

শিষ্য—কিন্তু এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নি। যারা বিষ দণ্ড গ্রহণ করে, তারা শেষ পর্য্যন্ত···

সক্রেটিস্—তোমার কথা শুনে হাসি পায়। যে জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে, অকারণ আর কি সুখ তুমি দেবে তাকে?

[বিষ-পাত্র হাতে কারারক্ষীর প্রবেশ]

এস বন্ধু, বলে দাও, কি করতে হবে?

কারারক্ষী—বিশেষ কিছু করতে হবে না··· বিষপান করে যতক্ষণ না পা ভারী বোধ হয় ততক্ষণ হেঁটে বেড়াতে হবে তারপর শুয়ে পড়বেন···

সক্রেটিস্—তবে দাও পাত্র! হাঁ! বন্ধু, আমি কি এই পানীয় কিছু দেবতাকে উৎসর্গ করতে পারি? না, তার কোন বিধি নেই?

কারারক্ষী—ঠিক যতটুকু বিষ দরকার, আমরা তাই তৈরী করি।

সক্রেটিস্—বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছো! না, আমি এর এক বিন্দুও নষ্ট করবো না। শুধু এই প্রার্থনাতেই আমার শেষ পানীয় উৎসর্গ করলাম, হে দেবতা, আমার যাত্রা যেন শুভ হয়!

[কথা মত তিনি প্রসন্ন-চিত্তে বিষ-পাত্র মুখে তুলে ধরলেন। শিষ্যরা কাঁদে উঠলো। শূন্য পাত্র ধীরে ধীরে নামিয়ে তিনি]

ওরে বোকারা তোরা কাঁদছিস বলে আমি স্ত্রীলোকদের বিদায় দিলাম। তোমরা আবার স্ত্রীলোকদের মত কাঁদতে আরম্ভ করলে। শুনেছি নীরবতার মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়। সে নীরবতা কান্নায় নষ্ট করো না।

[ধীরে ধীরে তিনি সেই ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন, তারপর পা ভারী বোধ হওয়ায় শুয়ে পড়লেন। নীরবে মৃত্যু এলো মহাপুরুষকে নূতন তীর্থে নিয়ে যাবার জন্য।]

সুভাষচন্দ্র

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[ইতিপূর্বে নেতাজীর জীবন-কাহিনীর প্রথমাংশ গল্প-ভারতীর একাদশ গ্রন্থে এবং শেষ কয়েক পৃষ্ঠা অর্ঘ্যে প্রকাশিত হয়।]

ভারতবর্ষ আজ বিদেশী শাসকদের নিকট হইতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। জন-সাধারণের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে বা অর্জন করিয়াছে।

কিন্তু কংগ্রেসের এই দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, কংগ্রেসের যে-সংগ্রামাত্মক মূর্তি ছিল, তাহা সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত যেন বিলীন হইয়া যাইতেছে।

পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারত-ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে, যাহারা আজ জাতির প্রতিনিধিরূপে শাসক হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কাহারও মনে একটা বিক্ষোভ জমা হইয়া উঠিতেছে। ক্যান্সারের মত ব্যক্তির মুখ বুজিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মন্ত্রপূত সর্ষের মধ্যে ভূতের অস্তিত্বের সম্ভাবনায় জনসাধারণ ক্রমশ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এবং সেই সন্দেহকে মূলধন করিয়া স্পষ্ট-বাদী [illegible] একান্ত প্রয়োজনীয় শাসন-কার্য্যকে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে [illegible] আবার লইয়া চলিয়াছে। যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ মহাচীনকে রক্তহীন করিয়া তুলিয়াছে এবং যাহার ফলে আজ এশিয়ার সেই অন্যতম সর্ব-প্রাচীন জাতি স্বাধীনতা-অর্জ্জন করিয়াও আবার শক্তিশালী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সর্ব-নৈতিক ক্রীতদাসত্বের [illegible] চলিয়াছে, এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতাও তাহার নব-জাগরণ-লগ্নে সেই ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্ণাবর্ত্তের মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বুকে লুকায়িত দুষ্ট ব্যাধির বীজ যেমন একদা দেহের প্রতিরোধ-ক্ষমতার অভাবের সুযোগে সারা দেহের মধ্যে দুষ্টক্ষতরূপে ফুটিয়া উঠে, তেমনি ভারত-ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের অঙ্গে মারাত্মক সব দুষ্টক্ষত একে একে স্পষ্ট হইয়া [illegible] রাজনৈতিক ছটার আড়ালে জাতির মজ্জাগত দুর্ব্বলতা আজ সহসা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু দলীয় নীতির [illegible] বা কপপ্রয়োগে এই প্রকটতার হাত হইতে জাতিকে রক্ষা করা যাইবে না। তাহার জন্য প্রয়োজন, জাতির মানসিক-প্রস্তুতি, জাতির চারিত্রিক [illegible] আয়োজন, যাহা এই দুর্দীর্ঘ [illegible] কাল উদাসীন বিদেশী শাসন-তন্ত্র [illegible] জাতির

নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া, সংবাদ-পত্র, বেতার, সাহিত্য, চিত্র, বিদ্যালয়, পাঠশালা, রঙ্গমঞ্চ, ছায়াচিত্র, সিনেমার [illegible] ও বাহককে আজ এক সঙ্গে একই সময়ে এক সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনায় জাতির এই মানসিক প্রস্তুতির কাজে নূতন এবং প্রাণবন্ত ভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে। আশা করিয়াছিলাম জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নব-গঠন-ব্যবস্থায়, এই সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র মন্ত্রীর প্রত্যেক প্রদেশেই দেখা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক প্রাদেশিক মন্ত্রীরই এই সর্ব-প্রথম প্রয়োজনীয়তাকে যে কোন কারণেই হোক্ এড়াইয়া গেলেন। অন্ন ও বস্ত্রের অভাব নিশ্চয়ই জাতির বড় অভাব কিন্তু আদর্শের অভাব, চরিত্রের অভাব, তাহার চেয়েও এতবড় মারাত্মক ত্রুটী যে, তাহার অভাবে কুবেরের ভাণ্ডারও এই জাতির হাতে তুলিয়া দিলে, তাহার দুর্গতি দূর হইবে না· অথচ তাহা পাইলে, কপর্দ্দকহীন জাতিও ধূলি-মুষ্টি হইতে ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিতে পারে। এবং এই মানসিক প্রস্তুতির অভাবের দরুণই আজ সমস্ত সদ্-ইচ্ছা এবং সাধু-প্রচেষ্টা, কোথা দিয়া কোন্ অন্ধকার গহ্বরে হারাইয়া যাইতেছে। তাই আমাদের দেশে আইন করার সঙ্গে সঙ্গে, আইন ফাঁকি দেওয়ার হাজার কল সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী হইয়া যায়, তাই ঐশ্বর্য্য মানে কন্‌ট্রোল আনে চোরাবাজার, ঐশ্বর্য্য মানে কালো টাকা, ষ্ট্রাইক মানে শুধু মাইনে বাড়ানো, স্বাধীনতা মানে বিনা দায়িত্বে সুখ-ভোগ করিবার অধিকার, রাজনীতি মানে আমি-যে-দলের-নেতা, সেই দলেরই হোক্ জয়।

তাই আজ, চারিদিকের এই শিব-স্তুতির নামে অশিব-পূজার উপকরণ দেখিয়া, ইংরেজ কবি [illegible] আপনা হইতে বলিয়া উঠে, Subhas, thou shouldst be living at [illegible] বেঁচে থাকা দরকার! আজ ভারতবর্ষ, একান্ত ভাবে তোমাকেই চায়, তোমাকেই তার বিশেষ প্রয়োজন। যে-জিনিষের অভাবে আজ আমাদের সমস্ত আয়োজন, সমস্ত সাধু ইচ্ছা সত্ত্বেও, ছেঁদা কলসীতে জল-ভরার মতন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তুমিই তোমার জীবনে, কার্য্যে, কথায়, চিন্তায়, সাধনায়, সেই মহা-সম্পুরকের সন্ধান আমাদের দিয়াছ। তাই আজ তোমার জন্মতিথি উপলক্ষে তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমার জাতি যে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিল, আমার সামান্য এই প্রণামটুকু তাহার পাশে আজ রাখিয়া দিলাম, এই আশ্বাসে যে, বাচনিক-শ্রদ্ধা-নিবেদনের ঊর্দ্ধে তোমার সাধনাকে জীবনে [illegible] সত্য করিয়া তোমার জাতি তোমার যোগ্য অর্ঘ্য তোমাকে দিতে পারে···

(২)

কথা খুব সম্ভাব্য হয়নি, ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, মহাত্মাজীর নির্দেশ গ্রহণ করে' দ্রুততর বিপ্লব-আয়োজনের মধ্যে দেশের যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তুলতে।

অহিংস-আন্দোলনের মন্থর-গতি নিষ্ক্রিয় বিবর্তন-ধারার আড়ালে চির-বিপ্লবী সৈনিকের মনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যে সুতীব্র বাসনা এতদিন ধরে পর্বত-প্রাচীরে অবরুদ্ধ নির্ঝরীর ব্যর্থ আক্রোশের মত নিজের নিষ্ফলায় নিজেই বেসামাল হয়ে উঠছিল; ত্রিপুরীতে সে তার শেষ-শক্তি সংহত করে আত্মপ্রকাশের জন্ত উদ্বেল হয়ে উঠলো।

মহাত্মা গান্ধী সচকিত হয়ে উঠলেন, এতদিন ধরে যে-আন্দোলনকে তিনি সযত্নে তাঁর সুপরিকল্পিত চিন্তার নির্দিষ্ট অ্যাক্সিস্ রেখার আবদ্ধ রেখে অগ্রসর হয়ে এসেছেন, আজ বিদ্রোহী যৌবনের অধৈর্য্য আগ্রহের বন্যায় বুঝি তা রেখাহীন অনির্দ্দিষ্টতার রক্ত-পথে ভেসে ভেসে চলে যায়…

ত্রিপুরীর মাটীর তলায়, ভারত-ইতিহাসের দুই শক্তি-ধারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টায় পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করলো…

বাইরে খবরের কাগজে আমরা দেখলাম, পন্তিত পন্থের আপাত-নিরীহ প্রস্তাব এবং সেই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের নিয়মতান্ত্রিক ভব্যতার উদার সংগ্রাম…

(৩)

মহাত্মাজীর প্রতিনিধিরা ত্রিপুরীতে উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজী রাজকোটে…রাজকোটে অনশন-শয্যায়…

সুভাষচন্দ্রও রোগ-শয্যায়… জ্বরের উত্তাপে দেহ প্রায় অবশ… তবুও সেই অবস্থায় চিকিৎসকদের সব উপদেশ অগ্রাহ্য করে এসেছেন…সংগ্রাম ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কিছুরই অপেক্ষা করে না। বড় নির্মম তার আহ্বান।

অসুস্থ সভাপতির অভিভাষণ পড়ে দিতে হলো অন্য লোককে।

দীর্ঘ সূত্র হলো বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে।

শান্ত-নিরীহ-মর্ম্ম এই প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ…

—যে [illegible] ঐক্যবদ্ধতার জন্তে চিরানুষ্ঠিত প্রথা অনুযায়ী বর্ত্তমান সভাপতি যেন মহাত্মা গান্ধীর [illegible] কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত করেন…

[illegible] নিরীহ প্রস্তাব…অপ্রয়োজনীয় কথা…

[illegible] সর্ব্বাধিনায়ক সভাপতি অনায়াসেই এই প্রস্তাব রহিত করতেও পারতেন কিন্তু গণতান্ত্রিক ভব্যতার তা বাধে। সুভাষচন্দ্রের বাধলো।

যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হলো। যে-বেড়া ভাঙতে চেয়েছিল

গান্ধীজী। অহিংসনীতি।

মহাত্মাজীকে আসবার জন্য টেলিগ্রাম করলেন।

মহাত্মাজী এলেন না। এলো তাঁর উত্তর। বড় কথার সুন্দর একটা টেলিগ্রাম,

তাঁকারকে তুমি অবজ্ঞা করতে পার…আমি পারি না।

রাজনিক ভদ্রতার আড়ালে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে মতভেদ। দুই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দুই তার-ধারার চরম সংঘর্ষ।

(৩)

কলকাতায় বসলো নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন।

এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে বেছে নিতে হবে-তাঁর কর্মসচিব, কার্যকরী সমিতির সদস্য।

কিন্তু বেছে নিতে হবে পন্থের প্রস্তাব অনুযায়ী। মহাত্মাজীর ইচ্ছানুকূল্যে।

মহাত্মাজী এসেছেন। উঠেছেন সৌম্যেন্দ্র। সভাপতির অতিথি।

পন্থের প্রস্তাব হাতে সুভাষচন্দ্র দেখা করেন মহাত্মাজীর সঙ্গে।

তিনদিন ধরে চলে আলাপ-আলোচনা।

[redacted] তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে

[redacted] জানেন, তাঁর নেতৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করেই আজ সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি। ত্রিপুরীতে তাঁরই হয়েছে পরাজয়। তাই সদস্য-নির্বাচনে তাঁর মতামত তিনি দিতে পারেন না।

ব্যর্থ হয়ে সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন।

কিন্তু এ-ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে তাঁকে উঠতে হবে। সমগ্র বাংলার যৌবনের তিনি প্রতিনিধি।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি জয়ী হয়েছেন।

আজ কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর সমস্ত সহকর্মীদের প্রকাশ্য বিরোধিতার সংগ্রামেও তিনি জয়ী হবেন।

বিদেশের হাতে বাধা থেকে তাঁর-মুক্তির নীতির বিরে।

বাড়ি নয়, তার চেয়ে সভায়, তার চেয়ে কংগ্রেসের…

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-কমিটির কাছে সভাপতিত্বের ত্যাগ করলেন।

একটা সুনিশ্চিত আঘাতের সুদূরপ্রসারী বেদনা থেকে বেঁচে গেল কংগ্রেস

সেই সঙ্গে বেঁচে রইলো তরুণ অধিনায়কী [illegible] দুর্দান্ত যৌবন...

আনন্দে বাঁচা নিয়ে [illegible] তরুণ দলে নবরূপ করে এসেছে জাতির সত্য-মুক্তি...

(৪)

কংগ্রেসের বিধি-নিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় বিপ্লবীরা সব।

লৌকিক-চক্ষুর অন্তরালে মনের ভেতর তখন চলেছে স্বপ্ন-সাধনের আয়োজন। নিজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে পাওয়া।

নিভৃতম মনের তলায় সে-আলোড়নের সংবাদ বাইরে কারুরই চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে না দুর্দান্ত যৌবনের সেই দুরাকাঙ্ক্ষ স্বাতন্ত্র্যের স্বপ্ন-অভিযানের মানসিক আয়োজন।

কংগ্রেসের ভেতর থেকেই নতুন করে দল গঠন করেন, ফরওয়ার্ড ব্লক।

নিজেকে লিপ্ত-রাখা। সবা তখন কিন্তু দলের বাইরে, বহুদূরে, দূরাপ যেখানে সাধনে [illegible]

কংগ্রেস মনে করে ঔদ্ধত্য। ভূতপূর্ব সহকর্মীরা বলে, পরাজয়ের ব্যর্থ আক্রোশ। কেউ কেউ এসে পাশে দাঁড়ায়, কংগ্রেসের অভিভাবকদের আক্রোশে।

সমুদ্র পড়ে থাকে শান্ত, অচঞ্চল। [illegible] মন চলেছে প্রস্তুতি-পর্বের আয়োজনে।

মাঝে মধ্যে জেগে উঠে [illegible] ক্ষীণ পূর্বাভাস

ঝড়ের আশঙ্কায় কংগ্রেস সতর্ক হয়ে উঠে। [illegible]

বম্বেতে কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে ওই ঠারা আইন করা [illegible] অনুমতি আদেশ না নিয়ে কোন কংগ্রেসকর্মী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করতে পারবে না। এবং,

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীদের প্রাত্যহিক কাজে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি বা প্রাদেশিক সভাপতি কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ করে উঠলেন। তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আঘাত লাগলো। সবাই কি পারে, শুধু চাকার [illegible] থাকতে? পাহাড় ভেঙে বেরিয়েছে যে-নির্ঝরিণী ধারা, সে কি মানে উপলের আড়াল?

[illegible] এই দুই বিধানের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ভারতব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানালেন।

তখনও তিনি বাংলার প্রাদেশিক [illegible] কমিটীর সভাপতি। কেন্দ্র থেকে তাঁর ওপর এলো আদেশ, কংগ্রেসের বিধানের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত আন্দোলনকে প্রত্যাহার করবার জন্যে! প্রাদেশিক সভাপতিকে কেন্দ্রের অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

সুভাষচন্দ্র প্রত্যুত্তরে জানালেন, কংগ্রেসকে ভালবাসি বলেই কংগ্রেসের ভুল সংশোধনের আমার আছে অধিকার।

ছোট মাটির টব অযত্নের অবহেলার নয়। যদি জোর করে টবেই তাকে রাখা হয়, টব সে আপনার প্রসার করে নেয়। নিরুপায়।

কিন্তু টব ভাঙার জন্যে কংগ্রেস শাস্তির বিধান দিল···তিন বৎসরের জন্য অতঃপর এই বিদ্রোহী আর কোন কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না···

শাস্তি এলো মুক্তি নিয়ে।

বিদ্রোহী আজ মুক্ত···তার নিজের মধ্যে আজ সে সম্পূর্ণ···

আজ তার পূর্ণ স্বাধিকার, নিজের মতন করে গড়ে তুলতে নিজের বিশ্ব।

আজ তারি যৌবনের স্বপ্নে ভরপুর তার মন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ-শতাব্দীর মধ্য-রাত্রিকে আবার ভরে তোলে উৎসবে। একটী বাঙালীর মনে। সবার অগোচরে।

(৫

মহাজাতি-সদন।

স্বপ্নের প্রতর মূর্তি।

[redacted] আকৃতি।

[redacted] বিশ্বের শিল্পীর লীন হয়ে থাকবে? বাইরে দিব্য মূর্তিতে [redacted] কি তা সত্যিকারের রূপ ধরবে না? কল্পনাতীতের প্রার্থনা কি শুধু বন্দিদের প্রেমেই পড়ে থাকবে।

সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন-আকুল মন, অন্তরের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার প্রয়াসে মহাজাতি-সদনের পরিকল্পনা করে।

মানবতার কবিকে আহ্বান করলেন, তার ভিত্তি-মূলকে আশীর্বাদ করবার জন্য।

ইঁট দিয়ে নয়, কল্পনা দিয়ে গড়ে উঠলো তার ভিত্তি। ইঁটের চেয়ে ইঁট, প্রস্তরের চেয়ে প্রস্তর, বাঙালীর মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে-কল্পনা, যে-কল্পনা হলো স্বজনের লীলা-সহচর, তাই দিয়ে গড়ে উঠতে লাগলো [redacted] মণি-সৌধ···

তার ভিত্তি-মূলে একদিকে আছে কবিগুরু চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর মাটি···আর এক দিকে আছে গঙ্গার পুণ্য [redacted] দিয়ে গড়া বাঙালীর মন···

ইঁটের পর ইঁট···গড়ে উঠতে থাকে মহাজাতি-সদন।

(৬)

এতদিন পরে পাঁচাশ-পঞ্চাশ বছর ধরে বেরিয়ে পড়েছে যে বিপ্লবিনী ধারা, শত দিকে শত বাঁক নেমে সে খুঁজে নিজের গতি-পথ…

…সবারের সঙ্গীতে তার নিজ বিপ্লবীর গতি-পথ…

কলকাতার বুকের ওপর ইংরেজের সাম্রাজ্য-দুর্গার প্রতীক, ইচ্ছাকৃত ইতিহাসের অনর্থ, হলওয়েলের অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতি…যেন তার আগে বা পরে কোন যুরোপীয় জাতি তার চেয়ে নৃশংস বর্বরতা আর কিছু করে নি…

দূর করে দাও সাম্রাজ্যবাদের এই প্রস্তরীভূত দুর্ভ অভিসন্ধি। মিথ্যার বড়যন্ত্রের কারুকার্য।

বহুদিন থেকে বাঙালী তরুণের মনে কণ্টকের মত বিঁধে আছে ঐ স্মৃতি-ফলক।

সুভাষচন্দ্র আর এগিয়ে আসেন, তুলে ফেলে দিতে সেই বিষ-কণ্টক। তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ায় তরুণের দল।

কিন্তু তার আগেই এসে উপস্থিত হয়, আবার সেই আহ্বান। কারাগারের আহ্বান। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইনের ১২৯ ধারা।

চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর ধারে পড়ে থাকে অসমাপ্ত মহাখাটি-সদন।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকদের রাত্রি-বাসের জন্য এবং আশে পাশে অশিক্ষিত গৃহহীনদের মলমূত্র ত্যাগের জন্য।

তার পাশ দিয়েই চলে গেল, দেখেছি শত শত নেতাজী বাঙালী তরুণের, মুখে জয়-হিন্দ উচ্চারণ করে এবং সুভাষচন্দ্রের জয়-ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করে।

সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন জাগে, প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনার পর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন যুগের তারুণ্য কি পারতো না তাদের যৌবনের চাবায় এই অসমাপ্ত স্বপ্নকে সার্থক সত্য তুলতে?

যৌবন কি এতই দরিদ্র? যৌবনও কি থাকবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে? সে কি শুধু ভাবতেই পারে? গড়তে পারে না?

পথে পথে ভাঙুকরী সুরে বাঙালী তরুণেরা কি পারতো না সেই অসমাপ্ত যৌবনকে সম্পূর্ণ করতে? বাধা? কিসের বাধা?

কিম্বা সে-আহ্বানের আগুন এখনও বুঝি জাগেনি বাঙালী যুবকের মনে?

(৭)

যৌবনের উপরে যৌবন।

কারাবাসী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালতে আনে আরো দুটি অভিযোগ।

আসামী কারাগারে। বিচার বসে আদালতে। দিনের পর দিন তারিখ বদলায়।

বৃদ্ধিজীবি-গভি সভার অধিবেশন সমর্থনের সুযোগই বা কোথায়? ভেতরে-ভেতরে করে বসিয়ে।

সুভাষচন্দ্র স্থির করেন, শেষ অবলম্বন গ্রহণ করবেন। অনশন। চরম প্রতিবাদ।

অস্ত্রহীন দেশের অস্ত্র-গুরু তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন নতুন দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ-বিধি।

ইশ্বরের প্রার্থনায় বসিয়ে করেছিলেন তনু-ত্যাগ। সেই ত্যাগ-পূত অগ্নিতে তৈরী হয়েছিল দৈত্য-নাশ অস্ত্র। আজিকার বসিয়ে দেহের তরে তনু-ত্যাগ।

অনশনে তাঁকে বরণ করার ব্রত গ্রহণ করবার আগে সুভাষচন্দ্র বিদেশী শাসনের প্রতিনিধি গভর্ণরের কাছে সত্যাগ্রহের রীতি অনুযায়ী নিজের অন্তরের বাসনার কথা জানিয়ে এক পত্র লিখলেন: ঐতিহাসিক পত্র: চির-মুক্ত যৌবনের মৃত্যু-অভিসারের গান-মন্ত্র:

—জীবনে এর চেয়ে আনন্দের, এর চেয়ে প্রার্থনার আর কি আছে, যখন আমি জানি আমার যা আদর্শ, তার জন্যেই আমি জীবন ধারণ করে এসেছি, তার জন্যেই জীবন ত্যাগ করতে চলেছি? আমি জানি আমার এই কারাগার প্রদীপ থেকে আলো জ্বালিয়ে নিয়ে আমার অসমাপ্ত ব্রত-উদ্‌যাপন করবার জন্যে আসবে আমার নতুন সাথীর দল. এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে জীবনে? আজ আমি সুনিশ্চিত জানি, একদা আমার বাণী ভারতের নব-নবীন গিরি-প্রান্তর পরিব্যাপ্ত করে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে গিয়ে পৌঁছিবে, ভারতের তট-রেখা ছাড়িয়ে, হিমগুল গিরি ছাড়িয়ে প্রসরে ...সেই আমার চরম পুরস্কার। নিজের আদর্শের বেদীমূলে এই যে শান্ত আত্ম-নিবেদন, এই নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে-যাওয়া, এর চেয়ে সুন্দরতর [illegible] কি হতে পারে জীবনে? [illegible] ভাবে চলে-যাওয়া, এই হলো [illegible] জাতি বেঁচে থাকে। আমি মরে যাবো, বেঁচে [illegible] ভারতের মুক্তির সাধনা...

নির্দিষ্ট দিনে কারাগারের ভেতরে বসলেন অনশন-ব্রতে। সেজন্যে দেখতে দুর্বল শরীর নয়া নিতে বাধ্য হলো। একেই শরীর তখন দীর্ঘ-ব্যাধি-ভোগের ফলে ভেতর থেকে জীর্ণ হয়ে এসেছিল, তার উপর এই স্বেচ্ছাকৃত উপবাসে অতি অল্প কালের মধ্যেই ফেব্রুয়ারী মৃত্যুর দ্বার-প্রান্তে এসে উপনীত হলেন।

সরকারী ডাক্তার উৎকণ্ঠিত হয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, হৃদ-স্পন্দনের গতি অতি মন্থর হয়ে এসেছে... ...আজ দিনের দিন ডাক্তারেরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, যে-কোন মুহূর্তে শেষ হৃদ-স্পন্দন থেমে যেতে পারে।

অগত্যা আকস্মিক তাঁকে মুক্তি দিলেন।

মৃত্যুর দ্বার-প্রান্ত থেকে ফিরে এসে, একদিন রোগক্লিষ্ট নিজের কক্ষের দ্বারে এসে করাঘাত করলেন।

জগৎ ভাবলো, জীবনের প্রথম যাত্রা-মুখে যে বৈরাগ্যের বাণী তাঁকে ঘর-ছাড়া করে ভারতের মুক্তির পথে বেরিয়েছিল, জীবনের মধ্য-পথে প্রাক্‌সন্ধ্যা-লগ্নে আবার যেন তাঁকে ডাক দিয়েছে ঘর-মোচন একাত্মিকের সুর।

যে-পথে যুগে যুগে ভারতের মনীষীরা জগতের ঊর্ধ্ব-বন্ধন থেকে সরে দাঁড়িয়ে আত্মার মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল, সুভাষচন্দ্রও ঠিক সেই পথে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করে দিতে।

কেউ-ই সন্দেহ করলো না···সন্দেহ করবার কিছুমাত্র সুযোগও দিলেন না দিতীয় বিপ্লবী। বহু দিনের বহু নীরব সাধনায় যে-শক্তি তিনি সঞ্চয় করেছেন, বাইরের চাঞ্চল্যকে ভেতরের শাসনে রুদ্ধ করে রাখতে। ভেতরে তখন সমুদ্র-মন্থন চলেছে বৈশ্বানরের, বাইরে তার কোন আভাসও নেই কোথাও। বিপ্লব-সাধনার চরম অভিব্যক্তি। ভেতরে কর্মের বিদ্যুৎ-বেগ, বাইরে প্রস্তরের স্থির স্তব্ধতা। মন্ত্র-শক্তির ঐতিহাসিক আদর্শ।

(৮)

আদালতে দিনের পর দিন তারিখ পড়ছে। কারণ তখনো দুটী অভিযোগ ঝুলছে তাঁর শিরে। শারীরিক কারণে আদালতে উপস্থিত হতে পারেন না। কিন্তু গভর্নমেন্ট সজাগ।

এলগিন রোডে তাঁর বাড়ীর সামনে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয়, প্রত্যেক চেয়ার দল। চৌরঙ্গীর ট্রামরাস্তা থেকে এলগিন রোডের প্রত্যেক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে সংগোপনে সতর্ক প্রহরীর দল।

বাংলা দেশে সকলেই বিস্মিত আবেগে শুনলো, সুভাষচন্দ্রের শেষ সঙ্কল্পের কথা। যে বার শিরের শপথ করে গড়ে তুলতে লাগলো হাজার অনুমান।

বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ রুদ্ধ করে দিলেন। দোতলায় তাঁর ঘরের দরজা থেকে বাইরে বারান্দার শেষ পর্যন্ত কেউ যেতে পারে না। [illegible] একবার দিনে একবার সামান্য কিছু ফল অথবা ফলের রস রেখে দিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন বাসনের খুপরি থেকে উচ্ছিষ্ট পাত্র নিয়ে যায়

কারুর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না, সুভাষচন্দ্রের শেষ-পরিণতি সম্বন্ধে···ভারতের সনাতন কর্ম-বিমুখতা·····আত্মার মুক্তির সাধনা···

এলগিন রোডের পাহারা-নিযুক্ত চরেরা মাঝে মাঝে দেখতে পায়, একটা খোলা জানলা দিয়ে, ঘরের মধ্যে যে একজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ছায়া।

সেই ছায়া তাদের সন্ধ্যা···কারণ, ছায়া প্রমাণ করে কায়ার অস্তিত্ব।

(৯)

সহসা এক চল্লিশ সালের মাঝামাঝি আমরাবতী, সমগ্র ভারত বিস্ময় বিস্ফারিত শুনলো, সন্ধ্যাসকালী সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়ী থেকে, সন্ধ্যাসতর্ক এলিসিয়াম রো'র প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন··· কাবুল কা-আশ্রমে নয়, হিমালয়ের গুহায় নয়·····একেবারে ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ ইউরোপের পথে·····

বিপ্লবীদের রোমাঞ্চিক জীবন-ইতিহাসে এই যাত্রার অন্তর্ধানের যে কাহিনী আমরা জানি, কিন্তু সতর্ক বৃটিশ-গোয়েন্দা এড়িয়ে এইভাবে ভারতবর্ষ থেকে বেমালুম অন্তর্হিত হওয়া, সুভাষচন্দ্রী বিপ্লবীদের ইতিহাসেও খুব কচিৎ ঘটেছে।

সমগ্র বৃটিশ চর-নিয়োগ যেন অস্থির হয়ে পড়লো…

ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে, প্রতি গ্রাম থেকে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা ওঠে, কোথায় সুভাষচন্দ্র?

সবাই অনুমান করে কিন্তু কেউই ঠিক করে কিছু বলতে পারে না।

শুধু একটা বিস্ময়, অদৃশ্য আকারে এই রহস্যময় মৌনী ব্যক্তিত্বকে ঘিরে জাতির অন্তরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

এতদিন যাকে অতি-পরিচিত রূপে জেনেছি, বুঝেছি, বুঝেছি বলে মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আজ সহসা যেন মনে হয়, সে তার অতি অসম্পূর্ণ পরিচয়। যেখানে পড়েছিল সমাপ্তির যতি-চিহ্ন, সহসা সেখানে দেখা দেয় নতুন আরম্ভের নক্ষত্র।

দূর মেঘের মত অস্পষ্ট কি যেন আশা জেগে ওঠে জাতির চিত্তাকাশে।

বিশ-শতাব্দীর মধ্যপাদে নিঃশেষিত-প্রাণ বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে মহা-রিক্ততা মরুভূমির মত এগিয়ে আসছে, সে কি তাহলে আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে জাতির এই সর্বশেষ প্রতিনিধিকে আশ্রয় করে? বাঙালীর যৌবন কি ফিরে পাবে আবার তার গৌরবের স্থান ভারতের প্রাদেশিক সভায়?

অনুকূল উত্তর দেবার মতন কোন প্রমাণ বাঙালী খুঁজে পায় না। শুধু অন্তর থেকে এক ব্যাকুল প্রার্থনা ওঠে, তাই সত্য হোক! হে ভগবান, তাই সত্য হোক!

(৩৩)

কিছুকাল পরে সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার জাতির ক্রমবর্ধমান কৌতূহল নিবারণ করে সর্ব-সাধারণের কাছে জানালেন,

১৭ই জানুয়ারী রাত্রি তখন একটা বেজে পনেরো মিনিট… আমি আর মেজদাদা বোটমে বেরিয়ে পড়ি… চারদিক আলোয় ভরা রাত্রি! কলকাতা শহর সুষুপ্ত। বাড়ীর সকলে নিদ্রামগ্ন। পশ্চিমা মুসলমানের বেশে নেতাজী। গাড়ী কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর এসে পড়লো। প্রভাতে নিকটে একস্থানে আত্মগোপন করে থাকা হলো। তারপর আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে যাত্রা আরম্ভ হলো। ধানবাদ ষ্টেশনে এসে নেতাজী নামলেন এবং সেখান থেকে উত্তরগামী এক ট্রেণে চড়ে বসলেন।… নেতাজী চলে গেলেন।… আমি ফিরে এলাম…

জাতির অন্তরের কতটুকু কৌতূহল নিবারিত হলো তা জানি না, কিন্তু আমার অন্তর কৌতূহল বিহ্বল পরিচয় হলো না।

এলগিন রোডের তাঁর বাড়ীর সামনে গুপ্তচরেরা রেখে গিয়েছে। সারা এলগিন রোড প্রদীপ্ত। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। সময় নির্জন। সে সময়ে তাঁর বাড়ীর সামনে থেকে একটা মোটর বেরুলো, সারা এলগিন রোড ঘুরে চৌরঙ্গীতে এসে পড়লো···একজনও গুপ্তচরের চোখে তা পড়লো না? তারা সন্দেহ পর্যন্ত করলো না, কার এই গাড়ী? কে-ই বা গাড়ীর মালী? সিকার তাদের সীমার বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত, তারা সন্দেহ করবার অবকাশ পর্যন্ত পেলো না? কি করে তা সম্ভব হলো?

না, তাদের সকলের চোখে সেই সময় ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ঘুমের মায়া-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলেন? এবং সাতদিন ধরে সেই মায়ার বাঁধনে তারা বন্দী হয়েছিল?

জ্যোৎস্না-বিধৌত রাত্রিতে টপ্-স্পীডে সেই মোটর-অভিযানের যে অতি সহজ সরল কাহিনী শিশিরকুমার আমাদের পরিবেশন করেছেন, বিপ্লব-চক্রান্তের ইতিহাস-অভিজ্ঞ মন কিছুতেই তা সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে না।

হয়ত এরপর তাঁর বক্তব্য উদ্ঘাটিত হবে। ইতিমধ্যে কল্পনা-বিলাসী মন একটা অনুমান তৈরী করেছে··· নিছক অনুমান···প্রাচীন জগতের ইতিহাসের বহু সুপ্ত স্থান ভরাট করতে ঐতিহাসিকেরা যে-অনুমানের আশ্রয় নিতে মাঝে মাঝে বাধ্য হন···

এলগিন রোড

ফুটপাথের ওপর থেকে দোনমুহী গুপ্তচরেরা চেয়ে আছে দোতলার ঘরের দিকে। দেখে, দেয়ালে পড়েছে সেই ছায়া। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেজাধবলী, তার ছায়া পড়ছে দেয়ালে···

তারা নিশ্চিন্ত···শিকার ঠিক আছে।

হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রিতে এসে দাঁড়াল একটা মোটর।

মোটরের মধ্যে থেকে নামলেন দুজন সন্ন্যাসী। একজনের মুখে দীর্ঘ দাড়ি···দুজনেই চেনা যায়, অর্থাৎ দাড়ি দেখলেই চেনা যায়।

তাঁরা নেমে ভেতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে এলেন। মোটরে উঠলেন।

মোটর চলে গেল।

প্রহরীরা দেখলো···ঘরে ছায়া দুজনে। শিকার ঠিকই আছে।

যে-পথে সুভাষচন্দ্র যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন, হয়ত এই সন্ন্যাসীরা সেই পথেরই অগ্র-পথিক···ঈশ্বরদাই···

পরের দিন আবার এলো সেই মোটর। সেই দুজন সন্ন্যাসী নামলেন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আবার তেমনি দুজনে মোটরে এসে উঠলেন। মোটর ছেড়ে দিল।

ঘরের দেয়ালে ছায়া, ঐ, ছায়া ঠিকই আছে। অতএব কায়াও আছে…

তৃতীয়বার আবার এলো সেই মোটর। তেমনি গভীর রাত্রিতে। সেই দুজন সন্ন্যাসী নামলেন…একজন সেই দাড়িওয়ালা। চিনতে দেরী হয় না।

কথাবার্তা সেরে বাড়ীর ভেতর থেকে আবার তেমনি দুজনে ফিরে এসে মোটরে উঠলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

ঘরের দেয়ালে তেমনি ছায়া দুলছে…অতএব নীকায় ঠিকই আছে…

কিন্তু আর রাত্রিতে মোটর আসে না। কিন্তু খাবার যে দেয়, সে নিয়মিত খাবার দিয়ে যায়।

ঘরের ভেতর থেকে উচ্ছিষ্ট পাত্র তেমনি বারান্দার বাইরে আসে…

ঘরেতে ছায়া তেমনি ঘোরে…

এমনি চলে যায় কিছু দিন। কোথাও যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে, তা সন্দেহ করবার কোন কারণই কারুর ঘটে না।

তারপর একদিন হঠাৎ পাহারার ওয়ারলেসে দেখে, দেয়ালে ছায়া আর পড়ে না…খাবার যে দিয়ে যায়, সেও উচ্ছিষ্ট পাত্র আর ঘর থেকে দুয়ারের বাইরে কেউ এগিয়ে রাখে না…

সন্ন্যাসী তখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে কাবুলে উত্তমর্চান্দের আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছেন।

তৃতীয়বার মোটর থেকে যে দুজন সন্ন্যাসী নামেন, আর যে দুজন সন্ন্যাসী দেখা করে আবার মোটরে এসে ওঠেন, তার মধ্যেই ঘটে গিয়েছে লোক-বিনিময়। সেই দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতি রূপে সুভাষচন্দ্রের ঘর থেকে গেলেন, দাড়িওয়ালা সুভাষচন্দ্র সেই সন্ন্যাসীর বেশে মোটরে করে উঠলেন। পূর্বেও দুবার এই রকম সন্ন্যাসীর আনাগোনা দিয়ে গিয়েছে। সুতরাং এবারের বিশেষ কিছু সন্দেহ করবার কথা তাদের মনে আসে নি।

[illegible] তেমনি উচ্ছিষ্ট পাত্র দরজার বাইরে রাখা হতে লাগলো…

[illegible]…

[illegible]…

তার পর একদিন ভোরবেলা সদর ফটক খুলে গেল প্রকৃত সন্ন্যাসী, গেরুয়া পোষাকের পরিবর্তে বিদেশী পোষাকে সজ্জিত হয়ে……

ছায়া তখন থেকে আর দেয়ালে পড়ে না……

(১৯)

শুধু এস দেদিন অবাধ্য বলে সুভাষচন্দ্রকে শাস্তি স্বরূপ কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করলো, সেদিন বিদুষীর মনে তাঁর বলাপর সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ ঘুচে গেল। তিনি আজ মুক্ত, তাঁর নিজের ভিতর। এতদিন [illegible]

মনের মধ্যে যে দুরন্ত যোদ্ধাকে অহিংস অসহযোগের খোলস পরিয়ে শান্ত করে রেখেছিলেন, সেরূপ খুলে ফেলে দিয়ে সে সৈনিকের বেশে ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেলো।

ভারতবর্ষের বাইরে তখন চলেছে জগতের ভাগ্য নিয়ে ভয়ানক নয়ন-খেলা। সমস্ত জগৎ একটা বিরাট যুদ্ধের ভীত।

হিটলার ভিক্ততার আলোকে সুভাষচন্দ্র ইংরেজের রাজনীতির ধারার সঙ্গে মিশিয়ে ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে দেখলেন। অতীতে তাঁর পূর্বগামী কোন কোন বিপ্লবী বাইরের দিক থেকে ভারতের রাজনীতিকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁদের সীমাবদ্ধ চেষ্টা বাইরের সাহায্যে ভারতের মুক্তি-অভিযানের পরিকল্পনাও তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তার আংশিক অভিব্যক্তিও ঘটেছিল—কিন্তু নানা কারণে তা সফল হতে পারে নি। বাঙালীর মনস্তত্ত্বে চেতনার অন্তরালের মধ্যে দিয়ে সেই শিকল-ছেঁড়ার স্বপ্ন-পথ ওতপ্রোত ভাবে থেকে যায়। মুণ্ডমালিনী শ্মশানবিহারিনী শ্যামাকে একমাত্র বাঙালী সাধকেরাই জননীরূপে আহ্বান করেছে··· তার ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে বাঙালী ভীত হয় নি। তাই বাংলার নরম পলিমাটি দিয়ে যেমন তারা নবনীকোমল দুর্বাদলশ্যাম মূর্তি গড়ে তুলেছে, আর একদিকে তেমনি গড়ে তুলেছে নিশীথকালোদরী দিগম্বরা শিব-বিমর্দিনী অসিপাশধারিণী রুধির-পিপাসার্তা শ্যামা সংহার-রূপিনী। বাংলার ইতিহাসের সেই অন্তর্লীনা চেতনা-ধারা সম্পূর্ণভাবে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সেদিন আত্মব্যক্ত হয়ে উঠলো। সমগ্র প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে তাই সম্পূর্ণ একা বেছে নিলেন সেই রুধিরাক্ত আহবের পথ। সেদিন কোন সহায়ের সম্ভাবনা নেই, কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন সংযোগন চুক্তির ভরসা নেই কোন অনুগামী সহকর্মীর সন্ধান পর্যন্ত নেই··· কোন অন্তরে শুধু দুর্জয় বিশ্বাস··· আর নিজের আহবের প্রতি দুর্নিবারতমঅনুরাগ, এই একটি লোক কাঁপিয়ে পড়লো বিশ্ব-আহবের মধ্যে, মহাশূন্যের পথ-হীন অরণ্যের মধ্য থেকে পথ কেটে বার করতে। এতখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে এমনি সহায়-সম্বল-হীন হয়ে আর কোন বিপ্লবী এতখানি সম্ভাবনার আশায় ঝাঁপ দেয় নি।

সেদিন হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ এই চরম দুঃসাহসী আদর্শবাদীর অন্তরের আহবের কথা কেউই জানতো না। আজ সংবাদ-পত্রের মারফৎ আমরা অনুমান করতে পারি, হয়ত একমাত্র মহাত্মাজীর কাছেই তিনি তাঁর অন্তরের স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেই দুঃসাহসিক একক-যাত্রা থেকে মহাত্মা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন কিন্তু যখন বুঝলেন, এ অগ্নিবীজের গতি কোন উপদেশেই শান্ত হবে না, তখন তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তোমার আদর্শে তুমি যদি সত্য হও, সব চেয়ে সুখী আমিই হব।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সেই উক্তিকে হয়ত আশীর্বাদ রূপেই গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র সেদিন নিরুদ্দেশের পথে একা যাত্রা করেন···

সে-সময় অনুমান করলেও, সুভাষচন্দ্রের এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে ছিল, স্বপ্নের চেয়েও সুদূর। তাই তারা অন্তরোদ্গত আহবের বাস্তবতা এবং যুদ্ধের আতঙ্কের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কথা কার্যত ভুলে গেল। যাদের মনে রইলো, তারা তাদের অনুমান এবং চিন্তাশক্তির প্রখরতা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রকে বিদেশী রাষ্ট্রের আশ্রিত এবং কৃপাপ্রার্থী একজন রাজনৈতিক সুবিধাবাদী রূপেই কল্পনা করে নিলো। কেউ কেউ

প্রকাশ্যে তাঁকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করলেন, বাইরের শত্রুকে ঘরে ডেকে এনে যারা ভারত-হিতৈষীদের পার্টীর কলঙ্কিত হয়ে আছে, তাদেরই সহ-পথ্যাত্রীর একজন বিবেচনা করে তাঁর সম্বন্ধে তাঁরা হতাশই হয়ে পড়লেন। এই ভাবে সুভাষচন্দ্র জাতির সংগ্রামমূলক চেতনার অতল অন্ধকার তলে ডুবে গেলেন। শুধু রয়ে গেল, এক বিরাট প্রহরের হাত এড়িয়ে পালিয়ে যাবার কাহিনীর রহস্য একটা রোমাঞ্চকর প্রশ্ন ও বিস্ময়।

(৯৩)

আর যতটুকু ঘটনা জানতে পারা গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, সুভাষচন্দ্র ভারত-ত্যাগের জন্যে একটা রীতিমত পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। এবং এই কাজে তাঁকে সহায়তা করবার জন্যে একটি নিপুণ বিপ্লবী-চক্র কাজ করতে থাকে···নিঃশব্দে···গোপনে···

সেই চক্রান্ত অনুযায়ী নিজের বেশ-পরিবর্তনের অথবা নেপথ্য-বিধানের জন্যে সুভাষচন্দ্রকে নির্জন ঘরে কয়েক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়···অর্থাৎ সুদীর্ঘ দাড়ি গজাতে যতটুকু সময় লাগে। যেমন অভিনেতার তেমন দুরাকাঙ্ক্ষী বিপ্লবীদেরও অঙ্গ-সজ্জা এবং সজ্জা-পরিবর্তনের আড়ম্বরে আয়ত্ত করতে হয়।

এলগিন রোডের নির্জন ফ্ল্যাট ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র যখন পেশাওর-যাত্রী ট্রেণের কামরায় এসে বসেন, তখন তাঁকে দেখে চিনতে পারা সোজাসুজি অত্যন্তেরও প্রায় অসাধ্য ছিল। গায়ে আঁটসাঁট পাঠানী পায়জামা, পেরওয়ানী আর মাথায় ফেজ। অর্ধেক মুখ ঢেকে সযত্ন-রক্ষিত দীর্ঘ দাড়ি।

ট্রেণের যে কামরাটিতে এসে উঠলেন, তাতে তখন অন্য কোন যাত্রী আর ছিল না। কিছুদূরে [illegible] পথে ট্রেণের কামরায় বোবা না হলে মৌনী থাকবার উপায় [illegible]···

···ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক সূত্র হিসাবে পরস্পরের পরিচয়ের আদান-প্রদান।

সুভাষচন্দ্র পরিচয় দিলেন, মক্কা যাত্রী···নাম জিয়াউদ্দিন···পেশা, ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি···এবং সেই কাজেই রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হচ্ছে·····

ট্রেণে এসে গাড়ী থামলে, বন্ধুর কামরাটা মুখের সামনে রেখে সংবাদ-পত্রটি মনঃসংযোগ করেন···ভাগ্যক্রমে নতুন আর কোন যাত্রীর আগমনের উৎপাত তাঁকে আর সহ্য করতে হয় নি···

একটি সম্পূর্ণ দিন ট্রেণেই কেটে গেল। তার পরের দিন রাত্রি ন'টার সময় মৌলভী জিয়াউদ্দিন সাহেব পেশাওর ষ্টেশনে নামলেন। পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী ষ্টেশনের বাইরে মোটর অপেক্ষা করছিল।

জিয়াউদ্দীন পেশাওরের চক্রান্ত-কেন্দ্রে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখান থেকে তাঁকে হতে হবে ভারত-সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্থানে। দূরন্ত পথ চলে তাঁর নেপথ্য-বিধান।

(১৪)

ইন্দ্রিস[illegible] সর্দারজীর বেশ পরিবর্তন করে সাজলেন তীর্থ-যাত্রী পাঠান, মোল্লা এবং কাবুলী [illegible] সাজলেন, সার্দি সাহেবের সরদারে।

[illegible] থেকে জিয়াউদ্দীন দুজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে আফগানের রাস্তা ধরলেন। এই দুজন পাঠান বন্ধুর মধ্যে [illegible] আমরা জানি না, অপর জনকে আমরা জানি রহমৎ খাঁ বলে। জানি না রহমৎ খাঁ তাঁর আসল নাম কি ছদ্মনাম, তবে একথা জানি, সেদিন ওঁদেরই মত তিনজন স্বাধীনতা সন্ধানের মধ্যে দিয়ে বাঘা আর পাঠান মুলুক এক হয়ে গিয়েছিল···সেদিন পাঠান-মুল্লা বেশধারী সুভাষচন্দ্রকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তা থেকে ভারত-ইতিহাসের অখণ্ড মহা-সম্ভাবনাকে অতীতের বস্তু বলে মনে করবার কোন কারণ দেখি না। যে রসায়নে বিষ ধাতু স্বর্ণকে রূপে ধরে, সেই রসায়নের সন্ধান আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে পেয়েছি নেতাজীর জীবনে·····তাঁর সমগ্র অভিযান হলো ভারত-চেতনার একত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ। পঞ্চাশ বছরের কংগ্রেসের ইতিহাসে যে ছোটোকে দেখেছি কখনো আধখানা সকল হতে, কখনও বা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে, এই একটী লোকের জীবন-এ খণ্ডীকৃতকে আজ পূর্ণে গোনা বৎসরে দেখেছি, শুধু তার দৈহিক সম্পূর্ণতা নয়, তার আত্মিক সমগ্রতা। মোগল-তাজিকীন একটা স্বয়ংপূর্ণ পরিপূর্ণত্বের প্রাণবন্ত মূর্তি। ভারত-ইতিহাসের দিব্য সম্ভাবনা। সেখানে পাঠান, শিখ, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান একসঙ্গে চলেছে অনির্দিষ্ট মৃত্যু-অভিসারের পথে·····

আমরা ভেবে পেরিয়ে কিছু দূরে গাড়ী বদল এক গ্রামে এসে মোটর থেমে গেল মোটর যাবার রাস্তা আর নেই···সামনে উঁচা নীচা পথ, পাথর আর কাঁকর।

জিয়াউদ্দীন সেই গ্রামেই থেকে গেল। ভোর হতে মোটর নিয়ে দু'জন পাঠান বন্ধুর মধ্যে একজন ফিরে গেলেন। সঙ্গে রইলেন শুধু রহমৎ খাঁ···রহমৎ খাঁ, আজ স্বাধীনতার লীলাভূমি উৎসবের তোমার নামে যদি কেউ অভ্যর্থনা না করে থাকে, নাই করুক, একজন বাঙালী সাহিত্যিক আজ কৃতজ্ঞ প্রণাম জেনে দূর থেকে তোমাকে প্রণতি নিবেদন করলো। পাঁচাড়ের সেই মৃত্যুসঙ্কুল তরুকণ্টকিত পথে ভারতের মুক্তি-অভিযানে তোমার সেই অনন্য নীরব তৈরী-সাধনা, আজকের এই ঘটনা-বহুল দিনগুলি বিস্মৃত হয়ে যাবে, সেদিনও পর্যন্ত রূপকথার মৃত্যুহীন স্বপ্নতিত এই অপরূপ মূর্তির ভারতের তরুণের মনে মুক্তি-কামনার রূপক রূপে বিরাজ করবে···· মনুষ্যত্বিক ইতিহাসের উপকথা থেকে ভবিষ্যৎ মুক্তি-সাধনার ইতিহাসের লেখক তোমাকে পুনরুদ্ধার করবে।

[illegible] থেকে সুভাষচন্দ্র রহমৎ খাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে কাবুলের দিকে যাত্রা করলেন। একটু তাড়াতাড়ি থেকে বেহেস্তী রঙে চঞ্চল বন্দুকধারী দুজন পাঠান। সীমান্তের এই জনবিরল পথে কোথা দিয়ে কখন যে মৃত্যু আসতে পারে, তা কেউ জানে না। এ-পথের প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে, আশে-পাশের প্রত্যেক পাথর-ঢিপির আড়ালে, ঝুলির ভিতরে সে লুকিয়ে থাকে মৃত্যু।

[illegible] মুসলমান মেলনীয় পোষাক পরিবর্তন করে জিয়াউদ্দীন সাহেব যদিও পাঠানের পোষাক পরেছিলেন কিন্তু পোষাক পরলেই তো পাঠান হওয়া যায় না। চেহারা এবং দাড়িতে আটকায় না কিন্তু

আটকায় কথা কয়ে গেছেই। সুতরাং জিয়াউদ্দীনকে এখান থেকে মূক ও বধিরের ভূমিকা অভিনয় করে অগ্রসর হতে হল।

বন্ধুর পার্বত্য পথ···বাংলার মসৃণ সমতল ভূমি নয়। সারাদিন সমানে সেই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার মুখে উপজাতিদের এক গ্রামে এসে যখন পৌঁছলেন, তখন ক্লান্তিতে দেহ অবশ হয়ে এসেছে। সেই গ্রামের আমীর-গরীব সকলে এক বাক্যে বলে আছে। সেই দুর্গম পার্বত্য গ্রামের অতিথি হয়ে সাহেবের আতিথ্যে সে-রাত্রি বসতিহীন কেটে গেল।

পরের দিন ভোর বেলা আবার হলো যাত্রা শুরু। সঙ্গে বন্দুকধারী যে দুজন পাঠান এসেছিল, তারা ক্লান্ত হয়ে সেখান থেকে ফিরে গেল। নতুন তিনজন সঙ্গী জোগাড় করলেন মুসাফির খাঁ। তিনজনেই বন্দুকধারী।

এখান থেকে পথ আরো দুর্গম হয়ে উঠলো। এত দুর্গম যে পাঠান দেহেও একটানা বেশীক্ষণ হাঁটা সম্ভব হয় না। চলতে চলতে পথের ধারে ক্ষণিকের তরে বিশ্রাম···আবার পথ চলা। এই ভাবে সারাদিন পায়ে হাঁটার পর তাঁরা লালপুরায় এসে পৌঁছলেন। আগে থাকতেই চক্র থেকে এখানে রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। লালপুরার খান সাহেব তাঁকে যাবার সময়ে একটা পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন, যদি পথের মধ্যে কেউ আটক করে, এই পরিচয়-পত্র দেখালেই ছেড়ে দেবে·····

এরপর সেই বন্ধুর পার্বত্য-পথ পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লৌহ-দেহও ভেঙে পড়ে কিন্তু কিশোর কাল থেকেই দুর্ভাগ্যকে সাধনা করেছেন, মরণের শাসনে দেহকে সংযত করতে···তাই সেদিন সেই দুরূহ দৈহিক যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। যেন জীবনের এই অন্তিম অভিব্যক্তির কথা পরম পরোক্ষে স্থির জানের উপর থেকে দৃঢ়সঙ্কল্পতার রূপ গ্রহণ করেছিলেন। চরম বিপ্লবের পথ হলো [illegible] পথ। [illegible] সন্ন্যাসী।

(১৫)

লালপুরা থেকে কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে অগ্রসর হবে আরো পর, সামনেই পড়লো কাবুল নদ। নদের ওপার থেকে বাকি রোটরের ভাল রাস্তা আছে। আশ্বস্ত হবার কথা।

কিন্তু নদীর ধারে এসে দেখলেন, পারাপারের জন্যে কোন নৌকা নেই। [illegible] খলের [illegible] এক জায়গায় বেঁধে যে জিনিসটা তৈরী হয়, তার উপর বসেই নদী পার হতে হয়। মনে পড়ে, হুমায়ুনের ভিস্তির সাহায্যে নদী পার হওয়ার কথা।

নিরুপায় হয়ে, সেই চামড়ার থলের সাহায্যেই নদী পার হতে হলো। [illegible] থেকেই সুরু হলো [illegible]। নদীর ওপারে পড়ে রইলো আত্মীয়-স্বজনবর্জিত কেউ-না-বালিকের মেয়ে। সঙ্গে এতক্ষণ পর্যন্ত [illegible] যে তিনজন সঙ্গী এসেছিল, তাদের বিদায় দিয়ে হলো কারণ আফগান-রাজের আইনে প্রবাসী [illegible] আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হাঁটবার অধিকার কারুর নেই।

কিন্তু সেই সোজা সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবার একটা বড় বিপদ ছিল, তাহলেই পড়ত থানার ঘাঁটী। এই ঘাঁটি দিয়ে যে যাবে, তাকেই তল্লাস করে তুরাসী করে দেখা হবে। সুতরাং সেই ঘাঁটি এড়িয়ে যেতে হবে। তা যেতে হলে আর একটী পথ আছে বটে কিন্তু তা যেমন দুর্গম, তেমনি দীর্ঘ। পায়ে হেঁটে তাকে তিন দিন সময় লাগে। নিরুপায় হয়ে সেই দীর্ঘ পথই ধরতে হলো। মন চলে কিন্তু দেহ আর চলে না। তৃতীয় দিনের পর তাঁর জ্বর এসে পড়লো।

সৌভাগ্যবশত তাঁরা যে বাসাটীতে এসে পড়লেন, চারদিকের সব কিছুর মধ্যে সে-আস্তানাটা ছিল একদম নিরিবিলি। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের সারি এবং একটা ঝাউয়ের কাছে একটা কুয়ো ছিল। সেখানকার লোক সেইঘরে আস্তানাটাকে টাণ্ডী বলে।

পথের শ্রমে ও জ্বরে রহমৎ খাঁ জিয়াউদ্দিন গাছের তলায় মাটিতে মেরে এলিয়ে দিলেন। কখন যে বাস আসবে, তার কিছু ঠিক নেই। রহমৎ খাঁ জেগে দাঁড়িয়ে রইলেন বাস ধরবার জন্যে…

ক্লান্তিতে তন্দ্রা থেকে কখন ডুবে যান অতল ঘুমের তলায়। রহমৎ খাঁ যখন তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন তখন দেখেন রাত্রি গভীর পাশেই একটা বাস দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বাসে উঠে দেখেন, কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। পুঁটলির মতন ঠেসাঠেসি করে যাত্রিরা ভেতরে বসে আছে আর তাদের উপরে ব্যাকস-প্যাটেরা ভর্তি।

বাস-চালক রুক্ষস্বরে রহমৎকে বলে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে। কিন্তু জিয়াউদ্দিন বুঝতে পারেন না, উঠবেন কোথায়। অবশেষে বুঝতে পারলেন, বাসের ছাদের উপর সেই বাক্স-প্যাটেরার ওপরে তাঁদের দুজনকে বসতে হবে। নিরুপায়। কোন রকমে পাহাড়ে উঠবার মতন করে সেই বাক্সের ওপরেই চড়ে বসতে হলো। বাস ছেড়ে দিল। প্রতিমুহূর্তেই মনে হয় সেই বাক্স-প্যাটরার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাঁকেও হাত-পা ভেঙে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে যেতে হবে।

কিন্তু বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, সে-কষ্টটা তেমন কিছুই নয়। উত্তুঙ্গ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। মাথার উপর আকাশ [illegible] থেকে ঝরে পড়ছে। বাস যত জোরে চলছে, বাতাস তত খারাপ হয়ে উঠছে। শালিত তীরের মত [illegible] চলেছে। নিরাবরণ দেহে হাড়ের ভেতর কন্ কন্ করে উঠছে। গায়েও কোন কাপড় নেই। [illegible] ছাড়া কোন উপায় নেই। তীর বুঁজে বসে থাকতে হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ [illegible] তার হয় না। পাশের গায়ে হঠাৎ মুক্ত-বাধা শাখা-বাহু মেলে থাকে, [illegible] হাতে এগিয়ে আসে [illegible] সে-আশীর্বাদে ভরে যায়। মনে হয়, জীবনের চরম [illegible] জীবনের এই শেষ [illegible]

কাণে কাণে [illegible] করেন, আর কোন ভাল বাস পাওয়া গেল না?

রহমৎ খাঁ জবাবে [illegible] থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছি…তারা উপেক্ষা করে চলে গিয়েছে [illegible] এই রাত্রিটা মাঠের ধারখানে বরফ চাপা পড়ে থাকতে হতো…

হায়, কোথায় সোনালী—বিট—[illegible]···হুগ্ধফেননিভ শুভ্রকোমল উষ্ণ শয্যা···নিশ্চিন্ত শয়নের নিবিড় আরাম···
আর কোথায় এই দুর্বাদলশঙ্কিত হিম-রাত্রির মৃত্যু-আলিঙ্গন!

(৬)

অবশেষে সে-রাত্রিও শেষ হলো। সারারাত্রি তুষার-পাত আর কুয়াশা হিমেরই সঙ্গে সংগ্রাম করে পরের দিন সকালের দিকে বাস বাঁটখাকে এসে থামলো।

প্রবাসে প্রত্যেক যাত্রীকে দিতে হবে আত্ম-পরিচয়—কোথা থেকে আসছে, কোথায় যা যাচ্ছে, কেনই বা যাচ্ছে?

আফগান রাজকর্মচারী জিয়াউদ্দিনকে প্রশ্ন করতে নীরবে অঙ্গভঙ্গী করে তিনি রহমৎ খাঁকে দেখিয়ে দেন। রহমৎ খাঁ বলেন, আমার বড় ভাই, জন্ম থেকেই বোবা আর কালা···চলেছি সাথি সাহেবের দরগায়···

রাজী তাতে সন্তুষ্ট হন না। তখন লালপুরার খান সাহেবের দেওয়া পরিচয়-পত্র দেখান। নিষ্কৃতি।

বাস আবার ছাড়লো। বিকেলের দিকে কাবুলে এসে পৌঁছলো। তখন আবার দ্রুত বেগে বরফ পড়তে সুরু হয়ে গিয়েছে। কাবার আর বরফে পাত্রের তলার যে-জিনিষটী প্রকৃতি দেবী তৈরী করেছেন, তার বুকে দিয়ে অগ্রসর হওয়া রীতিমত কসরতের ব্যাপার।

সেই তুষার-পাতের ফলে যাত্রা তখনই বন্ধ-বিরতি হয়ে গিয়েছে। রহমৎ খাঁও এ অঞ্চলে এই প্রথম এসেছেন। পথঘাট সবই তাঁর অজানা।

[illegible] পথিকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, কাছেই একটা [illegible] সেখানে [illegible]

[illegible] সরাইখানার [illegible] দেখলেন, সামনে কতকগুলি উট, ঘোড়া বাঁধা আছে, বোঝা [illegible] আছে। চারিদিকে তুষারে [illegible] ছাড়া বিপদের যে থাকবার সম্ভাবনা আছে, তা কল্পনা করতে হলে রীতিমত দুঃসাহসিক মনোবৃত্তি [illegible] প্রয়োজন।

কিন্তু বাবে বাবে বাস্তব কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রথমে [illegible] দেখলেন, আসলে আস্তাবলটা বিপদের ভয়েই। রহমৎ খাঁ বহু কষ্টে সরাইওয়ালার প্রতিনি[illegible] ঘর দাও করে একটী ঘরের [illegible] করলেন।

ঘরটিতে ঢুকেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পড়লো, কারাগারের ছোট [illegible] স্মৃতি।

একটী দ্বার মাত্র। সেটা বন্ধ করলেই, শুধু দেখা যায় [illegible] তখন ভালরূপ বিচার করবার মতন চেহারে অবস্থা নয়। সরাইওয়ালার কাছ থেকে চা [illegible] র ওপর সেই এ[illegible] দিলেন। শীত নিবারণের জন্যে রহমৎ খাঁ চেষ্টাচরিত্র করে কি [illegible] যোগাড় [illegible] ঘুমাতে পেরে, ঘেঁষে বসলো। অধিকাংশ কাটাই জেগে। [illegible] তার

...আপের বদলে কেবল ধুলো উদ্গীরণ করতে লাগলো। তার ফলে সেই অন্ধকার গাড়ীটা চক্ষুর্নিমেষে ধুলোয় ঢেকে গেল। রহমৎ খুলে তাদের বাইরে বার করে দিতে লাগলেন, টিনের পাইপ থেকে বরফ-জমানো ঠাণ্ডা জলের ঝরণা বেগে ছুটে তাদের চাদরা তেল করে হাড়েতে শীতল বিরিয়ে দিল।

...র ভোর হলো। কিছুক্ষণ সেই অবে বিশ্রাম বা দেখার সঙ্গে সংগ্রাম করার পর, রহমৎ খাঁ বেরুলেন, খাবারের সন্ধানে।

...নিয়ে ফিরে এলেন। কাবুলী রুটী। খেতে গিয়ে মুখটাকে দেখলেন,...ক-ব্যঞ্জন-খাঁটি-দেশী সাহারার বাঁশু তাকে বশ্যতা পর্যন্ত করতে পারে না। অতঃপর তাকে ছিঁড়ে চারে ভিজিয়ে নরম করে কোন রকমে গলাঃকরণ করলেন।

এইভাবে কোন...রে আহার শেষ করে শয্যা নিতে না নিতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ লোষ্ট্রখণ্ডের মত নিদ্রা-সাগরে ডুবে গেল।

(১৭)

ভোর না হতেই তাঁরা দুজনে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়েন, যেকোন রকমেই হোক, ক-সুভাষের সঙ্গে যোগসাধন করতেই হবে...

রুশ-সুভাষের সামনে খুব বেঁকান...ভেতরে ঢোকবার আইন নেই...

দু'দিন নিরর্থক ভাবে ঘোরাঘুরির পর একদিন রহমৎ খাঁ দেখলেন, রক্তবর্ণ পতাকা উড়িয়ে একটা মোটর গাড়ী চলেছে। আফগানিস্থানে যখন গাড়ীতে রুশ-পতাকা উড়িয়ে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই সেটা রুশ-দূতাবাসের গাড়ী হবে। ইঙ্গিতে চালককে থামতে বলে, রহমৎ খাঁ গাড়ীর কাছে এগিয়ে যান।

গাড়ীর ভেতরে সম্ভ্রান্ত-বেশ একজন ভদ্রলোক বসে। রহমৎ খাঁর বিপদ হলো, তিনি রুশ ভাষা জানতেন না, ফার্সী সামান্যই জানতেন। সেই সামান্য ফার্সীতে তিনি কোন রকমে গাড়ীর আরোহীকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানালেন।

রহমৎ খাঁ বুঝতে পারেন, ভদ্রলোক তাঁর কথা বুঝতে পারছেন। তখন সংবাদ-পত্রে সুভাষচন্দ্রের পলায়নের কথা সবেই রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। সেজন্য তিনি রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুভাষবাবু তাহলে এখন কোথায়?

রহমৎ খাঁ অনুরে কয়েক পরে তাঁর ...ন সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন।

...হী প্রশ্ন করলেন, যদিও তা ...ভাষচন্দ্র, তার প্রমাণ কি?

...মৎ খাঁ এ প্রশ্নের...ছিলেন না। তা ছাড়া যৎসামান্য যেটুকু ফার্সী জানতেন, তাকে ভাঙিয়ে-গাড়িয়ে এই প্রশ্নের ...মৎ খাঁকে একবার ...গেল, ততক্ষণে মোটরখানি আবার ছুটতে আরম্ভ করেছে। ...ালের চাকায়...ল, পরপর পনেরোটা বা... ...ল ঘুরে বেড়ায়। মোটরবাহী রহমৎ খাঁকে সেই রকম ...ইনিই নয়া রহমৎ খেমে ছিলেন, নইলে

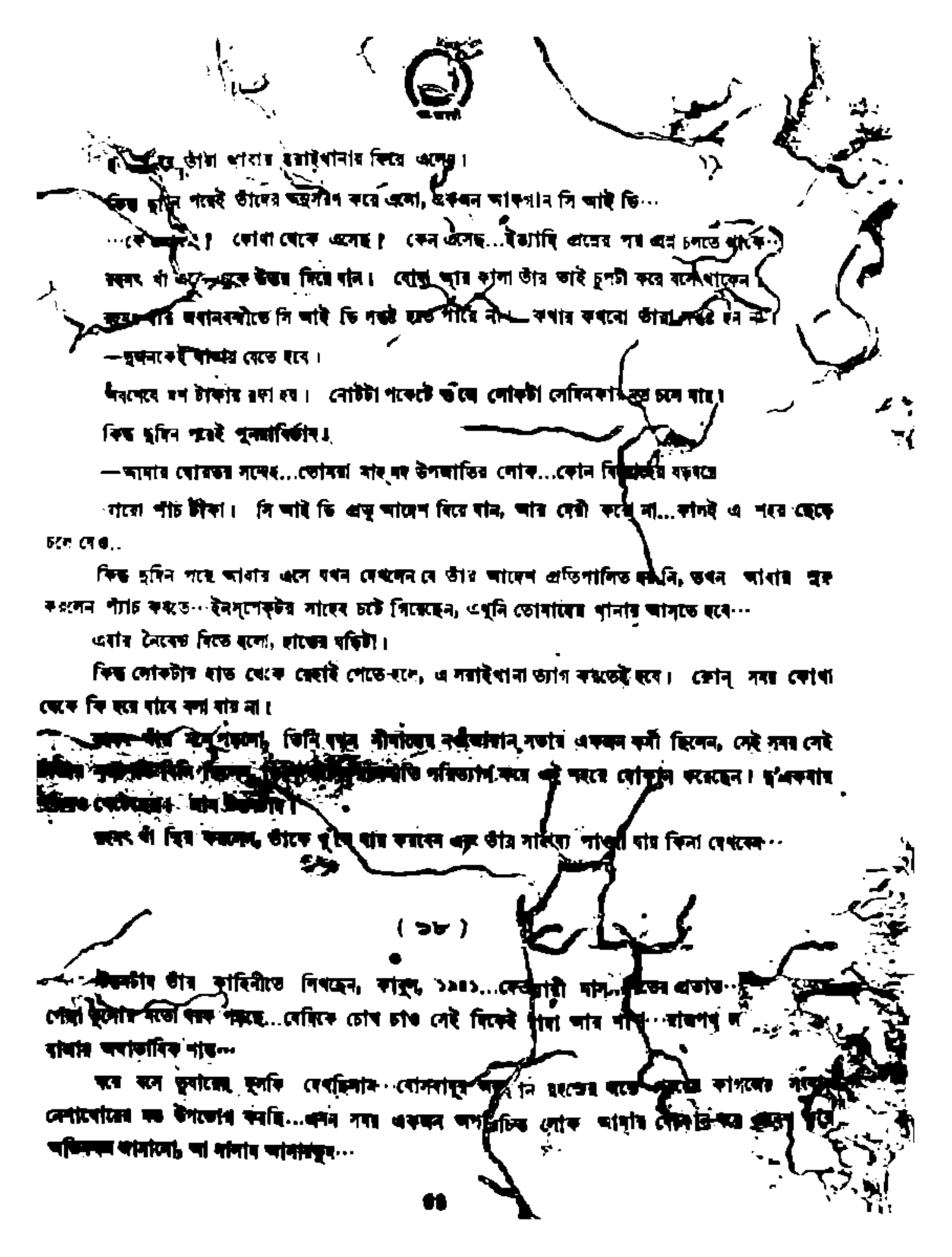

[illegible] তাঁরা আবার সরাইখানায় ফিরে এলেন।

কিছু ক্ষণ পরেই তাঁদের অনুসরণ করে এলো, একজন আফগান সি আই ডি…

…কে আপনি? কোথা থেকে এসেছ? কেন এসেছ…ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে থাকে… হবসন খাঁ এক এক করে উত্তর দিয়ে যান। বোসু আর কালা তাঁর ভাই দুজনে করে বসে থাকেন। অবশেষে অবাঙালীতে সি আই ডি পরাস্ত হতে পারে না—কথায় কথায় তাঁরা পরাস্ত হন না।

—দুজনকেই থানায় যেতে হবে।

অবশেষে দশ টাকার রফা হয়। নোটটা পকেটে গুঁজে লোকটা সেদিনকার মত চলে যায়।

কিন্তু দুদিন পরই পুনরাবির্ভাব।

—আমার যোরতর সন্দেহ…তোমরা মাদ্‌ধ উপজাতির লোক…কোন বিদেশীর ষড়যন্ত্রে

গরো পাঁচ টাকা। সি আই ডি প্রভু আদেশ দিয়ে যান, আর দেরী করো না…কালই এ শহর ছেড়ে চলে যেও..

কিন্তু দুদিন পরে আবার এসে যখন দেখলেন যে তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হয়নি, তখন আবার সুর করলেন প্যাচ কষতে…ইনস্‌পেক্টর সাহেব চটে গিয়েছেন, এখুনি তোমাদের থানায় আসতে হবে…

এবার নৈবেদ্য দিতে হলো, হাতের ঘড়িটা।

কিন্তু লোকটার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, এ সরাইখানা ত্যাগ করতেই হবে। কোন্ সময় কোথা থেকে কি হয়ে যাবে বলা যায় না।

[illegible] খাঁ ঠিক করলেন, তিনি বন্দর শীরাজের কর্মচঞ্চল সভায় একজন কর্মী ছিলেন, সেই সময় সেই [illegible] পরিত্যাগ করে এই শহরে ঘোরাফেরা করেছেন। দু'একবার [illegible]।

হবসন খাঁ স্থির করলেন, তাঁকে খুঁজে বার করবেন এবং তাঁর সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখবেন…

(১৮)

[illegible] তাঁর কাহিনীতে লিখছেন, কাবুল, ১৯৪১…ফেব্রুয়ারী মাস…[illegible] প্রভাত… পোহা [illegible] মতো ঝরঝর করছে…যেদিকে চোখ চাও সেই দিকেই সাদা আর সাদা…রাজপথ [illegible] বাবার অস্বাভাবিক গাঢ়…

ঘরে বসে ডুবারোয় [illegible] দেখছিলাম…বোসবাবুর [illegible] ঘরের কাগজের গন্ধ [illegible] মোসাহেবের মত উপভোগ করছি…এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আমার [illegible] ঘরে [illegible] অভিবাদন জানালো, আ জানায় আসনগুলি…

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে উত্তমচাঁদ দেখেন, তাঁর সামনে অদ্ভুতদর্শন এক [illegible] মূর্তি..... আগন্তুক বাঁ।

আগন্তুক টেবিলের একটু কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো। আপনার নামই উত্তমচাঁদ.....না ?

—হাঁ। কিন্তু আমার নাম, আপনি জানলেন কি করে ?

দোকানে তখন উত্তমচাঁদ এবং আগন্তুক ছাড়া, দোকানের একজন বালক কর্মচারীও উপস্থিত ছিল। আগন্তুক চোখের ইঙ্গিতে উত্তমচাঁদকে জানিয়ে দেন, তৃতীয় ব্যক্তির সামনে আলাপ করা সমীচীন নয়। উত্তমচাঁদ তাঁর কর্মচারী অবধূতনাথকে কৌশলে ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন।

তখন আগন্তুক তাঁর পরিচয় দিলেন, সীমান্তের মর্ঘান প্রদেশের খালাচ গ্রামে তাঁর বাসভূমি, নাম ভগৎরাম ..... বাধ্য হয়েই শিখ থেকে ইসলামের ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে হয়েছে। উত্তমচাঁদ যখন নওজোয়ান কোর সেক্রেটারী ছিলেন, তখন আগন্তুক সেখানকার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

উত্তমচাঁদ হুসৎ খাঁকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন।

—এখন বলুন, আপনি কি উদ্দেশ্যে এই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাছেই বা কেন এসেছেন ?

আগন্তুক বলে, আমি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে এসেছি.....তাঁকে ভব-সীমান্তে পৌঁছে দেবার জন্যে !

ঘরের মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাত হলে বোধহয় মুহূর্তস্বামী ভক্তখানি সচকিত হতেন না।

—আপাতত আমরা একটা জরুর সরাইখানার কোন হুজরে আছি কিন্তু সি আই ডির উৎপাতে সেখানে আর থাকা সম্ভব নয়। আপনার বাড়ীতে বোসবাবুকে কিছুদিন লুকিয়ে রাখতে হবে !

রাজনীতির সম্পর্ক ত্যাগ করে উত্তমচাঁদ দূর কাবুলে ব্যবসায়ীর জীবন যাপন করছিলেন, এক নিমেষের ধাক্কায় ভারত-ইতিহাসের অন্তঃপুরে এসে পড়লেন। তিনি রাজী হলেন।

হুসৎ খাঁ। জিন্নাউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে উত্তমচাঁদের বাড়ীর ভেতরে একটী ঘরে এসে উঠলেন।

উত্তমচাঁদের স্ত্রী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাপার ? বাড়ীর ভিতরে দুজন অপরিচিত মুসলমান... আমি একা থাকি..., তুমি কি [illegible] গেলে ?

উত্তমচাঁদ হাসতে হাসতে বলেন, [illegible] নয়.....বিনু !

কিন্তু আরো কাঁদুনে হয়ে ওঠে। নিজের কথা তাঁকে খুলে না বলে তিনি কিছুতেই বাড়ীতে দুজন অপরিচিত [illegible] দিতে পারেন না।

অগত্যা স্ত্রীকে সব কথা উত্তমচাঁদকে খুলে বলতে বাধ্য হন। এবং বলেন, আর তৃতীয় প্রাণী এ ব্যাপার জানবে.....এ শপথ তোমাকে করতে হবে।

অতিথি-চিন্তা অন্তঃপুরবাসিনী সংসার ও ঘরের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক... আমার প্রাণ থাকতে বোসবাবুর কোন ভয় নেই।

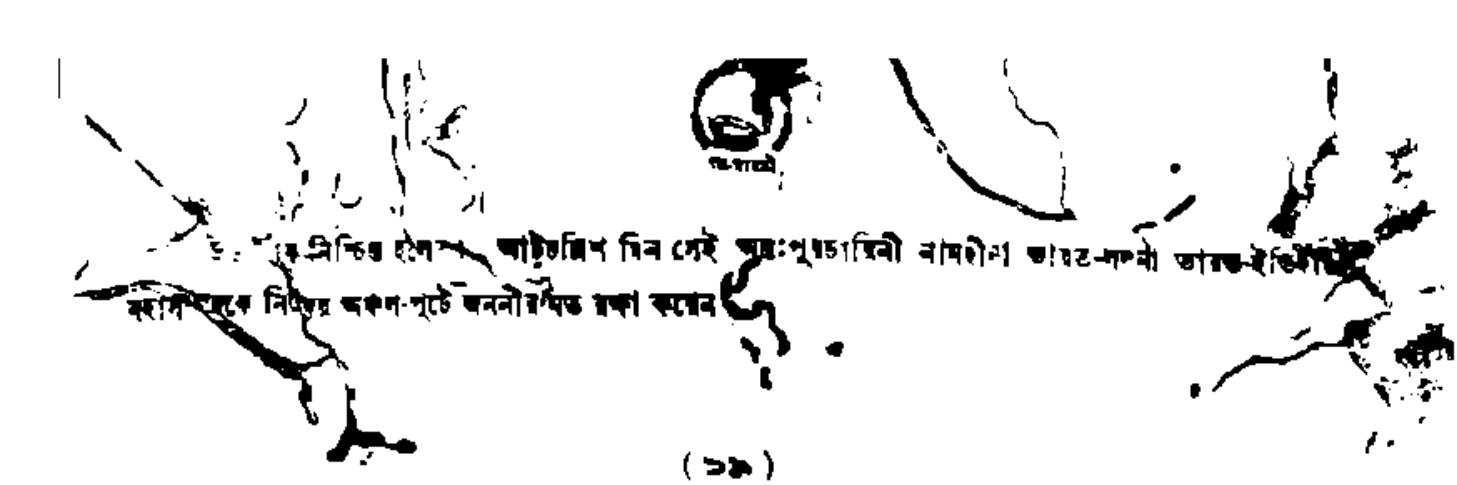

ইংরেজিতে হলেন... আট্চল্লিশ দিন সেই অন্তঃপুরচারিণী বামাদল ভারত-লক্ষ্মী ভারত-ইতিহাসের মহাসমুদ্রে নিজের অকল-পুটে অমনীয়ত রক্ষা করেন।

যে চেষ্টায় রুষ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা যখন সম্ভব হলো না, তখন মুতাক্কিন্ন রহমৎ খাঁকে ইতালীয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে অনুরোধ করতে বাধ্য হলেন। যেমন করেই হোক, তাঁকে য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছতে হবে.....তার পর তিনি তাঁর পথ খুঁজে বার করে নেবেন্।

একদিন তাগ্যের উপর নির্ভর করে রহমৎ খাঁ ইতালীয়ান্ দূতাবাসের ভেতর ঢোকা চুকে পড়তে অগ্রসর হলেন। দরজায় সশস্ত্র আফগান প্রহরী আটকালো। রহমৎ খাঁ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে জানালেন, সে ভাসানী দূতাবাসের চৌকিদার। গোপন সংবাদ নিয়ে কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে!

কথাটা কাজে লেগে গেল। প্রহরী দরজা ছেড়ে দিল।

ইতালীয়ান দূতাবাসের কর্তা সিনর করোনির সঙ্গে দেখা করে রহমৎ খাঁ তাঁর গোপন-উদ্দেশ্যের কথা সমস্তই জানালেন। সিনর করোনি সন্তুষ্ট হয়ে, সাহায্য করতে রাজী হলেন এবং এখুনি বার্লিন এবং রোমে তিনি এই খবর পাঠাচ্ছেন বলে রহমৎ খাঁকে আশ্বস্ত করলেন। ইতিমধ্যে শহরের ভেতরে হের টমাস নামে একজন জার্মানের বাড়ীতে রহমৎ খাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। হের টমাস সেখানে কতকগুলি জার্মাণ ব্যবসায়ী প্রতিনিধির এজেন্সি-বিভাগ করে রেখেছেন। তাঁর বাড়ীতে নানা শ্রেণীর লোক ব্যবসার ব্যপদেশে রাতদিন যাতায়াত করে। সুতরাং রহমৎ খাঁর সেখানে থাকা নিয়ে কোন সন্দেহ উঠবে না।

মুতাক্কিন্ন উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন, কখন আসে সিনর করোনির কাছ থেকে রোম বা বার্লিনের আহ্বান।

অবশেষে একদিন রহমৎ খাঁ হের টমাসের কাছ থেকে একখানি [illegible]-পত্র পেলেন। সিনর করোনি জানিয়েছেন, স্বেচ্ছায় সরকারের কাছ থেকে তাঁকে সাহায্য করবার [illegible] এসে গিয়েছে কিন্তু দিনের পরদিন চলে যায়, সাহায্যের কোন বাস্তব প্রমাণের আর দেখা মেলে না।

এই ভাবে দিন পনেরো চলে গেল। সিনর করোনির কাছ থেকে আর কোন সংবাদ পাওয়া [illegible] করে, উৎকণ্ঠায়, অনিশ্চিততায় হের ও মন পীড়িত হয়ে ওঠে। তার ওপর কাবুলী ইতালীয় দূতাবাসের বাগি[illegible] বিরোধ করে উঠলো···গুপ্ত-আবাসের পরীর কাবু হয়ে পড়ে···

হঠাৎ একদিন সিনর করোনির কাছ থেকে আবার সংবাদ এলো···দুঃসংবাদ, [illegible] ছাড়পত্র নিয়ে কোন গোলমাল হয়েছে, তাই এই বিলম্ব।

য়ুরোপে যেতে হ'লে, সুভাষচন্দ্রকে কয় প্রদেশের ভিসা নিয়েই যেতে হবে। তাই তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক করেন, হয়ত সোভিয়েট সরকারকে চান না, তিনি চক্রশক্তির সঙ্গে যোগসাজস করেন...তাই তাঁরা প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে বিলম্ব করছেন। অথচ তাঁরা কি ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, সে-সম্বন্ধেও কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারছেন না। বার্লিন বা রোমে যাবার কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না যখন তিনি এলগিন রোডের গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল মস্কো এবং আজও তাঁর মনের বাসনা, মস্কোতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু কাবুলের কয় দূতাবাস থেকে সে-সম্বন্ধে কোন সাড়াশব্দই যখন তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না, তখনই রোম বা বার্লিনের কথা তাঁর মনে জাগে। এবং আজ একথা কেউ কেউ অনুমানও করেন যে, হয়ত তখন তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, রোম বা বার্লিনে গিয়ে সেখান থেকে মস্কোতে পলায়ন করা।

কিছু দিনের পর দিন ব্যর্থ আশার অপেক্ষা করে থাকতে থাকতে ক্রমশ তিনি হতাশ হয়ে উঠতে লাগলেন। চারদিকে তাঁকে ধরবার জন্যে পুলিশের ওয়াচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বেশীদিন একজায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকলে, তাদের নজর এড়ানো যাবে না হয়ে উঠবে। নিজের স্বাস্থ্যের ক্রমশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং একদিন অত্যন্ত বন্ধুবৎ খাঁকে বলেন, পায়ে হেঁটেই তিনি রুষ-সীমান্তে যাবেন...পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার মতন একজন সঙ্গী যদি পাওয়া যায়।

বন্ধুবৎ খাঁ বলেন, লোক হয়ত চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে কিন্তু অসম্ভব সে-পথ যেমন দুর্গম, তেমনি দুঃসাধ্য।

—হোক দুর্গম...হোক দুঃসাধ্য...যখন তা সাধ্য তখন করতে কি বাধা আছে? বিপদ্নী পায়ে হেঁটে যাবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করেন। বন্ধুবৎ খাঁও চেষ্টা করে যাবার থেকে একটা মানচিত্র যোগাড় করে দিয়ে আসলেন।

উত্তমচাঁদের জানাশোনা একজন লোক ছিল, যে বহুবার রুষ-সীমান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করেছে। মিঃ এম্ বলেই উত্তমচাঁদ তাঁকে চিনতেন। তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সুভাষচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উত্তমচাঁদ মোকাবেলে মিঃ এম্-কে [illegible] নগদ টাকায় রুষ-ভূমিতে তাঁদের দূতাবাসে পৌঁছে দেবার জন্যে। অবশ্য মিঃ এম্‌কে জানানো হয়নি, এই দুজন কারা কে। এই কাজের জন্য কিছু অগ্রিম টাকাও এম্-কে দেওয়া হয়। এম্ উৎসাহ সহকারে আয়োজন করতে লেগে গেল।

এমন সময় সহসা একদিন সিনর করোনির কাছ থেকে সংবাদ এলো, সব আয়োজন প্রস্তুত। চক্র-শক্তির সাহায্যে তাদের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন। তারা অচিরকালের মধ্যেই এসে পড়বে।

বন্ধুবৎ খাঁর দুশ্চিন্তার পর সিনর করোনির কাছ থেকে এল শেষ চিঠি...১৩ই মার্চ বিকেল বেলা [illegible] বোস্ তাঁর বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে করে বা অন্য একজন লোক তাঁকে সঙ্গে করে সিনর করোনির বাড়ীতে নিয়ে আসবে...সেখান থেকে ১৮ই মার্চ তিনি যাত্রা করবেন।

১৮ই নভেম্বর সকাল সাতটার সময়। কাবুলের পথ দিয়ে একটি মোটর দ্রুত এগিয়ে চলেছে রুশ-সীমান্তের দিকে। সেই গাড়ীতে ছিল দুইজন আফগান, একজন ইংরাজ-সাহেব এবং মিঃ তারাতাইন্।

মুক ও বধির পাঠান-তীর্থ-যাত্রী আবার বেশ-পরিবর্তন করে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন…সেই ভূমিকার নামই মিঃ তারাতাইন্।

যাত্রা-সহচর রহমৎ খাঁ। তাঁর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে সেখান থেকেই ফিরলেন ভারতের দিকে।

অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রী এগিয়ে চল্লো তার ভবিতব্যতার দিকে।

ভারতবর্ষ তখন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে তার শেষ-অধ্যায়ের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছে, করছে ইয়ে মরেঙ্গে।

ভারতবর্ষের বাইরে সমস্ত জগৎ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়-তাণ্ডবে দুলছে…চারিদিক থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে অস্ত্রের ঝন-ঝনন…সৈনিকের পদধ্বনি……হেইল্ হিটলার…

এক মহা-অনিশ্চয়তার আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে উঠেছে বিশ্ব-শঙ্কিত জনসাধারণের…

কি আছে এই প্রলয়-রাত্রির শেষে? কতদূরেই বা আছে এই প্রলয়-রাত্রির শেষ যাম?

রুদ্ধ-শ্বাসে মহা-আতঙ্কে সেই কথাই ভাবে বৃদ্ধা বসুন্ধরা।

কলকাতার পথ

আজই বিজয়। আজাদ।

বৃহৎ জনতার সামনে পতাকা হাতে চলিয়াছে এক অশ্বারোহী যুবাপুরুষ। [illegible]

তাহার পর, আজাদ গ্রামের যে প্রবেশ করিবে—সেখানে ঘোষিত হইবে [illegible] পতাকা।

বিপুল জনতা পথ আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। জনতার অঙ্গীকার হইয়া চলে! সহস্র কণ্ঠের তুমুল গর্জ্জনে ধ্বনিত হয়। জনতার মুখরোধ করিয়া যায়।

কিন্তু কিসের জনতা তাহাদের আজাদকে মুক্ত করিয়া গ্রামের প্রবেশ করে। মুক্তিরা [illegible] করিয়া জনতার প্রবেশ সেখানে [illegible]

জনতার পথ বন্ধ হইল। আজাদ [illegible] পৌঁছাইল।

অনুপমার ঘর

আশাপূর্ণা দেবী

(১)

অনুপমার বয়সটা যদি পঞ্চাশ বছর ধরিয়া লওয়া যায় তবে—নববধূর ভূমিকায় অনুপমাকে দেখিতে চাহিলে আপনার দৃষ্টির সীমানাকে বছর চল্লিশ পিছাইয়া দিতে হয়।

যবনিকা উত্তোলন করিতেই চোখে পড়িবে বরদাপতির শয়নকক্ষের দৃশ্য। না, না, অতো কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই, বাপের বাড়ীতে পুতুল খেলনাওলা ফেলিয়া আসার শোকে এই কিছুক্ষণ আগেও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছে অনুপমা।

ঘটনাটা ফাল্গুনের দিনের।

'দিন' নয় রাত্রির।

অষ্টাদশের স্মৃতিটা তো ছায়ামাত্র। কতকগুলা এলোমেলো বাসরের ভীড় আর অর্থহীন গোলমাল ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না হীরালালের, তাই উৎসুক আগ্রহে এক বৎসর ধরিয়া এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে সে। হীরালালের বয়সটাও ঠিক বয়স্ক নয়, কিন্তু অল্পবয়স্ক বলিয়া যে একটা বয়স আছে সে বয়সটা হইয়াছে।

বছর না ঘুরিতেই "ধুলোপায়ে বাপের বাড়ী যাওয়া" প্রথা তখনো বিশেষ চালু হয় নাই। হীরালালের শ্বশুরবাড়ীর বাড়ীতে আবার দেওয়ালকোণ পর্যন্ত মিলিয়া। শ্বশুরবাড়ীর দিকটা যাওয়া অবধি দেখা দিলে।

বিবাহের 'ফুলশয্যা' করিয়া শ্বশুরালয়ে আসা হইয়াছে আজ ছয়টি দিনের দিনও হীরালাল ঘটিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কাজেই আপাততঃ হীরালালের কাছে যৌ সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু এমন অজানার মাঝে নূতনত্বের এই বাসরটা কঠিন সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

অসীম আনন্দ পরাভূত মিশ্রিত স্বাভাবিত হরমাবেগের ভারে অতুল হীরালাল যখন কথা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখন বিলাস পরিহাস অনুপমা ঘোমটা নামাইয়া পাকাগিন্নির ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ীটা কী বিচ্ছিরি মা গো। একখানা বাড়ীতে গাদাগাদি করে পঞ্চাশটা লোক। এদিকে যেন প্রাণ হাঁপিয়ে আসে, উঃ। আমি কিন্তু বাবু আগে হতেই বলে রাখছি 'তেয় হবো'।

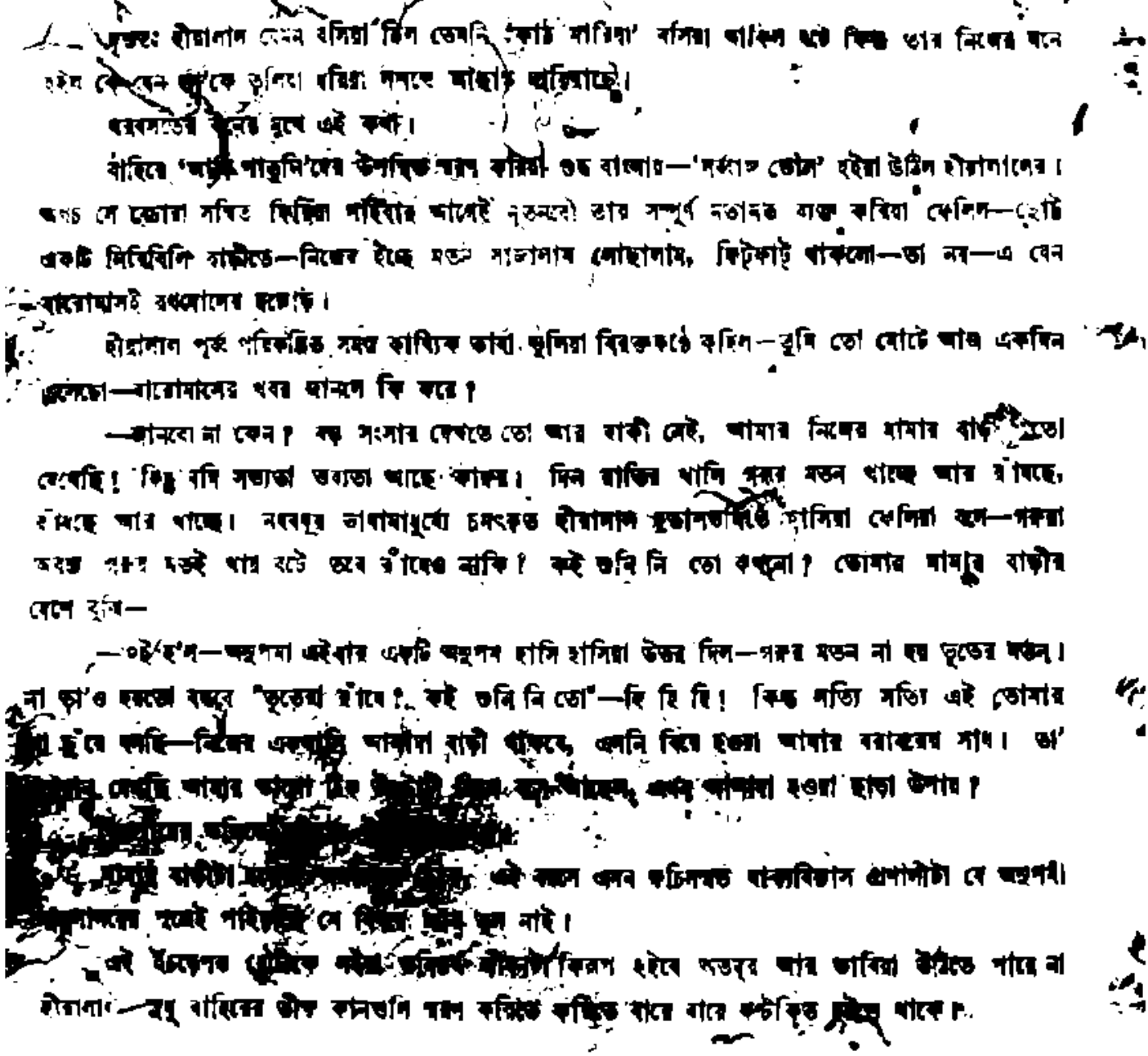

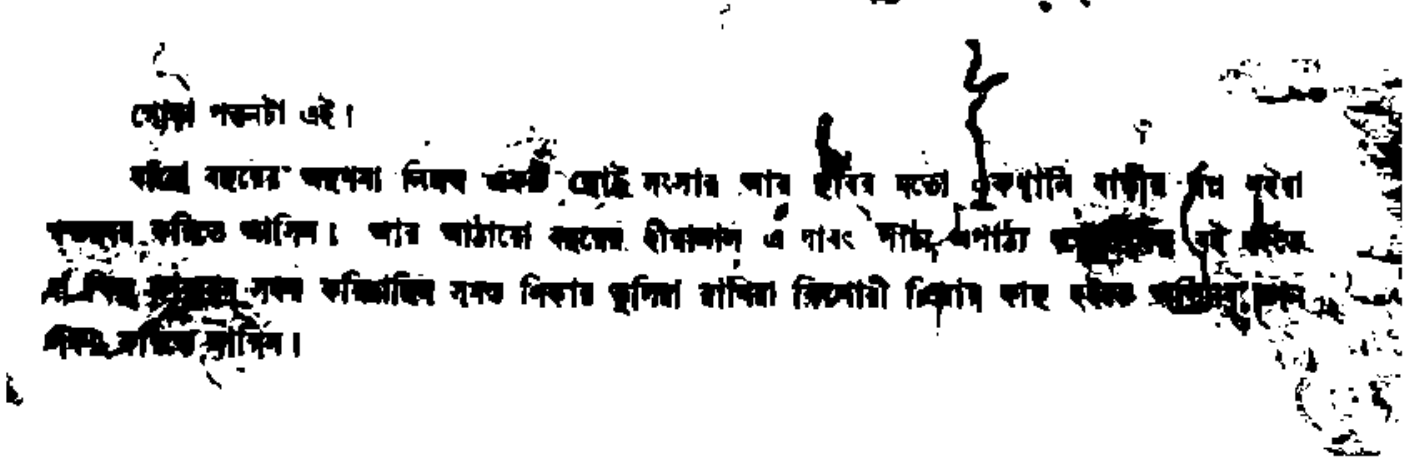

বলাবাহুল্য উক্ত 'ঘরবসতের' পরদিন নূতনবৌয়ের নামে 'চী চী'কার পড়িয়া গিয়াছিল। আদি পাতিবার জন্য বাঙালী শীতের রাত্রে নিউমোনিয়ার আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া বন্ধ দুকিন জানলার বাহিরে কান পাতিয়া খোলাছাদে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে, আর যাই হোক এতোটা আশা করে নাই তাহারা। নববধূ কান্না-কাটির পরিবর্তে বড়জোর 'বাচাল' বা 'বেহায়া' নাম কিনিবার উপযুক্ত আচরণ করিতে পারে, কিন্তু কখনো কাহাকেও ভেঙ্গ হইবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিতে শোনা যায় নাই। আদি পাতুনিদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

নূতন ডুরেশাড়ী, বল আর নোলক পরা টুকটুকে বৌটি, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যাইবার কথা; কিন্তু সকালবেলা বৌ দোতলা হইতে নামিয়া আসামাত্র আপার মস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল শাশুড়ী ঠাকুরাণীর। অর্থাৎ রাতারাতিই দৃত মারফৎ বৌয়ের গুণাগুণ জানিয়া ফেলার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহার বোঝা গেল।

আপন মনে নীচে নামিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটার বহর বাড়াইয়া দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল অনুপমা।

শাশুড়ী ত্রিপুরাসুন্দরী একটা ছুতা পাইলেন যেন। মুখখানা যতটা বিকৃত করা সম্ভব তা' করিয়া মুখ-ঝামটা দিয়া উঠিলেন—আহা মরে যাই, আমায় দেখে আবার ঘোমটা! তবু যদি না ঘোমটার ভেতর খ্যাবড়া নাক হতো! সেই যে বলে না—"গায়ে বৌ খান্‌খান্ ঘোমটার ভেতর ন্যাজা খান্", এ যেন তাই। বলি—বাপের বাড়ী থেকে খুব শিক্ষে শিখে এসেছো তো বাছা?

যাদেরও দাদা থাকেন, কাজেই শাশুড়ীরও শাশুড়ী থাকা অসম্ভব নয়, তবে খাঁটি শাশুড়ী নয়—খুড়শাশুড়ী। কাজেই শাসনকর্ত্তা নন, বড়জোর কুটুম্বিতা করিতে পারেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর খুড়শাশুড়ী মহেশ্বরী একটা রসালো ঘটনার আভাস পাইয়া পুলকিত চিত্তে বাহিরে আসিয়া কহিলেন—ওকি মেজবৌমা, সকালবেলাই ছেলেমানুষকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছো কেন বাছা? আহা যতোই হোক কচিশিশু মা বাপ ছেড়ে—

কথা শেষ হইবার আগেই ত্রিপুরা ঝঙ্কার দিয়া উঠেন—থাক্ ছোটখুড়ি, তুমি আর কোড়ন কেটো না, আমি বলে নিজের জ্বালায় মরছি।.....ছেলেমানুষ! কী আমার ছেলেমানুষ রে! ওই ছেলেমানুষ আমার হীরুকে একহাটে বেচে আর একহাটে কিনবে তা দেখো। ওমা! বাবার জন্মে শুনি নি যে ঘরবসতের বৌ এসে বলে "ভেন্ন হবো"।

মহেশ্বরীও যে খবরটা না পাইয়াছেন এমন নয়, কিন্তু অজানার ভাণ বজায় রাখিয়া বলেন—কি হবে? কি বলেছে?

—ভেন্ন হবেন গো—ঘর নিয়ে আলাদা হবেন। শুনেছ এমন কথা?

—ওমা সেকি কথা!.....হ্যাগা নাতবৌ, এসব কি কথা?

বেচারা অনুপমা হীরালালের সামনে যতোই প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করুক, পুলিশকমিশনার আর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়কে একত্রে দেখিয়া ভয়ে 'কাঠ' হইয়া ঠিক একই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

বৌ শ্বশুরঘর করিতে আসিয়াছে, এমনি সব সাধারণ উপলক্ষ। তবু মহেশ্বরী অনুপমাকে দেখাইতে লইয়া যান।

বলাবাহুল্য ত্রিপুরাসুন্দরী এসব দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, "রোমাঞ্চিত ঘটা ঘটা করিয়া পাড়া বেড়াইবে কি"—কিন্তু খুড়শাশুড়ীকে নিষেধও করিতে পারেন না মুখের উপর খুঁৎ খুঁৎ করেন, কাজের অনুশাসন দেখান, কিন্তু সে সব মহেশ্বরীর উড়াইয়া দিতে দেরী হয় না। স্পষ্ট করিয়া তো আর ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে অনুমতি চাওয়া যায় না, ঘরোই লোক মান মর্যাদা তো আছে তাঁর? অথচ একেবারে না জানাইয়া যাওয়া চলে না। তাই গলা তুলিয়া অনুপমাকেই ডাক দেন—অ নাতবৌ, যাবে তো চলো আমার সঙ্গে, বলেছিলাম না আমার বোনঝির বাড়ী দেখিয়ে আনবো? আজ সময় রয়েছে—

ঘরের ভিতর হইতে ত্রিপুরাসুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া মনে মনে বলেন—তবে যে তোমার সময় নেই তা'ও জানি যে। বৌটাকে দিন দিন পাড়াবেড়ানি বিদ্যি করে তুললো গো, ছি ছি! এ যেন ইচ্ছে করে সর্বনাশ ডাকা। একে তো রূপের নিধি বৌ আমার, তার ওপর আরও বজ্জাত লোক।

মনে মনে অনেক তীব্র তীক্ষ্ণ আর কটু মন্তব্য করিলেও বাহিরে কিছু আর বেশী বিরক্তি প্রকাশ করা ভালো দেখায় না, তাই ত্রিপুরাসুন্দরী নিতান্ত বিরস কণ্ঠে বলেন—তোমার বোনঝির বাড়ী বৌমা আর গিয়ে কি করবে? চেনে না জানে না।

মহেশ্বরী হাসিয়া ওঠেন—সেজবৌমার এক কথা! দেখা সাক্ষাৎ হ'লে তবে তো চেনা জানা হবে? সুধার বড্ড সাধ বৌমার সঙ্গে আলাপ সালাপ করে।

ত্রিপুরাসুন্দরী বিরক্তি গোপন করিতে অক্ষম হইয়া বলিয়া ওঠেন—তা' সেও তো একদিন বেড়াতে এলে পারে? বৌনা বৌমানুষ, নিত্যি যেই সেই করে এখান ওখান কি যাবে!

উঠিয়া গিয়া কাজ নষ্ট করিবার লোক মহেশ্বরী নন তাই আরও একবার হাসিতে হয় তাঁহাকে—বলি সেও তো একটা মানুষের বাড়ীর বৌ—না কি? তবে হ্যাঁ আসবে, সেও আসবে। সময় তো পায় না বাছা। চল্লিশ ঘটা কাজ, শাশুড়ী বাপী চোখে ভালো দেখতে পায় না, কিছু করে না, সব ওই সুধা।.....কই গো নাতবৌ, তোমার সেই সোনালী সেমিজ আর গঙ্গাজলী ডুরেখানা পরে এসো। নতুন দেখবে ওরা। চুলটা তোমাদের যেমন ফ্যাসান ট্যাসান কাটে কেটে নাও।.....যেমন তেমন করে শোষের বাড়ী যাওয়া ভালোবাসি না।

তা বাসবে কেন, বৌ বিবি সেজে পথে পথে রূপ দেখিয়ে বেড়াবে—অস্ফুট মন্তব্য করেন ত্রিপুরা।

হীরু এবার বাড়ী আসুক যা হয় একটা বিহিত তিনি করিবেনই। ছোটঠাকুমা যে বৌটিকে বিগড়াইয়া দিবেন সেটা কিছু কাজের কথা নয়। বাড়ীতে আরো পাঁচটা বৌ আছে, তাঁর নিজের নয় বটে, ভাসুরপো-বৌ, ভাসুর-বৌ ইত্যাদি—তাদের অত তো মাথা ব্যথা নাই ছোটখুড়ির। বলিলে বলিবেন—"ও দু ডিমা উঠোন ঝাঁট, কুটো কাচা বেঁটি গেঁড়ি নিয়ে কোথায় যাবে?".....এ বৌটাকেও তো কই এখনো ছেলে পুলে হ'ল না।

৭ পনের ষোলো বছর বয়স হ'ল, কম তো বয় বছরটা দেখি, এই বয়স মাইলি দিতে হবে একটা ক্রচি না হ'লে মন হবে না বৌ।

বৌকে বশ করিবার অনেক শিকড় দিয়া গেছার মিশ্রণ্ডুমুরী, কিন্তু খুপারু কাটা, ভেঁতুল ছাড়ানো, বোয়াকেশ কেশা, চুল ভাল বাসা, প্রভৃতি মূলকর্ম দিয়াও বশ করিতে পারেন না, চরের নিশিন্দা পর্যন্ত আনিয়া দেখিয়াছেন।

বৌ আসার অন্য চট্টোপাধ্যায় কাশে নয়।

ত্রিপুরাসুন্দরী রাগে গর্ গর্ করিতে থাকিলেও সোনাপী সেমিজ আর গলাকাটা ডুরে শাড়ী পরা অনুপমা দিদিশাশুড়ীর পিছু পিছু চুপ করিয়া বাহির হইয়া যায় অনুপমা।

বেশ খানিকটা দূরে দুধার শ্বশুরবাড়ী।

বড়দীঘির ধার দিয়া যাইতে হয়, বেশ খোলা হাওয়া জায়গাটা। চলিতে চলিতে উৎসুক অনুপমা ঘোমটাটা ঈষৎ সরাইয়া অনুপমা জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—ছোটঠাকুরি, এদিকটা তো নিস্তি। আমাদের বাড়ীটা বেন ঘিঞ্জি এবং দুর্গন্ধময়।

মহেশ্বরী বলেন—তা' যা বলেছিস। সুবাসের এ দিকটা বেশ।

—আচ্ছা ঠাকুরি এতো জমি পড়ে আছে এদব কাদের?

—এ দিকটা জমা ভট্টাচার্য্যির। আর ওই দীঘির ওপাড় থেকে চৌধুরীদের। যতো দূর দিষ্টি যায় সব ওদের।

অনুপমা বিস্ফারিত চক্ষে যতো দূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া বলে—হাঁ ঠাকুরি, সব ওদের? তবে আমি কেনে রেখেছে?

—তা' কি করবে? এ সব তো ধান জমি নয়। অনেক বাগান ছিল আগে, দেখাশোনার অভাবে জঙ্গল হয়ে গেছে। কেই বা আছে এখন?

—ঠাকুরি—অনুপমা অকারণে ভাশুরঝির আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া বলে—এর থেকে একটুখানি জমি ওরা বিক্রিবি করতে পারে না?

—তা কি জানি—মহেশ্বরী হাসিয়া ওঠেন—কেন তুই কিনবি নাকি?

অনুপমা অপ্রস্তুত ভাবে বলে—বাঃ আমি কেন? লোকে তো কিনে বাড়ী করতে পারে?

—কার গরজ পড়েছে যে ওই মাঠে জমিখানে বাড়ী করতে আসবে?

—কি যে বলো ঠাকুরি, কাছের যে যেখানে অমন তো পাঁচ ছোবার ধারে বাড়ী করা বুঝি ভালো?

মহেশ্বরী আগাইয়া যান, অনুপমাকেও যাইতে হয়, কিন্তু পিছন পিছন ফিরিয়া দীঘির ওপারের উঁচু জমিটার দিকে বার বার মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিতে থাকে। জমিটা হইলে একখানি ছোটখাটো বাড়ীর সেই কথাটা জানিতে বার বার 'বলি বলি' করিয়াও বলিতে পারে না অনুপমা।

এতো দুষ্টু তুমি? কবে যে? এতো কাল লাগিবে অনুপমার এই ছোট প্রশ্নটুকু করিবার এতো সাহস সঞ্চয় করিতে?

সুধাদের বাড়ী ঢুকিয়াই অনুপমার মনে হইল সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। ঠিক তেমনি একখানি ছবির মতো বাড়ীটি তার ধ্যানের ঘর নয় কি? ছোটখাটো ঝরঝরে শান্ বাঁধানো উঠোন, সাদা পাথরে বাঁধানো সুগঠিত তুলসীমঞ্চ, উঁচু রোয়াকের উপর পাশাপাশি দুইখানি ঘর, একদিকে—রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর আর চাতাল।.....শোবার ঘরের দরজা জানালায় পুরনো রঙিন শাড়ী কাটিয়া পর্দা লাগাইয়াছে সুধা, রোয়াকের উপর পাতিয়া রাখিয়াছে বেতের মোড়া আর নীচু ছোট টেবিল। অবশ্য টেবিল বলিলে তা'কে একটু বাহুল্য গৌরব দেওয়া হয়, তবু চারখানা পায়া তো আছে? শাড়ীর পাড় মুড়িয়া একটা ঢাকনা পরা লাগাইয়াছে তা'তে? পল্লী অঞ্চলে ঐ হেন সৌখিনতা দুর্লভ। বিশেষ তো তখনকার আমলে।

নিরব বাড়ী, মধ্যাহ্নকালটা যে বিশ্রামের কাল এটা বোধ করি অস্বীকার করে না এরা। অনুপমার শ্বশুরবাড়ীর মতো অহরহ হট্টগোল, আর অবিশ্রাম কাজের ঝামেলা আর কাদের আছে বাবা!

মহেন্দ্রী কাঁপের বেড়াটা ঠেলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ডাকেন—কইরে সুধা, ঘুমোচ্ছিস নাকি? এই দেখ্ কা'কে ধরে এনেছি।

পর্দা সরাইয়া ঘরের ভিতর হইতে সুধা বাহির হইয়া আসে।

বাড়ীর মতোই কিটফাট ছিমছাম্ মানুষটী। আসন্ন সন্তান সম্ভাবনায় ঈষৎ মন্থর।.....বয়সে অনুপমার চাইতে কিছু বড়ো হওয়াই সম্ভব।

—ওই বুঝি তোমার নতুন সাতরো মেঠাকরুণ? ওমা যেন বৌ তো?.....এসো ভাই।

সুধা অনুপমার পরিচয় দেয়।

—ওমা তোমার শাশুড়ী? তোর শাশুড়ী?

—তিনি ওই ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। অসময় মানুষ।

—তাই দেখি একবার বুড়িকে, তোরা গল্প কর—নাঃ, দোরে আবার ডাকড়ার পর্দা লাগিয়েছে, যতো সব বিবিয়ানা। সরা দিকিন বাপু! বুড়ির ঘরে আবার এসব কেন?

সুধা হাসিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া বলে—বুড়ির ঘর বলে যার দিনে বাড়ীর দৌড়ের হবে কেন গো রাঙাদাদী? এসব ভালো গো ভালো, আলাচা কাপড়ে দুই মা আমরা, উল্টে ঘাবি ভয়ন।

মহেন্দ্রী সরিয়া যাইতেই সুধা অনুপমার গালটা টিপিয়া দিয়া বলে—ইঃ যেন পাকা গিন্নি, বর খুব ভালো বাসে তো?.....কিছু মনে করো না ভাই, যদিও তুমি আমীর সঙ্গে এক পৈঠে নীচে তা'হলেও—সমবয়সীদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক টম্পর্ক খাটতে পারি নে বাপু।

অনুপমা হাসিয়া বলে—জানিও। আচ্ছা তোমার শাশুড়ী তো অসময় মানুষ, তোমার দুপুরটা কাটে কি করে?

সুধা একটু রহস্যময় হাসির সঙ্গে বলে—হ্যাঁ এক রকম বই, আবার এক রকম বই! মাথার ওপর কথা কইতে তো কেউ নেই? যা করবো তাই। এই যে বাড়ী ঘর সব আমার পছন্দে, খণ্ডরের তো একখানা ভাঙ্গা ভিটে ছিল ওই বরিষে—তাহা তোরা দেখতে পারি নে বাপু হ্যাঁ—কত কিরে সরিসি হও আমাদের কথা, আর সংসার যদি করতে হয় সংসার করার মতো করো।

অনুপমা কিসে হাসি চাপিয়া বলে—বরটি তোমার কথা শোনেন, তবে—না?

—শুনবে না মানে? আমার মাথা নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়বো না তা'হলে? এই তো—দেখছো তো অবস্থা? আগে থেকে বলে দিয়েছি বেতের দোলা কিনে আনবে—আর রঙিন মশারি, ওই দাদাকে টাঙিয়ে দেবো।

সোহাগে গর্বে টলটল করিতে থাকে সুধা।

গৌরব করিবার মতো ঐশ্বর্য থাকিলেই বোধ করি এতো লজ্জা আর অস্বাভাবিক হইতে পারে মানুষ।

সুধার উপর কেমন এক ধরণের হিংসা হয় অনুপমার।……মনে হয় ওর কথাবার্তায় যেন গর্বের অহঙ্কার, ওর আসন্ন মাতৃত্বের ওপরে আক্রান্ত শরীরটাও যেন নিজের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তেমন খোলা মনে আর কথা কহিতে পারে না অনুপমা, শুধু আস্তে আস্তে চাহিয়া সব দিক দেখিয়া লয়।

বড় চৌকীর উপর ধবধবে বিছানা পাতা, বাহুর দেওয়া বালিশ, মশারিটি রঙিন পাতার। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি ছবি। গ্রুপ ফটো, কালীঘাটের পট, একখানা বেলিবন্ কুত্তের খোকার ছবি। সেলফের উপর টেবিল ল্যাম্প, কাঁচের পুতুল, আর্শি চিরুণী, আরো কতো কি টুকি টাকি।

—এবার তো এবার থেকে সাবধান করতে হবে!……অনুপমা……বৌকে গম্ভীর সঙ্গে শিশুর মুরুব্বিয়ানার ইঙ্গিত করে।

—ইস্ সাবধান করতে হবে বৈকি! ছেলে ধরবার লোক রেখে না দিলে বুঝে জানবো কি না? তা' ছাড়া—দোতলায় আমার ঘর তোলা হবে।

—দোতলায়!—অনুপমা চকিত হইয়া বলে—আর ওরে তোমাদের দরকার কি?

—ওমা শোনো কথা! চিরকাল বুঝি নীচের তলায় পড়ে থাকতে ভালো লাগে? আমি তো বলে দিয়েছি—এই বাড়ি বেচে দাও, ছ'মাস পরে আসবো—এসে যেন দোতলায় পাই।

—তোমার বর কি বলেন তাই?

—উনি? কিছু না, বেচেদা ভালো—সুধা হাসিয়া ওঠে—আমি তো বলি 'ঝনঝাটারি' করে যা' তেরেন্তা তাদের তা'।……তবে হাঁ উনি পারেন আছে।

দুটি বছরের সুধা কথা কয় যেন পাকা গিন্নীর মতো।

বাচাল বলিয়া যে এতো অখ্যাতি অনুপমার, সুধার কাছে যেন বোকা বনিয়া যায়।

খুব আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিলেও গলা সাফ হয় খানিকক্ষণ। এই বাড়ী কিনিতে কতো খরচ হইয়াছে, মেরামত তুলিতে কতো লাগিবে, পুরাণো টাকগুলায় নতুন রং লাগাইয়া সত্যই নতুনের মতো লাগে কিনা, এতো ছাদের রেলিং কিনিতে কতগুলি টাকা খসিয়াছে সুধার বরের, এমনি সব নীরেট আলোচনা।

এর চাইতে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চালাইবার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি দু'জনের কাহারও নাই।

ফিরিবার পথে অনুপমা চুপ হইয়া গেল। সংসারের ছলে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার যে বাসনাটা তোলা হইয়া আছিতেছিল সেটা যেন নূতন করিয়া মাথা ঠেলিল।……সুধার কথাগুলো মেয়েকে ভরা বটে কিন্তু বাটি, এটাও মিথ্যা নয়।……সংসার যদি করিতে হয় সংসারের মতোই করা ভালো।'

সুধার ঘর সংসার গোছানো ছিমছাম বটে কিন্তু অমন একখানি ছবির মতো বাড়ী এমন হাতের মুঠার মধ্যে পাইলে অনুপমা যে আরো কতো কি করিতে পারিত তা' দেখাইয়া দিবার সুযোগ কবে সে পাইবে অনুপমার!

বাড়ী! বাড়ী!

পনের বছর বয়সের মেয়ে শাড়ী চায় না গহনা চায় না স্বামীর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় না, চায় কিনা বাড়ী! আশ্চর্য বটে! কিন্তু হয় তো আশ্চর্যও নয়, বাড়ী মানে তো কেবলমাত্র একটা ইট কাঠের সমষ্টি নয়, নিজেকে প্রকাশ করিবার একটা সুযোগক্ষেত্র, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত নিশ্চিন্ত।

খানিকটা পথ চলিতে মহেশ্বরী নাতবৌয়ের আনমনা ভাব লক্ষ্য করেন, বাক্যবাগীশ অনুপমার হইল কি। শুধান—কি হ'ল রে নাতবৌ? কথা নেই কেন মুখে?

—কই ঠানদি, এই তোমার সঙ্গে কথা বলছি—শুনছ ঠানদি, 'কনটাকটাকি' করা মানে কি?

—কন্ মানে আবার কি, কনট্রাক্টরের। এই তো সুধার বরই তো করে। এই ঘর যেমন তোর চোখের—সুধোর কনট্রাক্ট নিলে—সেই-ই সুধোকুই সিঁড়ির খাটাবে, দেখা শোনা করবে।' হাল মলনা তেমনি তোর কাছে মুখ নাড়া নেবে বল্। তোর আর কোনো ভাবনা থাকলো না।……কনটাকটাকি করেই তো সুধোর এতো বাড় বাড়ন্ত, বাঁচা গয়না আছে কিনা, নইলে লেখাপড়া জানার কি জানে!……যে চল্ তাড়াতাড়ি, তোর শাশুড়ী আবার হাঁড়ি মুখ করে বসে আছে হয় তো।

শাশুড়ী!

ধপ্ করিয়া যেন সমস্ত আলো নিভিয়া যায়।

হায়! সুধার শাশুড়ীর মতো অমন শাশুড়ী যদি হইত অনুপমার!……যে মুখ ঝামটা আর সুখাইত। কিন্তু শুধুই কি শাশুড়ী! পিসশাশুড়ী খুড়শাশুড়ী ননদ্ভাসুর ভাসুর ভাসুরপো ভাসুরঝি ভাসুর, ঘুটাকাচা সেঁদিয়ে দিতে বাড়ী বোঝাই। সুধার বাড়ীর মতো সাধ সাধ্যি তোমার?

—আচ্ছা ঠানদি, তোমার বোনঝির বাড়ীটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা না?

—ঠাকুরঝি! আ কপাল, ঠাকুরঝি আবার ভালো কাচ্চাবাচ্চার ভরে যাবে অবে না সংসার? তুমার তো এই বুড়ো বয়সে 'হবে না হবে না' করে এতকালে এই আলো হয়েছে। তা' নইলে এতদিনে তিন ছেলের মা হুবার কথা।.....তা' তোরও হা হাত দেখাই—

—যাঃ ছোড়দি যেন কি। চলো তো পা চালিয়ে।.....

শাশুড়ীর হাঁড়ি মুখ মনে পড়িতেই কল্পনার ছবি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়ে।.....অনুপমার বাড়ীর উঠানের তুলসীমঞ্চটা শ্বেত পাথরের হইবে কি কালো পাথরের, দুইখানা ঘর থাকিবে না তিনখানা, চৌকীতে বিছানা হইবে কি বার্নিশ-করা পালঙ্কে, সে সব চিন্তা ঘুলঘুলি থাকে।

সারাদিনের অভ্যস্ত কাজের ফেরে সেই চিন্তা পাড়িয়া বসে—এবং অনেক চেষ্টার ফলে প্রকাণ্ড একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলে বীরালালকে।

আঁকাবাঁকা কাটাকুটি তো রহিলই তা' ছাড়া বানানের উপর বর্ণমালার নির্দ্দেশের চিহ্নমাত্র নাই। তা' হোক তবু মনের কথাগুলো তো স্বামীর কাছে পর্য্যন্ত পৌঁছানো গেল। যদিও একুশ বছরের স্বামীর সঙ্গে কতটুকু কি করা সম্ভব তেইশ আনা তাবিয়া দেখে নাই অনুপমা। দুইটা পাশ করিয়া যে তিনটা পাসের পড়া করিতে পারে, সে যে অনুর বয়সের মতো সামান্য কনটাকটারিটুকুও পারিবে না এটা অবিশ্বাস্য। বিশেষ তো হাতে 'কাজ' পরসা' আছে।.....এই সব কথাগুলাই যেন প্রাণপণে বুঝাইয়া লেখে অনুপমা। তা'ছাড়া আরো লেখে—এবারে আসিবার সময় যেন 'শাওয়ার ও গদা'র একখানা ছবি আনে বীরালাল, আর দুইটা কাঁচের ফুলদানী।.....আরো অনেক ছবি অবশ্য চাই, তবে একে একে আনিলেই চলিবে।

বীরালাল কিন্তু না আনে ছবি না আনে ফুলদানী, অনুপমা 'পাগল বলিয়া তো আর বীরালাল পাগল নয়। অথবা জিনিষটা অদৃশ্য করিয়া আনিয়া অনুপমার হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়াও সম্ভব নয়? তা' ছাড়া রবিবর্মার আঁকা ছবি টাঙাইবে কোথায় অনুপমা? 'নিজস্ব' বলিয়া যে ঘরখানিতে শুইতে পাইয়াছে সে, ঘরকে 'নিজস্ব' বলার মতো গাঁইয়ো তার কি আছে? তাহাদের বলিলেই কি ঠিক বলা হয় না তা'কে? ত্রিপুরাসুন্দরীর তাগে সোতলার মাত্র এই একখানিই ঘর, সোতলা বলিয়াই কিছুটা উঁচানো ধরা গোছের, নীচের তলার মতো অতো নোনাধরা নয়। কাজে কাজেই সারা বছরের মুগডালাই, ছোলা, দইয়ের বড়াবড়ী করিয়া কোথায় রাখা যাইবে এমন নিরাপদে? সারা বছরের আলুতলাও রাখিতে হয় অনুপমার চৌকির তলায়। এ ছাড়া তাকের উপর বড়ির টিন আর আচারের বোতলগুলাও না রাখিলে চলে না। আর বাক্স পেঁটরা আলনা চেয়ার পায়ী তাকী যা দু'একটা আছে ত্রিপুরাসুন্দরীর, সে তো সোতলায় রাখিবারই জিনিষ।

এ যাবৎ নিজেই শুইয়া আসিয়াছেন ত্রিপুরাসুন্দরী, ছেলের বিবাহের পর হইতে অধিকারটা ছাড়িয়াছেন।

পাঠ্য পুস্তকের বোঝা নামাইয়া ছুটিতে যখন বাড়ী আসে হীরালাল, তখন স্ফূর্তির আতিশয্যে তুচ্ছ অসুবিধা তার চোখেও পড়ে না। আর অসুবিধাই বা কি, বিছানা পাতিবার মতো হাত কয়েক জায়গা থাকিলেই তো যথেষ্ট। বিছানায় পড়িয়া ঘুম কলাইয়ের ডাল থাকিলে সে কাহারও ধরাকেটক রোগ হয়, অথবা দীর্ঘ বিরহান্তের পর প্রবাসী প্রিয়তমের আগমন সম্ভাবনে নিশাতার অভ্যস্ত লাগে, এ কথা বোঝা তার পক্ষে অসম্ভব।

ছবির কথা শুনিয়া হাসি পাইল বটে, তবে তার হাসির মধ্যে যে অনুপমার কান্না পাইবে সে কথা বেচারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নাই। কান্না থামাইতে এবং রাগ করাইতে এক তখন ছবির প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিতে হইল হীরালালকে।

অমূল্য ছুটিটুকুকে কি ধোপায় সরিতে দিতে পারে না সে?

আবার ছুটি আসিতে কি আর এই সামান্য আবদারটা ভুলিয়া যাইবে না অনুপমা?

হায়! স্ত্রীকে কতটুকুই বা চিনিয়াছে হীরালাল? প্রত্যেক চিঠিতেই যে একবার করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় অনুপমা, ভুলিবার আর সুযোগ দেয় কোথায়? শেষ পর্যন্ত পত্রের ছুটিতে—'সীতারাম-সেবা', 'দুর্বাসা-শকুন্তলা' 'অশোকবনে সীতা' প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির সঙ্গে খানকয়েক কালীঘাটের পট মিশাইয়া পুরাপুরি একটী তালিকা করিয়াই লইয়া যাইতে বলে তাহাকে। অবশ্য বাড়ী আসিয়া বলিতে হয়—নিজের মুখে।

তা' 'ত্রিপুরাসুন্দরী'ও ছেলের সঙ্গে খুসি হ'ন। বাছিয়া বাছিয়া খানতিনেক ছবি তিনি ঠাকুরঘরের জন্য লইয়া যান। পিসিমা, খুড়িমা, ছোটঠাকুরমার দলও একখানি লইতে ছাড়েন না। ঠাকুর দেবতার ছবি বলিয়াই নেওয়া। হীরালাল আবার রাগ করিবে কোন মুখে? বরং খুসি হইয়া যাইবার কথা তার!

খুসি হইল বটে, তবে সেবারের চার চারটা দিন ছুটি তাঁর মাঠেই মারা গেল।

কথাটি বলিল না অনুপমা।

ছুটির পর ছুটি আসে, অঙ্কনের মধ্যে কালিমা যায়—অক্ষরেখে পড়ার পালা সাঙ্গ হয়। বি, এ, পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারের পোষ্টটা পাইয়া যায় হীরালাল।

ত্রিপুরাসুন্দরী সত্যনারায়ণের সিন্নি দেন, কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা পাঠান, যেন একটু উৎসবের সাড়া পড়ে বাড়ীতে।

অনুপমা?

এই উৎসব আনন্দের মধ্যে তাঁর মুখ দেখিয়া মনে হয়, কে যেন তার দীর্ঘদিনের যত্নরক্ষিত ফুলগাছের চারাটিকে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

একরকম তাই বৈকি। কলিকাতায় 'বাসা' করিবার যে ক্ষীণ আশাটুকু এতোদিন হীরালালের কার্যক্ষম চাকুরীর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সেটি ধূলিসাৎ হইয়াছে। নিষ্ঠুর অবশ্যম্ভাবী নিরোধ বাণীর উপর মুখটাই রাগ করিয়া থাকিবে অনুপমা? ক'দিন কথা বন্ধ রাখিবে?

মাথা গুঁজিবার ইচ্ছা কি সাধে হয়? গ্রামের স্কুলের মাষ্টারীর কাজে অনুপমার যে আপত্তি ছিলের সেটুকু যুক্তিবার মতো বুদ্ধিও নাই হীরালালের। হীরালাল যদি এই গ্রামের বাড়ীতে স্থায়ী হইয়া বসে জীবনে কি আর মাথা তুলিতে পারিবে অনুপমা?

সিরির প্রসাদ পাইতে অনেক লোক আসে, সকলেই ত্রিপুরাসুন্দরীর ভাগ্যের প্রশংসা করে, দুই একজন আবার বৌয়ের 'পর' সুরেও খাদা দেখায়। বয়সের মধ্যে হীরালালই বি, এ, পাস করিয়াছে, এটা তো আর কম গৌরবের কথা নয়! তা'র উপর আবার পাস করিতে না করিতেই চাকরী! হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার গ্রামের মধ্যে রীতিমত বিশিষ্ট পদ।

রোজ রাত্রে ঘরে আসে অনুপমা।

হীরালাল বলে—সকলেই আমার ভাগ্যের প্রশংসা করছে শুধু তোমার মুখেই হাসি নেই কেন বল তো?

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলে—হিংসেয়।

—বেশ্বতনে তাই মনে হচ্ছে যে—সত্যি তুমি কি খুসি হও নি? অথচ বাড়ীতে—এই তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকতে পারো বলে কবে থেকে চেষ্টা করছি এইটার জন্যে।

——সকলের সঙ্গে থেকে তো চারখানা হাত গজাবে—অনুপমা এবার বেশ ঝোরালো ভাষাতেই নিজের মতামত ব্যক্ত করে—এই জঙ্গলে থেকে কি আর আমার সাধ মিটবে!

হীরালাল বিরক্ত হয়, বলে—তোমার সাধ তো সেই আলাদা হওয়া! নিজের বাড়ী আর একলার সংসার?

—নিশ্চয়ই তো, কেন নয়? নিজের একটা আলাদা বাড়ী না থাকলে কি সুখে সংসার করা? দেখো বাড়ী আমি করবোই। বাড়ী করবো—ইচ্ছেমতন সাজাবো গোছাবো।

—তাই কোরো। চাকরী কোরো একটা, ক্ষতি হবে না। একা সরো শুই।

—ইস্ এখুনি যেন ঘুম পেলো!

অনুপমা হাসে।

—পাবে না কি। বলে বলে তোমার ঘুটকচালে কথা শুনবো? কি যে এক গেঁ নিয়ে ঢুকেছিলে এ বাড়ীতে।

রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয় হীরালাল, আর মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়ে। সারাদিন বিস্তর খাটুনি গিয়াছে।

কিন্তু খাটুনি সারাদিন অহরহই না গিয়াছে তা' নয়, কিন্তু ঘুম আসে কই? রাগে দুঃখে আশাভঙ্গের তীব্র ক্ষোভে যেন বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

কিন্তু না না আশা সে ছাড়িবে না, কিছুতেই না।

কবির মতো বিরহ যাই একখানি সে করিয়া তুলিবেই যেমন করিয়া হোক। ফেওয়ালে ফেওয়ালে টাঙাইবে ভালো ভালো ছবি, জানালা দরজায় রঙীন পর্দা···উঁচুর ঘরে একগাদা মাটির হাঁড়ি কলসীর বদলে সস্তাতরা চিনা আর কাঁচের বোতল। ভারী ভারী কাঠাল কাঠের শ্রীহীন চেয়ার বাতিল করিয়া দিয়া কার্পেটের আসন বুনিবে ইরানালির মুক·····খাসকাই ফুল কাঁসার বাসন কিনিবে একসেট·····কাঠের উনানের পাট তুলিয়া দিয়া কয়লার উনান পাতিবে—সহরের মতো।···অনুপমার বাড়ীতে পানের বাটায় চুণ খয়েরের ছোপ পড়িবে না, বিছানায় ছেলের সাপ নয়, আলনার কাপড়গুলি পরিপাটি· বাসনগুলি সর্বদা মাজা ঘষা-ঝকঝকে যাহা দেখিবার মতো আর দেখাইবার মতো হইবে।

আর·····অনুপমার ভিতরে যে অনাগত শিশুর অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যাইতেছে·····তার জন্য আনিবে অজস্র উপকরণ···মেজের ঝোলা, দুধের বোতল, রূপোর বাটি, আরো কত কি।...এ বাড়ীর ছোট ছেলেরা যা হয়েও খেয়ে নাই কোনো দিন।·····

ঐরাবত অঘোরে ঘুমায় আর অনুপমা জাগায় স্বপ্ন দেখে।

·····সে বাড়ীর কোথায় কি রাখা হইবে, কোনখানে বসিয়া কি কাজ করিবে অনুপমা, সে সব অনুপমার

(৩)

আষাঢ়ের মাঝামাঝি প্রথম সন্তান হইল অনুপমার। কল্পনার খোকা নয়—মেয়ে।...তবু হর্ষ—কচি মেয়ে দুইয়া ফুরাইবার অবসর হইল বেশীর। প্রথম সন্তানের মায়ের সংসারের উপরওয়ালাদের ভাগ করিয়া লইবার কিন্তু অনুপমার যে "মুক্তা সমান মেয়ে"। ছোট মেয়ের মা হইবার বয়সে একটা—তা'ও আবার ছেলে নয় মেয়ে। কাজ তার পড়িয়াছে যে তাহারি বাড়িয়া যাইতে? বরং মেয়ের আদিখ্যেতায় যে সংসারে ছোট মেয়ে এইতেই অনুভবের আর অন্ত থাকে না লোকের।...

অনুপমার ছোট মা, অনুপমার বিবাহের দু' বৎসর পরে বিবাহ হইল যার, সেও দুইটী খোকা সামলাইয়া সংসারের কতো ঝামেলা সামলায়। ছেলেদের লইয়া আদিখ্যেতা ত দূরের কথা, দৃক্‌পাত মাত্র করে না তাদের পানে।

ছোট জায়ের ছেলেদের দিকে চাহিয়া নিজের মেয়ের জন্য আর স্নেহের ভোলায় বাহুল্য ঘুচিতে পারে না অনুপমার। আসা কাঁচা কিছুক বাটিরই বা এতো কি দরকার? যে ছেলেটী বিছুক বাটির গতি কাটাইয়াছে তা'র পরিত্যক্ত ভাতেই যখন কাজ চলিয়া যায়।

তাছাড়া অনুপমার মেয়েই কাঁদেন।

বিদুরাবুদ্ধী যখন তখন দুধবাসটা যেন—বাবা! বাবা! মেয়ে না তো যেন তাড়া কাঁসর। একটি মেয়েই আছে। তবু না কেন, মা যেমন বাচাল তেমনি হবে তো মেয়ে। দুধবাসীও আজ কাল যেন নিরপ

বরং জল নামিয়াছে পতিকার দিকে। তাই তিনিও মেয়ে কাঁদিলেই বোধ হয় বলেন—তোমার মানায় যদি থামাও নাতনীকে, দোহাই! বাপ রে বাপ, এই তো আরও কটি ছেলে রয়েছে বাড়ীতে—হুঁ শখ আছে?

সুবিধা পাইলে হীরালালকে অনুযোগ করে অনুপমা—কেউ তো দেখতে পায়ে না মেয়েটাকে, চুমিটি নাটিটি। কোলে কর না একটু।

হীরালাল লাফাইয়া ওঠে—বলে করো। আমি এলে ছেলে পুলে নিতে পারি বাবা···তা' ছাড়া কে কোথায় মেয়ে কোলে করে।

একালের ছেলেরা এমন কথা শুনিয়া হাসিয়া ডিগ্বাজী খাইবে—কিন্তু হীরালালের আসলে—বাপের পক্ষে ছেলে মেয়েকে কোলে পিঠে নেওয়া নিতান্তই লজ্জাকর ব্যাপার ছিল।

মেয়েকে কোলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরে চলিয়া যাইত অনুপমা, আর কখনো কখিত তার নিজের রান্নাঘরের, যার একপাশে পাতা আছে ছোট্ট একটী নীচু চৌকী। বর্ষার দিনে আর শীতের রাত্রে যার উপরে ছেলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া এপাশে বসিয়া ছোট ছোট হাঁড়ি কড়ায় রান্না করিবে অনুপমা। উনানের আগুনের 'আঁচে' গরম থাকিবে ঘর।

অনুপমার মেয়েকে একদিন দেখিতে আসিল সুধা।

শুধু হাতে আসে নাই। দুইখানা কাঁথা আর একটা ঝিনুকে বাটী আনিয়াছে। ইহার মামাত ছেলে কোলে। মোটা সোটা কর্সা ধবধবে ছেলেটি সুধার, সাজ-পোষাকও চমৎকার। সুধার ছেলের কাছে—কালো মোগা পতিকার ছেলের একটা শস্তা সুতোর জামা পরা অনুপমার মেয়েটাকে এতো শ্রীহীন দেখায় যে নিজেরই ঘৃণা হয় অনুপমার। রাগও আসে সুধার উপর। মেয়ে দেখা তো শুধু ছুতো, নিজেকে দেখাইতে আসা আজ। ওর 'ঘুমড়ো পটাস' ছেলে কেমন চলে, কেমন বলে, কেমন হাসে, শুনিবার জন্য কান যেন পাতিয়া না থাকিবে।

তা' শুধু ছেলের কথা নয়—নিজের কথাও বিস্তর কয় সুধা। বাড়ীতে যে আর একখানা ঘর তুলিয়াছে···শ্রীমন্ত গিয়া রাশিকৃত বাসন কিনিয়া আনিয়াছে, কলিকাতায় বাপের বাড়ী গিয়া বদেশীমেলা হইতে সিলমাটির লক্ষ্মী সরস্বতী পুতুল সস্তায় করিয়া আনিয়াছে আড়াই টাকা জোড়া দিয়া···বিশেষ করিয়া ছেলের দুধ খাইবার জন্য একটা কালো গরু কিনিয়ে আসিয়াছে···এ সবই জানাইয়া যায় সুধা।···শেষে আরও বলে—"বলা উচিৎ নয় অনুপম, বুড়ি হয়েছ—তা, হাসে আসে যেয়েছই। বাবাঃ! এ বাঁচা দিয়ি আছি। কিন্তু মনে করো না ভাই, তোমায় দেখে এই "বিরিঞ্চির বাঞ্ছিতে" পড়লে আমি তো তাই পাগল হয়ে যেতাম।"···

অন্তর্যামী অনুপমা ঠিকমত উত্তর দিতে পারে না। মনে মনে বলে—পাগল হওয়া অতো সোজা নয়।

(৪)

দিনের পর দিন কাটে···মেয়ের কোলে পর পর দুইটি ছেলে হয় অনুপমার।·····আর দুজন দেবরের বিবাহ হইয়াছে তাদেরও একটি দুটি ছেলে মেয়ে হইতে সুরু করিয়াছে, নূনবধূ আসে—কেউ শহীর

ও বাড়ীতে কেউ যে থাকিত তোলাইতে।.....'লোকে হরিবোল' কোথা দিয়া যেন মানুষ হইতে থাকে অনুপমার ছেলেরা। অনুপমা জানেও তার সাধ্যি নেই। তা'ছাড়া—দেওঘরের বসিকাতায় আফিসের চাকুরী, ভেলি পাসেঞ্জারি করে, তাদের বৌছেলের বড়ন বড় আদর বাড়ীতে-থাকা মাষ্টারের বৌছেলের হওয়া সম্ভব নয়।

ছেলেদের খেতের ঘোলা, টেলাগাড়ী, আর ষ্টীম লেটের মশারির কথা নিজেরও আর মনে পড়ে না অনুপমার। শাস্ত ও গম্ভীর ছবির মোকে একদিন কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া ছিল একথা ভাবিলে হাসি পায় এখন। স্কুল বয় অভাবটাই যে সত্যকার অভাব এ কথা অনুপমা বুঝিতে শিখিয়াছে আজকাল।

দোতলার ঘরের খাটের তলায় ঠাই যে পীড়ন হইতেছে ঘরকন্নার অজস্র উপকরণ। বটি কাটারি ভুলো তাপার মতো স্থূল উপকরণ। অবশ্য দোতলার সেই ঘরখানায় নয়। সে ঘরে আজকাল ছোট জা শোয়। একেই সে অবহেলার ঘরের মেঝে, তা'ছাড়া বারোমাস সর্দি কাশির বাত, তাইই দোতলার ঘরটা তা'কে ছাড়িয়া দিয়া মেজবৌর ঘরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে অনুপমাকে।...খালিই পড়িয়াছিল ঘরটা, গেল আশ্বিনে প্রচণ্ড সেই ফ্লুর রাতে যারা গেলেন মেজবৌ।...যায়া গেলেন অবশ্য ঝড়ে নয়—রোগেই, তবে মারকাযারা দিনটি।

পাঁচটি ছেলে মেয়ে লইয়া এ ঘরে কুলানো সম্ভব নয়, বড় মেয়েটি ঠাকুরমার ঘরে আর হীরালাল বৈঠকখানার শোয় তাই রক্ষা। একেই ছোট ঘর, তা'র উপর আবার আধখানা ঘর জুড়িয়া বর্ষার দিনের প্রয়োজনে শুকনো কাঠের ঠকরা আছে। মেজবৌ আবার মরু কাঠ যাখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না—বাড়ীশুদ্ধ সকলের টিটকারি সহিয়াও রাজ্যের নারকেলের মালা, চাবের ছোবড়া, আখের ছিলতে আর সজিনা ডাঁটার খোসা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। মেজবৌর মৃত্যুর পর এই তুচ্ছ জিনিসগুলা টানিয়া ফেলিয়া দিতে কেমন যেন বাধা বয় অনুপমার। সবই আছে যাবপাশে মালসা বড় চৌকি পাতিয়া আড়াআড়ি করিয়া শোয় পাঁচজনে। পা ছড়ানো [illegible]...

হীরালাল কিন্তু আবার একদিন পরদিন হীরালাল আসিয়া জোটে। ছোট ছেলেটাকে দিয়া চুপি চুপি ডাকিয়া পাঠায় অনুপমা। ভুরুটি হীরালাল আসিয়া এদিক ওদিক তাকায়, বলে—বৌমারা কোথায় সব।

'বৌমারা' অর্থে ভাববধূরা।

অনুপমা জবাব দিয়া ওঠে—যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। কেন তারা তোমার কাঁসি বেজে থাকি?

—না না—ইয়ে—তাই বলছি। কি দরকার পড়লে, ডেকে পাঠালে যে?

—কেন দরকার না পড়লে ডেকে পাঠাতে নেই? পরকুলুন নাকি?

—আ ছি ছি বলে। ছিতের বাঁটা আর কখনো হ'লপা তোমার। গোকা খেয়ে নেই, 'ভেব' [illegible] দিয়ে মুখ মনে আছে তো?...হীরালাল বলে।

মনে! অনুপমার আবার মনে নাই সে কথা। যখন তোর সেই কথাই তো মনে রাখিয়া আসিতেছে সে। কিন্তু হঠাৎ হীরালাল সেই প্রথম রাত্রের কথা তুলিতেই কেমন যেন লাগে অনুপমার, বড় মেয়েটার বয়সের কথা

তুলিয়া যে পাত্র খুঁজিয়া তাগিদ দিতে ডাকিয়া আনিয়াছে হীরালালকে, সে কথা যেন মনেই থাকে না। মৃদু টিপিয়া হাসিয়া বলে—হাঁ সেই অবধি 'ভেবে' চলি, অবশেষে এই তোমার সঙ্গে 'ভেবে'।

দেশের মধ্যে পা ডুবাইয়া দিয়া খুব করিয়া ঘসে হীরালাল, বলে—নতুন তাই দেখছি—দু' একখানা ঘর না তুললে আর—

অনুপমা একটু রহস্যময় হাসি হাসিয়া ওঠে—ঘর তুলতে হ'লে আর এ ভিটের নয়—নিজের জমিতে।

—নিজের জমি? হীরালাল পরিহাস মনে করিয়া হাসিতে থাকে—তা' হলে আমার এই টাকের ওপর ঘর তুলতে হয়, নিজের বলতে তো এইটুকুই জমি দেখছি—

—ঠাট্টা ভাবছো—চাপা আর উত্তেজিত সোনায় অনুপমার কণ্ঠস্বর—জমি আমি কিনেছি তা' জানো?

—তার মানে?

—মানে আবার কি? কিনে ফেললাম পাঁচ কাঠা জমি। চৌধুরীগিন্নীর অবস্থা তো জানোই? মেয়ের বিয়ের ছুতোয় বলতে গেলে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল—আমি পরামর্শ করলাম, বললাম—খানিকটা জমি বরং আমায় দাও চৌধুরীখুড়ি, আমি একশো টাকা দিচ্ছি।

—বলো কি? একশো টাকা তুমি পেলে কোথায়?

—সে আমার ছিল।

হীরালাল মাথা নাড়া দেয়—অমনি 'ছিল'! পাবে কোথায়? গয়না বাঁধা দিয়েছো নিশ্চয়।

—বাঁধা নয়—ওই চৌধুরীগিন্নীকেই বেচলাম। চার ভরির, তোলা ষোলোটা ছিল যে—

ধারটা ঘোচালে?—হীরালাল রসিকতা প্রকাশ করে।

—ধার! ধার দিয়ে আমি কি ঘুষে জল খাবো? গিন্নীবান্নী মানুষের তোলা হাতের তো ভারী দরকার!

সোনার আবার দরকার নাই। হীরালাল 'গিন্নীবান্নী' স্ত্রীর এমন নিখোঁজ উদারতার পরাকাষ্ঠা যেন সহ্য হইতে চায় না। অপ্রসন্ন ভাবেই বলে—না না ভারী অন্যায় করেছ। মেয়েটার বিয়ের সময় কাজে লাগতে পারতো।

অনুপমা ঝাঁঝিয়া ওঠে—কেন, মেয়ের বিয়ের সুবিধে আমি করতে যাবো কেন? যে যার নিজের তালে আছে—তোমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা তুমি ভাবো সে যাও, আমার বন্ধকীর কথা তুমি একদিনের তরে ভেবেছো? নী খেয়ে না-পরে গয়না বেচে যেমন কোরে হোক বাড়ী আমি করবোই তুমি দেখো।

সকালকেলা ছোট মা বীণা হাসিয়া হাসিয়া বলে—বউঠাকুরুণ বুঝি আজকাল বাড়ীর ভেতরেই ওজন দিদি? অতটুকু ঘরে মুলোয়?

হাসি থেকে [illegible] একটা চড়িয়া উঠে অপরের, চোখে বিন্দু [illegible] করিয়া দিনের রাতে আপনার ঘরে আর [illegible] যাইতে পারে নাই বীরালাল। আবার কাছে [illegible] দিতে প্রবৃত্তি হয় না। বীরবরে [illegible] হয়—না মুলোলের ব উপায়। [illegible] মাতাল' হয়ে থাকতে পারেন। [illegible] ঘরের [illegible] কি আর নেই মাতাল

তো নেশা চৌকী—পুরুষ মানুষ, পাবেনও তো এতো

[illegible]...তাকাইয়া মনে হয় অপরাধ—দুনিয়া যেন তা'কে ভয়ঙ্কর একটা [illegible]

[illegible] [illegible] উপর গাড়ীখানা তুলিয়ে দে, ভালো করিয়া রাখিবে বীরালালের [illegible] পাইলে [illegible] জানে বীরালাল তার প্রমাণ দেখাইয়া দিবে।...পিছনে বাসিন্দ [illegible] যারা সব কিছুই [illegible] করিয়া সকল তাহিয়া রাখিয়াছে অনুপমা

বাসিনীর মতো আদরিণীরা [illegible] একটুকু ঝিনিস ব্যবহার করে না। এমন কি সেবারে রাসের মেলা দেখিতে গিয়া বীরালাল [illegible] যে গড়গড়াটা কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটী পর্য্যন্ত আনকোরা তোলা আছে। নূতন বাড়ীর [illegible] এমনি তোড়া পাতিয়া দিয়া বীরালাল চলিতেছে, নলে তামাক খাইবে বলিয়া।

প্রত্যেকবার ছেলেমেয়েদের নূতন জামা জুতাগুলি তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া ছোট হইয়া যাইবার মুখে পরিতে দিবে ভাবে···আমার আশায় আর কতো দিন কাটাইবে অনুপমা ?

(৮

অনেক দিনের পর সেবারে সেজ ননদ বাসন্তী বাপের বাড়ী আসিল

অবশ্য ভালো, পরিবারে থাকে, বড় একটা আসা যাওয়া নাই [illegible]—মা কোনদিন আছেন কোনদিন নেই এমন একবার দেখতে

একদল ছেলেমেয়ে বাসন্তীর শুধু সঙ্গে কিটকাট ছিলছান। এ অঞ্চলে এমন পোষাক পরিচ্ছদ দুর্লভ। যাওয়া যাওয়ায় তরিবৎও বেশী তাদের [illegible] মুড়ি মুড়কী খেয়িয়া নাকি হাসিয়া খুন তাহারা।

অবশ্য ভালো তাই আদরও বেশী বাসন্তীর। অধর্ব ত্রিপুরাসুন্দরী চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া [illegible] আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি ধরিয়া বৌদের গালিগালাজ করেন। বাসন্তী আসায় সবাই [illegible] উঠিল। বাসন্তী দুইটা কথা কহিলে সকলেই যেন ধন্য।

শুধু অনুপমারই ধরিয়া গাফিলতি করিবার সময় নাই। ননদ বলাই, তারে ভাগী আদায় তার খাটুনী তো সহজ বাড়ে নাই ? সেই তো বড়, সব দায়ীত্ব তো তারই ?

অন্যথা খাটে কেউ তা 'মুখের' মত কেউই তাকে মুখের দেখে না।

বাসন্তী শুনাইয়া শুনাইয়া বলে—বাবা, বড়গিন্নীর আর দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। একবার একটা কথা কইবারও ফুরসৎ নেই। বাড়ীতে যে একটা মানুষ এসেছে—

অনুপমা জলের ঘড়াটা কাঁকাল হইতে নামাইয়া বলে—নাতনের সঙ্গে 'মনিবদ' করবার জন্যে মানুষ তো বাড়ীতে ঢের আছে ভাই। পাখা পাখীর কাজই করে।

—ও বাবা! কি জানি ভাই, কি যে এতো কাজ তোমাদের কে জানে! ঐ তো আমার সংসারেও তো কাজ কড়া কম নয়? বাসন চাকর শুদ্ধির থাকলে কি হবে, তাদের চরানোও সোজা কাজ নয়। সবই তো করি, তবু বেড়াতে যাই, মানুষ এলে আড্ডা দিই, আর তোমাদের উপরাত্ত কেবল ভাতের হাঁড়ি।

—মুখের যা বশা।...বলিয়া চলিয়া যায় অনুপমা।

গতিকা নন্দের গা টিপিয়া বলে—দেখলে তো? চল্লিশ ঘন্টা আগুন। সংসারের সঙ্গে দিনরাত যেন 'চালে খাঁড়ায়' আছেন। মুখের সামনে এগোয় কার সাধ্যি।

—তা আর জানি নে—বাসন্তী বলে—বিয়ের কনে এসেছিল 'আলাদা হবো'—ও কি সোজা মানুষ?

গতিকা অগ্রাহ্য ভরে মুখ ঘুরাইয়া বলে—তা' হলেই পারতেন? কে মাথার দিব্যি দিয়ে আটকেছিল?

—বড়দার মুরোদটাও দেখতে হবে।.....

.....রান্নাঘরের ভিতর হইতে অনুপমার খুন্তির শব্দটা মাঝে মাঝে থামিয়া যায়।

বাড়তি লোক হইলে—বাসনের অনুপাম পড়িলে, এ বাড়ীতে—শুধু এ বাড়ীতে কেন ও অঞ্চলেই—কলাপাতা কাটিয়া ভাত খাওয়ার প্রথা। বিশেষ তো কুটোকাটার। বাসন্তীর ছেলে মেয়েরা কিন্তু পাতায় খাইতে নারাজ। বাসন্তী হাঁকদিয়া বলে—ওগো বাড়ীর গিন্নীরা—তোমাদের কুটুমরা বলছে—'আমারবাড়ীতে থালা নেই কেন ছি!' নাও—এখন বসে ঘাসো নিজেদের।

সেজবৌ অপ্রতিভ ভাবে বলে—থালা তো বেশী নেই ঠাকুরঝি, সেবারে আবার চুরি গেল একগাদা।

—কেন গো বড়গিন্নী ঘরে চৌকীর তলায় তো বাবাতলি ঢের বাসন দেখলাম।

দিদির ভয়ে..... সেজবৌ মুখচোরের ভাবে অনেকখানি মুটাইয়া বলে—বেশ পাকলে কটকের কি? ওসব উনি নিজের পয়সা দিয়ে কিনেছেন—দেবরের হাত দেবার হুকুম নেই।

—যাক্—আর কি। বাসন নিয়ে করবেন কি সঙ্গে বাড়ি দেবেন?

—যাগো না, যখন এসে হবেন তখন সুখ করবেন। দেখুনগে না উকি মেরে—বাটি কাটারি, শিল নোড়া, হাতা খুন্তি থেকে সুরু করে এখন ভাল বাঁধবার কাঠিটা পর্যন্ত সব মজুত আছে। একটি মিনিটে চাবি দিতে যাব—দেখবেন?

—কি হচ্ছে বৌ বাবা! এমনি একলা ঘেঁচে থাকলে কখনো সংসারে লক্ষ্মী হয়?

অনেক চিন্তা-ভাবনা কাটিয়া অনেক দীলাভন করিয়া সেবার বাসন্তী বিদায় হইল। পরদিনই অনুপমা গেল সুধার বাড়ী।

সুধার বর কন্ট্রাক্টর, অনুরোধ করিলে সুবিধা সুযোগে অল্প খরচে সেমন তেমন বাড়ী একটা আরম্ভ করিয়া দিতে পারে সে।

অনেকদিনই 'যাই যাই' করিয়াছে অনুপমা, কিন্তু সুধার সেই অমায়িকতার আবরণ দেওয়া অহঙ্কারের কথাগুলা মনে করিলে আর যাইতে উৎসাহ হয় না।

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল।

ভগবানের কিছু দয়া আছে হয় তো, পথেই দেখা সুবোধের সঙ্গে। অনুপমা যেন বর্তাইয়া যায়। আগে অবশ্য কথা বলাবলি ছিল না, এখন আর অতো মানিতে পারে না। পাঁচসাত বৎসর হইয়া গেল জামাই হইয়াছে তা'র, দুটি নাতি নাতনী, অর্দ্ধেক চুলে পাক ধরিয়াছে, এখন আবার অতো যৌগিরি কিসের?

বলে—ভালোই হ'ল, দেখা হ'ল, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

—কেন বলুন তো? হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়, অনেকদিন থেকেই ভাবছি।.....

অতঃপর অনেক ভণিতা আর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া নিজের আবেদন জানায় অনুপমা। চোখের সামনে বড় বলিয়াই জানে। সুধার স্বামীর সম্বন্ধ করিয়া 'ভাই' বলিয়াও কখনো কথা কয় না সে, সম্পর্কের মর্যাদাটুকুও রক্ষা করিয়া বলে 'পিসেমশাই'। শেষ কালে প্রায় হাতজোড় করে—আপনারা যাকলেই এবে পিসেমশাই, 'না' বলবে তবে না। আমার অনেকদিনের সাধ।

কিন্তু সুবোধ জানিতে চাহে প্রথমে অন্ততঃ কতো টাকা ফেলিতে আসিবে অনুপমা। জিনিসপত্রের দাম আগের মতো নয় নাই? সবই চড়িয়াছে।

অনুপমা মনে মনে হিসাব করিতে থাকে.....সব জিনিসের সঙ্গে সোনারও দর চড়িয়াছে.....তুমি টাকা ছাড়া এখন চল্লিশটাকা। অতএব আটতরির সেই অলঙ্কারটা বেচিয়া দিলে তিনশো সাতচল্লিশো হয়, তাহাতে পুঁজি জমাইয়া মোটা পঞ্চাশ টাকা হইয়াছে।

বলে—গোটা আষ্টি চারশো দেবো আপনার হাতে—

—চারশো? বলেন কি? অনেক খুঁজতেই তো বেরিয়ে যাবে ওটাকা!

—কি করবো পিসেমশাই, দেখছেন তো ওই মানুষ। জীবনভোর রোজগার করলেন আর উড়িয়ে চালালেন, কখনো একপয়সা রাখলেন না। সুবিধে করে আরম্ভ করে দিন, তারপর আমাদের আপনার বন্ধুদের একটা চাকরীর আশা হচ্ছে, ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

অর্থাৎ টাকাটা অনুপমা যাহাই হোক সুবোধের নামে।

অনুপমার মুখ দেখিয়া কি বলা যায় সুবোধের? না অবস্থাপন্নীওয়ালা ঘুষকে লইয়া ঘরকন্নার অভ্যস্ত চোখে—অনুপমারই এই বিনীত কুণ্ঠিত ভাবটা নূতন লাগে। তাই আদুর সুবোধ রাজী হয়।

পুরনো ইটকাঠও তো দু'দিনে যেসে।

মাসদুই পরে অনুপমার বাড়ীর বনেদ খোঁড়া সুরু হয়।

বড়ছেলে সুরেশ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার একটা চাকুরীতে ঢুকিয়াছে। অনুপমার আর ভাবনা কি?

প্রথমে ব্যাপারটা চুপিচাপি থাকিলেও প্রকাশ হইতে দেরী হয় না।

মা দেওরেরা অগ্নিমূর্তি হইয়া ওঠে।

এতোদিন সংসারে গিন্নীপনা করিয়া লুকাইয়া যে অনেক টাকা করিয়াছে অনুপমা এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। ভোলানাথ হীরালালকেও আর ছাড়িয়া কথা কহে না কেউ। তলে তলে সলাপরামর্শ না থাকিলে একলা মেয়েমানুষ আবার এতোবড় কাণ্ডটা ফাঁদিয়া বসিতে পারে? এই মতলবই তবে ছিল এতোদিন? গিন্নী বসিয়া বসিয়া সংসারের খোঁজ করিয়াছেন আর কর্তা ওদিকে বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।···এরা বড় বোকা সোকা ভালোমানুষ তাই কোনো সন্দেহ হয়ে নাই। এমন হিসাব ঠিক হীরালাল, বাড়ী কাঁদিবার টাকা তা'রা আসে কোথা হইতে!

হীরালাল এদিকে কথাবন্ধ করিয়াছে অনুপমার সঙ্গে।

তিরিশ বৎসর মাষ্টারী করিয়া যতোই গাধা বনিয়া যাক, স্ত্রীর উপর কেন কলাইবার উপযুক্ত পৌরুষটুকু এখনো বজায় আছে।

কিন্তু অনুপমা আর টলে না। এতোদিনে সে দাঁড়াইবার মাটি পাইয়াছে, চারখানা কোঠাল উঠিয়াছে তার নিজের জমিতে। শুধু অমন নয় বারোমেসে হাম আর বালাজোড়াটাও হেছে। তা' এক শ টাকা লোহা দু'টি অনুপমার, তাই জোর।

সুরেশের টাকা হইতে তিরিশটাকা করিয়া মাস শোধ দেয় অনুপমা, পনের টাকা রাখে ছেলের হেঁসকাড়া আর নিজের বাবদ। তবু যেন আর চলে না। খাওয়াপরায় টান দিয়াও চলে না। হীরালালকে এনে আজকাল প্রতিদিন দু'বেলে একদিন দুধ না পাইলে বলে—তা' হোক—তা' হোক—তোমার বাড়ী তো হচ্ছে ওর বলেই হল। বুড়ো বয়সে আদিখ্যেতা হয়ে ফেলেছি তাই যা একটু—ক্রমে সে অভ্যাস হয়ে যাবে।

অনুপমার রাগও হয়, দুঃখও হয়। সত্যাই বড় বুড়া হইয়া পড়িয়াছে হীরালাল, পঞ্চার ছাপায় বয়স বলেই যেন সত্তর বছরের মতো দেখায় হীরালালকে। আহা···কোন দিন আরাম আয়েস পাইল না মানুষটা। টাকা রোজগারের ঝোঁকে ভেবেন ভালো করিয়া একদিন খাওয়ানো যাখানোও করে নাই অনুপমা।···ছোটআয়েরা সংসারের যাবতীয় ছাড়াও আলাদা খরচা খাটি করিয়া কতো ভালো মন্দ খাওয়ার খাওয়ায় মুরুকে।

শীর্ণ চল্লিশটা বছর অনুপমা করিল কি?

অবশেষে সত্যাই একদিন গৃহপ্রবেশের দিন দেখা হয়।

অনুপমার বাড়ী একরকম শেষ হইয়াছে।

কল্পনা অনুযায়ী না হোক, তবু তো সত্যকার একটা নিজের বাড়ী। শাক ভাত খাইলে কেউ টিটকারি দিতে আসিবে না, বী দুধ খাইলে কেউ নজর দিতে বসিবে না।···গলা খুলিয়া পাঁচজনের নিন্দা করিবার স্বাধীনতাও কি কম সুখের?···

পুরুতবাড়ী লোক পাঠায় অনুপমা পাঁজী দেখাইতে।···

কিন্তু—

পুরোহিত আসিবার আগেই হীরালাল আসে কাঁপিতে কাঁপিতে।

জ্বর আসিয়াছে তাঁর।

অসহ্য সেই ছোট ঘরটাতেই আশ্রয় লইতে হয় তাকে।···ছেলে মেয়েরা সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ডাকার কবিরাজ আনিয়া বসিবার জায়গা পায় না।···রাত্রের তাপে সেই ছোকরা ডাক্তারটি তো উত্তাপ বলিয়া গেল—এমন করে বাঁচেন কি করে আশ্চর্য!

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলিয়াই তো এমন ভাবে থাকার বিরুদ্ধে আকুল দুঃখ করিয়া আসিল অনুপমা। এমন করিয়া থাকিবে না বলিয়াই তো আজ পর্যন্ত এমন করিয়া থাকা!...

কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে?

হীরালালই যে বুঝিল না কোনদিন। বুঝিল না বলিয়াই তো অনুপমার বাড়া [illegible] সেই খুঁটের ঘরটায় মরিতে আসিল।···

মাইক্রোস্কোপের উপর মরিতে নাই, কিন্তু মরণ বাঁচন কণ্ঠকে নাড়াচাড়ি করার উপায় নাই যাহার?··· সময় ফুরাইলে মানুষ কি আর নিজের অপেক্ষা করিবে?

তাই চৌকী ভক্তপোষ বাহির করিয়া ঘর খোওয়া ছাড়াও উপায় থাকে না আর।

একে একে সমস্ত জিনিস বাহির হইতে থাকুক অনুপমার।

ঘরের কাজ করিবার চাকরটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে ঘর...সেই সব বড়ি কাসন্দি কুলো ডালার বিপুল সমারোহ। বস্তাবন্দী বিছানা বালিশ, বাক্স, আসি কত কি।...খুকাইয়া পাড়ার লোককে দিয়া, হীরালালের খোসামোদ করিয়া যতো কিছু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে অনুপমা এই দীর্ঘকাল ভোর।... সব আনিয়া আনিয়া উঠানে ফেলা হয়। হীরালালের বুড়ি বছর বয়সে আনা সেই কাশীঘাটের পটের রূপ 'কাশীর দর্শনের' ছবিখানা পর্যন্ত।...এতো জিনিস এতটুকু ঘরে ধরিয়াছিল কোথায় ?...

মক্ষিকারা ছাতাপড়া ঘুপলাগা এই সব রকমারি জিনিসের দিকে বোকার মতো চাহিয়া থাকে অনুপমা। এই জিনিসগুলাকে যে এতোদিন বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছিল, কেই উঁকি মারিতে আসিলে কুরুক্ষেত্র করিয়াছে, সে কথা মনেই থাকে না আর।

কার জিনিস ? কে ঘর বাঁধিবে ? অনুপমা ?

অমন একটা সাজ করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া যে চাহিয়া আছে সেই অনুপমা ?

হীরালালকে বাদ দিয়া একলাই তো সে এতোদিন ঘর বাঁধিবার আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। গৌণ হীরালাল এমন মুখ্য হইয়া উঠিল কখন যে—হীরালালের অভাবে সব মিথ্যা হইয়া গেল ?

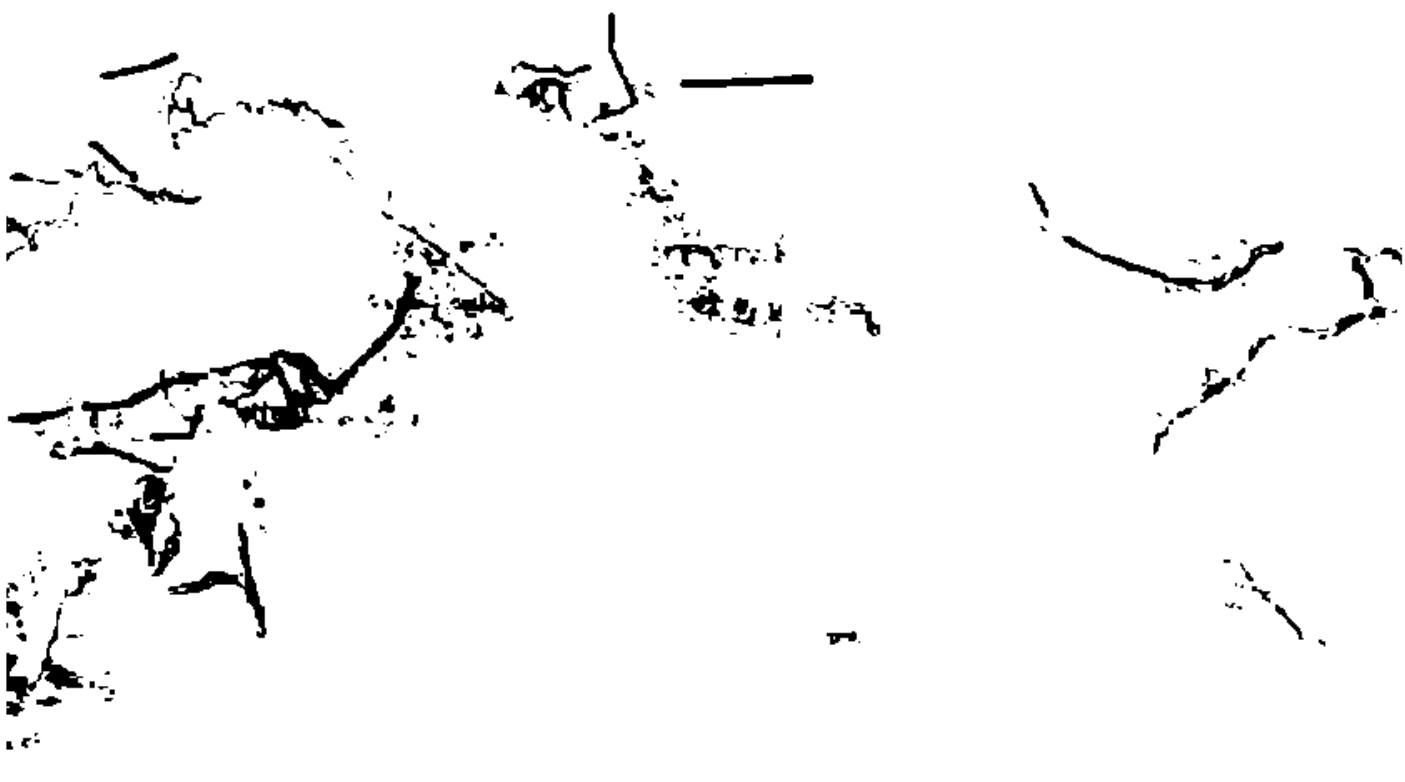

পরদেশী

শ্রীঅপেক্ষনাথ মিত্র

'দুনিয়া'! 'দুনিয়া'!

কেউ সাড়া দিল না। কদু বুড়ি পুবদুয়ার ধরজায় ধাক্কা দিল, 'দুনিয়া দরজা খোল্, লক্ষীটি; সন্ধ্যা হয়ে এলো, এখনও মুখে একটু জল দিলি নে—'

'না, মাসী, আমি উঠ্‌তে পাচ্ছি নি। আমার খুব অর হয়েছে—'

কদু বুড়ী আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেলো। বালিগঞ্জের রেল লাইনের পশ্চিম ধারে একটি বস্তি; তার অধিবাসীদের মধ্যে অবশিষ্ট এই দুটি মাত্র প্রাণী। আগষ্টের দাঙ্গায় বস্তির অধিকাংশ লোক মারা গেছে—টালি দিয়ে বাঁধানো গলিতে গলিতে রক্তের দাগ এখনও তার নিষ্ঠুর প্রমাণ স্বরূপ উন্মুক্ত আকাশের তলে অভিযোগ জানাচ্ছে। যারা প্রাণে মরে নি, তাদের কতক পালিয়েছে, কতক হাসপাতালে। দুনিয়ার বাপমা ভাইবোন সব মারা গেছে। জনকোলাহলময় বস্তি আজ রিক্ত, মৃত্যুর ন্যায় নিস্তব্ধ, প্রেতপুরীর ন্যায় ভয়াল। বৃদ্ধা কদুবুড়ির একমাত্র অবলম্বন এক দূর সম্পর্কের নাতি, সেও গেছে।

যারা মরার মুখে এগিয়ে গিয়েছিল তারা প্রাণ নিয়েই ফেরাই দেয় নি। বস্তিতে আগুন ধরিয়ে তার অর্ধেকের বেশী ভস্মীভূত করেছে আর বস্তির অধিবাসীদের যথা সর্বস্ব লুটে, নষ্ট করে চলে গেছে। কদুবুড়ী ছেঁড়া নুটে-পাথার পরীতে পরীতে ঘুরে কিছু জল আর নুন সংগ্রহ করে' এনে' দুনিয়াকে ডাকছে। সে যদি পাতি পাতি করে' দেখেছে এ এই মেয়েটি ব্যতীত আর কেউ সে অঞ্চলে নেই। বুড়ী তাকে কিছু বলে নেই, তবে তার ভাবভঙ্গী আছেন। কিন্তু এই বৈধব্য মেয়েটি বাঁচবে কিসে? কেই বা ওকে বাঁচাবে? আহা, ওর বয়েস যে এখনও কাঁচা! বিশ্বের এই প্রলয় ঝঞ্ঝার মধ্যে তার প্রাণ নিয়ের দুঃখ ভুলে এই অনাথা সঙ্গিনীর জন্য বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে।

রাত্রির আঁধার ক্রমে ঘুমের হয়ে আসছে। দূরে মোরগের ডাক থাকিয়া থাকিয়া উষার আগমনী গেয়ে চলছে। শুক্লপক্ষের একাদশী, চাঁদ ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার একটা পর্দার মতো যে ছবিটি ঢেকে দিয়েছিল সারা সহরের, এখন সেই পর্দাটা আস্তে আস্তে কে গুটিয়ে নিচ্ছে। রাস্তার আলো জ্বলে না; লোকেরও গতাগতি নেই। দুনিয়া ঘরে দুইটি করে ঘুমিয়ে ছিল; শেষ রাত্রে জেগে দেখলে পিপাসায় তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসছে। সে বিছানা ছেড়েই তাড়াতাড়ি জল গড়াতে গেল। কিন্তু এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। কলসী দুটো তাতা টালির

[illegible] নিয়ার সব কথা মনে পড়লো। তার মনে হলো যেন অন্ধকার তাকে [illegible] থেকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছে। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠ্‌লো। চোখের উপর [illegible] ঘটনা দেখেছে তাই মনে পড়ে তার বুকের ভিতর যেন হাঁফিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু পিপাসায় প্রাণ যায়, ওরে পড়লে চলবে না। সে আস্তে আস্তে কপাট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে আসতে হবে। বেশী দূর নয়, তবুও ভুনিয়ার পা যেন আর চলে না। আঁচল লুটোতে লুটোতে সে টল্‌তে টল্‌তে কলের কাছে গেল।

তারই অনতিদূরে মিউনিসিপালিটির ড্রেনের মেন গর্ত। সে একটু বিশ্রাম করে' কল থেকে জল খাবে এই মনে করে' সেই মেনের ঢাকার উপরে বসে পড়লো। তার মনে হলো যেন দূরে থেকে কার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। ভুনিয়া চারিদিকে চায়, কোথা হতে শব্দ আসছে ঠাওর কর্‌তে পারে না। অথচ চাপা কণ্ঠের একঘেয়ে কান্না যেন অন্ধকার ভেদ করে' পৃথিবী ভেদ করে' বেরুচ্ছে। শেষে তার মনে হলো যে, যে ম্যানহোলের উপর সে বসেছে তারই ভিতর থেকে ঐ মর্মভেদী ক্রন্দন আসছে। তখন সে উঠে মুহূর্তে ঢাকনা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো। চারিদিকে চেয়ে দেখলো কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। মনে পড়লো রাত্রি প্রায় ৩ঃ ঘটা কারফিউ। থাকে থাকে বড় রাস্তা দিয়ে পুলিশের লরী মোরে হর্ণ বাজিয়ে চলছে, কিন্তু রাস্তায় লোকজনের গতায়াত নেই। বাড়ীর বাইরে পা বাড়িয়েছে বলে' তাকেও পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার একমাত্র চিন্তা কি করে মাটির গহ্বর থেকে এই আর্তকে উদ্ধার করা যায়।

প্রকৃতির অবশিষ্ট অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ক্রমেই সরে যাচ্ছে। এ যেন নববিবাহিতার নতুন-বধূ সম্ভাষণে যাত্রা। নীলশাড়ীর অবগুণ্ঠন একটু একটু করে মুখ থেকে সরে যাচ্ছে। ভুনিয়া সেই অল্প আলোকে দেখতে পেলো রাস্তার রক্তকুলের পাশে পড়ে আছে বালতীর একটি হাতোল। সে সেইটি নিয়ে ঢাকনার মধ্যে চাড় দিয়ে ঢাকনাটা তুলে ফেললে। এবং নীচু হয়ে দেখলো একটি অজ্ঞান বাঙ্গালী মেয়ে সাহায্যের জন্য উন্মুখ হয়েছে। ভুনিয়া নিজের শাড়ীটা কোমরে খুব শক্ত করে' জড়িয়ে নিলে এবং দুই পা ড্রেনের দুই কিনারায় দৃঢ় ভাবে স্থাপন করে' নীচু হয়ে মাহিয়াকে টেনে তুললে। মনে হলো মাহিয়ার দেহে তখনও কিছু রয়েছে। একজনকে উপরে রেখে ভুনিয়া যখন আবার একজনকে তুলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সদ্য উদ্ধারপ্রাপ্ত বুঝতে পেরে বলে উঠ্‌লো—আর কেউ নেই।' ভুনিয়ার পায়ের দিকে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে কাঁদে—আমায় বাঁচাও।'

তার [illegible] ভুনিয়া নিজে দুর্বল হোক কাজেই সে সবলে যেন কোথা থেকে অসীম বল সে [illegible] সে তার দুর্বলতা ভুলে গেল। ড্রেন হতে সদ্যমুক্তকে, যুবক হলেও ভুনিয়া তাকে একরকম কোলে করেই নিয়ে এসে তার ঘরে এক তার নিজের পরিত্যক্ত শয্যায় শুইয়ে দিলো।

তখনও ঘরের মধ্যে আঁধার ছিল। যুবককে শোয়াইয়ে সে আবার জলের কলে গেল এবং একটি ভাঙ্গা বালতীতে খানিকটা জল নিয়ে ফিরে এল। ক্রমেই ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। চারিদিকে গাঢ়ীর কলরবে যেন শান্ত বিশ্বমধুর মুখে সহসা যেন কত অকথিত বাণী ফুটে উঠ্‌লো।

ঘুনিয়া সেই রাত আন্দাজ দেখলো যে যুবকের মুখ চোখ ও বস্ত্রাদির রক্তের দাগ জল দিয়ে সে সব পরিষ্কার করে দিলো। যুবক জল পান করে শীঘ্রই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুনিয়া তখন কলুবৌ-এর খোঁজে বেরুলো। কলুবৌ তখন উঠে প্রতিদিনের অভ্যাস মত উঠান ঝাঁট দিতে শুরু করেছে। ঘুনিয়া বললো, 'মাসী, বাজার হাট হবে টবে না? বিয়েও পেয়েছে, একটা লোকও এসেছে—'

'তবা, আনা লোক আবার কোথায় পেলি? বলে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।'

ঘুনিয়া তার দুগাছি রুপার চুড়ি হাত থেকে খুলে দিয়ে বললো, 'এইটে বেচে কিছু মুড়ি আর গুড় কিনে এনো—আর আর—যা যাচে তুমি নিও—'

'এ আবার কি কথা! যা যাচে সব তোকেই এনে দেবো। এক কাজ করলে হয় না? কিছু চাল আর নুন নিয়ে এসবো?'

'তুলোবো বিসে? তার হাঁড়ি চাই, খুন্তে চাই, কড়া চাই, কেরোসিন চাই—'

'আছে, আছে—আমি ঘুরে ঘুরে সব খুঁজে জোগাড় করেছি—তুই খালি বলে যে আমাকে। বেঁচে যতক্ষণ আছি—পেটটাতে কিছু দিতে তো হবে!'

ঘুনিয়া সম্মতি দিয়ে চলে গেলো।

বুড়ি সব কিনে বেচে যখন ঘুনিয়ার ঘরদোর দেখা দিল, তখন চৌকাঠের উপর মাথা দিয়ে ঘুনিয়া ঘুমুচ্ছে। এক অসহায়ের মধ্যেও সে একটু শান্তির সুখ দেখেছে—সে একটি প্রাণীকে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে। মৃত্যু তখন সারাদেহে দিনরাত নৃত্য করছে, তখন বাঁচা আর বাঁচানো এক নতুন অনুভূতি জাগায় প্রাণে।

বুড়ি ঘুনিয়াকে ডাকা দিয়ে তোলালো এবং সব সওদা বুঝে দিয়ে চলে গেল। শুধু বলে' গেল খানিক [illegible] খেয়ে যানা পুরিয়ে নু[illegible]'

অনেকক্ষণ ঘুনিয়ার ঘুম ভাঙলো। ঘুনিয়া তাকে মুড়ি গুড় খেতে দিয়ে সুস্থ করলো।

'তোমার ঘরার নামটা সোনাম। কি বলে তোমায় ডাকবো?'

'আমার নাম ঘুনিয়া!'

'যাঃ। খাসা নামটি তো। আমার নাম—'

'তোমার নাম নাই বা বললে।' বাধা দিয়ে ঘুনিয়া বললো, 'তোমাকে পরদেশী বলে ডাকবো—কেমন?'

'পরদেশী। পরদেশী। যাঃ শুনতে তো মন্দ লাগছে না!'

এক সপ্তাহ পরে। পরদেশী উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে, তবে দুর্বল। যেবে থেকে বাজার ঘুনিয়া। নিরাপত্তা ঘেটে তার কতে প্রলেপ দেয়, উনুনে হাঁড়িতে হাত, ঘরে' সাহায্য করে। এরই পরদেশী হয়ে ঘরে উঠেছে।

[illegible] ছলছলোখে চেয়ে তাদের দেখে। শেষে বলে, 'ঘুনিয়া, পালিয়ে চল্। এখনও [illegible] যাচ্ছে।'

ঘুনিয়া ম্লান মুখে হাসে; বলে, 'আসী আর এই ক'টা দিন। পালিয়ে যা যাবো কোন্ চুলোয়? যার কে [illegible] তার বিধাতাও নেন না।'

বুড়ী আপন মনে বকতে বকতে চলে যায়।

ঘুনিয়া বিপদ সম্বন্ধে অচেতন নয়। কয়েক দিন পূর্বে সে নিজের চোখে দেখেছে, তাতে তাকে জানতে না হলেও মনে প্রাণে বুঝ করে নেছে। সে বিপদকে দেখেও দেখছে না। মনে ভাবে যে বিপদ ঘটেছে তার চেয়ে আর কি ঘটবে? মা বাপ ভাই বোন—সংসারের সমস্ত অবলম্বন পলকের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার নিজের বলতে আর কিছুই নেই। মৃত্যুর বিভীষিকা দূরে পলায়ন করেছে। মনে করে যে কোনও মুহূর্তে, যে কোনও অছিলায় মৃত্যু এলেই হলো। ধরণীর ধূলা চুম্বন করবার জন্যে সে সব সময়ে যেন প্রতীক্ষা করেই আছে। একবারে সে মরিয়া হয়ে গেছে।

সেদিন সে রক্ষা পেয়েছিলো কেমন করে তা সে নিজে স্মরণ করতে পারে না। সে যে অন্য সকলের পথ অনুসরণ করতে পারে নি, তার কারণ উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চৈতন্য হারিয়েছিলো। এবং মৃত ও জীবন্মৃতের মধ্যে তারা সেই ক্ষুদ্র পার্থক্যটুকু ধরতে পারে নি কেবলমাত্র তাদের নৃশংস উন্মত্ততায় মোহে। তারা যখন চলে গেল তাদের বীভৎস ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করে', তখন ঘুনিয়া ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করে দেখলো যে কতীর সেই মহাশ্মশানে কোন এক অজ্ঞাত দুর্ঘটনার ফলে সে-ই একমাত্র প্রাণী যে মৃত্যুর কঠোর ইস্পাত নির্মিত জালের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে উঠে দেখলো আর কারও দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। ঘুনিয়া কেমন যেন হয়ে গেল।

ঘুনিয়ার পিতা দিবসের মাছের ভাগে [illegible] করতো। অর্থাৎ শিবালয়ের বাজারে মাছ কিনে বাড়ী বাড়ী বিক্রী করতো। আর কখনও কখনও পুকুর জমা নিয়ে মাছ ধরিয়ে বিক্রী করতো। তার থেকেই তাদের সংসার [illegible] চলে যেতো। তাই তারা হরিজনদের কারবারীর কাজ করলেও তাদের ব্যবসা তাদেরই করতো। আজ সব বিচ্ছিন্ন। ঘুনিয়ার জন্যে এই সংসার সমুদ্রে কোনও দিকে কূল কিনারার চিহ্নমাত্র নেই।

পরদেশী প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখনও পায়ে জোর পায় নি। বল পেলেও একা বাইরে যাওয়া হয় ও বিপজ্জনক। সেজন্যও বোধ হয় সে সারাদিন বিছানায় শুয়েই কাটায়। ঘুনিয়া তার অবশিষ্ট চুকিতলি [illegible] কোনও রূপে মৃতদেহের সদ্গতি করছে। কিন্তু তাই বা কতদিন চলে? ঘুনিয়া ভাবে না—অর্থাৎ ভাবনা মনে এলেও সে-ভাবনা ঠেকিয়ে রাখে। সে ভাবে যে-কটাদিন কেটে যায়, তা-ই ভালো। পরদেশী চলে গেলে তার জীবন যে একেবারে আঁধারে ডুবে যাবে, করবার আর কিছু থাকবে না—তা-ই জেনে সে অত কিছু আর ভাবতে চায় না। এমনি অলসভাবে তার জীবনের চাকা ঘুরে চলেছিলো।

একদিন পরদেশী জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘুনিয়া, তোমার কে আছে?'

'সে আর থাকবে বলো? যা ছিল এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেছে।'

পরদেশী সহানুভূতির স্বরে বললে, 'ঘুনিয়া, দুনিয়াই এই রকম। তুমি আপশোষ ক'রো না।'

ঘুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপরে বললো, 'তোমার এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'না, কষ্ট কি? তোমারই জন্ত অসুবিধা করলাম, ঘুনিয়া।'

ঘুনিয়া চাল বাছতে বাছতে একবার চোখের কোণে শয্যার দিকে চেয়ে দেখ্‌লো। সে যেন একটু সহানুভূতির আভাসে গলে গেল। বললে, 'আমাদের আর কিছু নেই। একেবারে পথে বসিয়েছে। এখন ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় নেই।'

ঘরে চোখের আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। কান্না যেন আর বাধ মানতে চায় না। এতদিন যে [illegible] চেপে রেখেছিল—আজ অঝোরে নেমে এলো। আজ এই অজানা, অচেনা, অনিচ্ছার পাওয়া বন্ধুর একটুখানি কথায় চোখের জল ছুটলো।

ঘুনিয়া অনেকক্ষণ চোখে কাপড় দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদলো—'আমার বলতে ত্রিসংসারে কেউ নেই গো, কেউ নেই—'

পরদেশী বললো, 'দেখো ঘুনিয়া, তুমি আমায় একদিন বাঁচিয়েছ। আমি কখনও সে কথা ভুলবো না। ঘুনিয়া তোমার পরিত্যাগ করে, বিশ্বাস করো আমি তোমায় পরিত্যাগ করবো না। আমি প্রাণ দিয়ে তোমায় রক্ষা করবো।'

ঘুনিয়া মুখের কাপড় খুলে কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে দেখলো। বললে, 'তার মানে?'

[illegible] আর ভাবতে হবে না।'

[illegible] করে' বলো? তোমার মোকের কি ভাবনে?'

[illegible] ভাবনে? আমি তোমাকে যদি বিয়ে করি, কেউ সাত্ত্ব নেই যে কিছু বলে—'

[illegible]'

ঘুনিয়া কাঁথাটা ঘরের বাইরে গেল এবং অনেকক্ষণ পরে খাবার হাতে করে' ফিরে এলো।

খেতে খেতে পরদেশী বললে, 'কেমন রাঁধি আজ? এখন থেকে আমরা দুজনে এমন রাঁধতে পারবো যে, গভর্নমেন্ট শীঘ্র বীভৎসতা মন থেকে ঘুছে যাবে—'

'আচ্ছা, সে হবেখন। তুমি এখন বেরে নাও। আর দুটি ভাত দি, ভাল দিয়ে খাও—'

পরদেশী বললে, ঘুনিয়া, তোমার মায়া কি চমৎকার!'

দুই দিন বেশ ঘুনিয়া তন্ময়ের সঙ্গে শয়ন করতো। শয়ন করতো—এই পর্যন্ত। ঘুম তাদের সঙ্গে তা সে-রাত্রিতে নয়। ঘুনিয়ার, ছদ্মবেশে, কেঁদে কেটে তার শরীর একান্ত অবশ। কখন্ দিয়ে ঘুমের মধ্যে তার [illegible] ঘটে। আগে যেমন ঘুনিয়াকে ঘরে সে তার যৌবন ঘুমাতে চেষ্টা করতো—এখন কেবলই তার মনে হয়, সে ঘুনিয়ার সঙ্গ সে সহ্য করতে পারছে না। ঘুনিয়াকে কোনও কাজের ভার

দিয়ে বা বাজার হাট করতে বললে বলে, 'আমি অত পেরে উঠি নে বাছা। তুই নিজে গিয়ে সব কর্ গে। এখন তাড়াতে ঘুরে উঠেছিস্, নিজে কাজ নিজে বুঝে সুঝে কর্ গে। আমি বুড়ো মানুষ—আমি অত হিসেব কিতেব বুঝি নে। তোর সোয়ামী যাবে, সে যখন যে-ই দুকুমটা দিবে সে-ই দুকুমটা জিনিষ এক পয়সায় থেকে আধ্ পয়সা দেবে।'

'সে মাসী তোর আজ অত ব্যাখ্যানার কাজ নেই। আমার ওপর রাগ করিস নে।'

'না মাসী, রাগ করে আর কি করবো? বেকপাল করে এসেছি—রাগ আর কার ওপর করবো! একটা ভাঁড়ো ছিল, তাও বিধাতায় সইলো না।' বুড়ী মুখ পিছে মুখ পিছে কেঁদে উঠ্লো।

ঘুনিয়া ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো. একটু সামলে নিয়ে বুড়ী বাজারে চলে গেল। বলে গেল, 'ঘুনিয়া, মাসী, যা-ই করিস্, ঘরে দুয়োর করিস্, ও-ঘর জলে পড়বি—মাল-মাত্তি না হোক্—'

ঘুনিয়া ঘরে যায়, বেশীক্ষণ থাকে না। পরদেশী তার অন্বেষণ করে, অকারণ খুঁৎ খুঁৎ করে, অথচ কি বলতে চায়, তাও প্রকাশ করে' বলতে পারে না। তার চক্ষু দুটি ঘুনিয়ার চক্ষুর অনুসরণ করে—জোড়া ওষ্ঠে তাতে কত কামনা, কত রহস্যময় জিজ্ঞাসা।

পরদেশী যুবক, বলিষ্ঠ, উগ্র। তার অনুভূতি-প্রবণতা কেটে গেছে। ঘুনিয়ার সেবা সে এখন যৌবনের অক্ষুণ্ণ অধিকারে গ্রহণ করেছে। আগে নীলাম্বরের সমস্তটা ঘরখানির উপকরণের যে মূর্তি দেখে প্রভাত তার মন দমিয়ে পড়েছিল, এখন পরিপূর্ণ জীবনের তেজোদীপ্ত আলোকে সে মূর্তি ঘুরে নিশিয়ে গিয়েছে। এখন তার মূর্তি লালসা জাগিয়ে তুলছে—এখন ঘুনিয়া অসহায়া যুবতী, যুবকের লালসা তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধবার জন্য অনেই এগিয়ে আসছে। ঘুনিয়া, চলে যেও না; শোনো কথা আছে—'

ঘুনিয়া ফিরে আসে, বলে, 'আমার এখন কাজ অবসর নেই; কি কথা বলবে, চট্ করে' বলো—'

'ঘুনিয়া' তুমি আর এখন আমার সঙ্গে আমার মতন ব্যবহার করছো না। কেন, আমি কি করেছি?'

'কিছুই ত করনি। এখন আর তোমাকে দেখবারও তেমন দরকার নেই, তাই নিজের কাজে মন দিয়েছি। কি বলবে বলো—'

'আমি এইবার বিদায় নিতে চাই—'

অন্য দিকে চেয়ে ঘুনিয়া বললো, 'বেশ ত। যেতে চাও যাবেই ত?'

'না, সে কথা বলবার জন্যেই তোমাকে ডাকি নি। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আমি তোমাকে রীতিমত পায় পরে বিয়ে করবো—'

'ওমা, সেকি তোমার বাড়ীওয়ালা—'

'তাতে কি যেবনে, তাদের আমরা ত্যাগ করি—'

'না, সেকি রকের বাঁধন এখনও ঘুরে ঘুরে যেতে চায়—'

যুবকের চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। সে বললে, 'ভালো কথা বলছি, না শুনলে আমি আর কি করতে পারি? তোমার নসীব!'

'না ভদ্রলোক, আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই। যে কদিন বেঁচে থাকবো—'

তীক্ষ্ণস্বরে বাধা দিয়ে যুবক বললে, 'বাঁচতে আর পারলে কৈ? আমিও বাঁচবার জন্যেই চেষ্টা করেছি। একদিন প্রাণ দিয়েছিলে, তাই জন্যে আমার এত অনুনয়। তুমি যদি না শোনো, তোমার নসীব।'

যুবকের আলখাল্লার ভিতর থেকে একখানা ছোরার অগ্রভাগ দেখা গেল।

ঝুনিয়ার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমের স্রোত নেবে গেল। সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো, 'ছোরা এলো কোত্থেকে?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললে, 'ছিল।'

'না তো। থাকলে আমি দেখতে পেতাম না।'

'সে থাকুগে। এখন দেখতে পেলে? বলো কি করতে চাও?'

'যদি কথা না শুনি, তবে ঐখানা আমার বুকে বসিয়ে দেবে ত?'

'সেই রকমই হুকুম!'

'কার হুকুম?'

'সে কথায় কাজ কি? এখন তুমি ঠিক কোরে ফেলো—'

ঝুনিয়া ভাবতে লাগলো। তার মনে পড়লো কলুর কথা—'হাসো, জল-ই জলে গিয়ে পড়বি।' কিন্তু সে কি ইচ্ছা করে' জলে ঝাঁপ দিয়েছিল—তাই ঝুনিয়া। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কলকাতার ভেলী প্যাসেঞ্জার ছেড়ে ট্রেণ শুধু শুধু পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ক্রমেই ট্রেণের শব্দ কাছে আসছে।

[illegible] ঝুনিয়া [illegible] ট্রেণ আসছে—একবার ভেবে আসি।'

[illegible] যাও!'

[illegible] আসছি—একবার ভেবে আসি।'

ঝুনিয়া ঘোরের মধ্যে হরিণীর মতো ছুটলো। সে ছুটতে ছুটতে ট্রেণের দিকে যেতে লাগলো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে; ট্রেণ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তার সম্মুখের বড়ো গোল আলো বহুদূর আলো করেছে। ঝুনিয়া সেই আলো লক্ষ্য করে' ছুটেছিল লাইনের ধার দিয়ে দিয়ে। ট্রেণের আলো চারিদিকের অন্ধকারকে নিবিড় করে তুলেছিল। আর তার মাঝে একমাত্র লক্ষ্যস্থল ঐ আলো। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আর সব যেন মুছে অদৃশ্য হয়ে গেছে—রইলো শুধু ঐ তীব্র নির্মম, ভয়ানক আলো। ঝুনিয়া কি আলোর দিকে চাইতে চাইতে ট্রেণের বড়ো কাছে গিয়ে পড়েছিল। তার হৃৎপিণ্ডের দুপ করে' শব্দ অন্যভাবেই চলে গেল।

সেদিনও ঝুনিয়া। কলুর ঝুনিয়াকে ছুটে যেতে দেখে তার সঙ্গে [illegible] এসেছিল। তারপর —তারপর ঐ পলায়মান ট্রেণের লক্ষ্যচ্যুত লক্ষ্য করে যে ছোরা [illegible] করলে—কার উদ্দেশে সে ছোরা?

শাস্তিতন্ত্র

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

স্বাধীন রাজ্য রত্নকোট। আয়তনে ক্ষুদ্র হ'লেও, পরাক্রমে কিন্তু সামান্য নয়।

রাজা চন্দ্রকেতন রাজশক্তির প্রবলতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, একমাত্র সেই রাজশক্তিই প্রজার কল্যাণ বিধান করতে পারে, প্রয়োজন হ'লে যা প্রজার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে অবলীলায় সহিত করতে সক্ষম।

সেই জন্য চন্দ্রকেতনের রাজ্য পরিচালনা ক্ষমার মহিমায় ততটা মহিমান্বিত নয়, যতটা কিন্তু শাসনের গৌরবে গৌরবান্বিত। ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এমন অনুযোগ প্রমাণের জন্যে অনেকেই হয়ত' করতে পারে; কিন্তু বিচার থেকে হয়েছে, এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

এ-হেন সত্তা এবং সকল ভিত্তির উপর স্থাপিত যে রাজপদ, তাও একদিন কেঁপে উঠল প্রতিক্রিয়া শক্তির তাড়নায়। নিম্নোল্লিখিত ঘটনাবলীর যে উগ্র পরাক্রম সম্রাটের সাম্রাজ্য থেকে অধিকারের অধিকারি পর্যন্ত ধ্বংস করবার কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার একটা আভাস-ইঙ্গিত যেদিন রাজ্যের বিপ্লবী দলের অধিনায়ক উগ্রসেন রাজসমীপে উপস্থিত হ'য়ে চন্দ্রকেতনকে অভিবাদন ক'রে বলল, "মহারাজ, তলায় প'ড়ে থাকলে আপনার চলবে না। শিখরে উঠে আসতে হবে আপনাকে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চন্দ্রকেতন বললেন, "আরও স্পষ্ট ক'রে বল উগ্রসেন। তলা কাকে বলছ, আর শিখরই বা কোথায়, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

উগ্রসেন বলল, "তলা বলছি আপনার রাজসিংহাসনকে, আর যে সমতল ভূমির ওপর জনসাধারণের অবস্থিতি, তাকে বলছি শিখর।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে চন্দ্রকেতন বললেন, "রাজসিংহাসন ত্যাগ ক'রে আমি যদি জনসাধারণের সমতল ভূমির ওপর আরোহণ করি, তা হ'লে প্রজাদের মঙ্গল হবে ব'লে কি তোমরা বিশ্বাস কর?"

উগ্রসেন। নিশ্চয়ই করি মহারাজ। প্রজার ইষ্ট সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য; আপনার অনিষ্ট সাধন নয়।

চন্দ্রকেতন। কিন্তু তোমাদের মনে করার ছন্দের সঙ্গে আমার মনে করার ছন্দ যদি না মেলে, তখন?

উগ্রসেন। তা হ'লে রত্নকোটে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে, তা ঠিক তেমনি আরও হ'য়ে উঠবে, যেমন হ'য়ে উঠেছে আপনার কুটিল ঔদাসিন্যের রাজ্যে। কি পরিমাণ রক্তস্রোত সন্ধানে প্রবাহিত হচ্ছে, তা জানতে ত' আপনার বাকি নেই?

চন্দ্রকেতন। না, নেই। কিন্তু আমার যা অনুগত সৈন্য-সামন্ত আছে, তার সাহায্যে আমি আমার মাথা রক্ষা করতে একটি ক'রে শান্তি স্থাপন করতে পারি। কিন্তু শান্তি হবে শ্মশানের শান্তি। আমি তা চাই নে। কেন জান?

উগ্রসেন। বোধ হয় একমাত্র প্রজাকুলের মঙ্গলই মহারাজ কামনা করেন, তাই।

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে চন্দ্রকেতন বললেন, "না, না, এ তুমি ভুল বুঝছ উগ্রসেন। সে বাসনা সত্যসত্যই যদি তোমাদের থাকত, তা হ'লে তোমাদের এ বিদ্রোহের কোনো অর্থই থাকত না। আমি কি চাই জান? আমি চাই, তোমাদের দেবতারা যে অন্ধশক্তি সহসা জাগ্রত হ'য়ে বিশ্বময় সংহার-লীলা লাগিয়েছে, তার প্রতি সুবিচার করতে। অর্থাৎ, মানবসমাজের কল্যাণ-কামনার পক্ষে যে শক্তি পরে অনুমানিদ্ধিত রাজশক্তি অপেক্ষা মহত্তর, তা সত্য প্রতিপন্ন করবার তাকে একটা সুযোগ দিতে। সেই জন্যে আমি স্থির করেছি, বিনা রক্তপাতেই রাজসিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে যাব—হবে অমরাবতীর সমতল ভূমিতে নয়, অন্ধ সাধারণের অরণ্য ভূমিতে। শাস্ত্রে পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবার উপদেশ আছে। সুতরাং আমি যদি রতন-কোটের সীমানা অতিক্রম ক'রে পঞ্চবটির বনে গিয়ে আড্ডা গাড়ি, তা'তে আর কেউ আপত্তি করুক, না করুক, শাস্ত্র করতে পারবে না।" ব'লে চন্দ্রকেতন হাসতে লাগলেন।

এত সহজে অতীষ্ট লাভ হ'ল, এত সহজে মহারাজ চন্দ্রকেতন তাঁর পরাক্রান্ত রাজশাসন পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন দেখে একটা অনির্দেশ্য বেদনায় উগ্রসেনের হৃদয়ও বিগলিত হ'ল। ঈষৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে সে বললে, "আমরা আপত্তি করব। শাস্ত্রের বাক্য মানুষ না আমরা। কেন মহারাজ? কেন আপনি রতন-কোটের সীমা অতিক্রম ক'রে বনে যাবেন? আমাদের আসুর স্বভাবসত্ত্বেও সাধিনায়করূপে আপনি আমাদের

চন্দ্রকেতন। [illegible] হয় না উগ্রসেন: নিশ্চিন্ত মাথায় [illegible] তোমাদের দেবতারা [illegible] তোমরা স্থির করেছ, তাকে একেবারে [illegible] কারণ, যে বন্ধুক বন্ধুকও রইল না, লাঠিও রো'ল না। ছিন্ন পাঁচেকের মধ্যে তোমাদের [illegible] ক'রে আমি চ'লে যাব। যাবার আগে কিন্তু তোমাকে একটা কথা ব'লে যেতে চাই।"

উগ্রসেন। আদেশ করুন।

চন্দ্রকেতন। রাজত্বের অভ্যেটি ক্রিয়া ক'রে তোমরা একদিন চাইবে আবার গণতন্ত্রই চালাও, দেশ-শাসন তোমাদের করতেই হবে। দেশ-শাসন করতে গিয়ে বরং লিপ্ত হ'য়ো, কিন্তু ছাগল হ'য়ো না উগ্রসেন। তন্ত্র যদি নেতে চাও, তা হ'লে সজ্ঞ হ'য়ো। জীবন-যুদ্ধে নীতি যে তুলই কর না কেন, শক্তিকে কখনো অবজ্ঞা কোরো না। শক্তি আমাদের রক্ষা করে, ধ্বংস করে না। বুঝলে?

উগ্রসেন। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।

চন্দ্রকেতন। রাজত্বের আসনে আজ যে সব চিত্রিত সিংহ [illegible] কালে উঠে প'ড়ে দেখবে, গণতন্ত্রের আসনে তাদের সকলেই মৃত্তিকাকুমারে পরিণত হবে না, অনেকেই নিজের সিংহ থাকবে—এ বিশ্বাস

ফেলো। হুঁশিয়ার সাবধান। আমার সৈন্য সামন্ত রইল; মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি রইল; অস্ত্রাগার, কোষাগার রইল—সজ্ঞ হ'য়ে দেশ-শাসন কোরো। আচ্ছা, এখন এস। জয় হিন্দ!

"জয় হিন্দ! জয় মহারাজ চন্দ্রকেতনের জয়!" ব'লে নত হ'য়ে তিনবার অভিবাদন ক'রে উগ্রসেন প্রস্থান করলে।

তৃতীয় দিবসে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সহ মহারাজ চন্দ্রকেতন রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করলেন। পঞ্চপুরির অরণ্য প্রদেশে, অথবা আর কোন্ স্থানে তিনি গেলেন, সে কথা অজ্ঞাত। কিন্তু সেখানেই যান, রত্নকোটের চতুঃসীমার মধ্যে কোথাও নয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

অবিলম্বে রচিত হ'ল নির্বাচন পদ্ধতির একটা খসড়া। তদনুযায়ী কয়েকজন মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর সেই মন্ত্রী-সংঘ উগ্রসেনকে গণরাষ্ট্রের অধিনায়ক-রূপে নির্বাচিত করলে।

যে আদর্শ সম্মুখে স্থাপিত ক'রে রত্নকোটের বিপ্লবী দল চন্দ্রকেতনের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, অবিলম্বে সেই আদর্শকে বাস্তবতায় রূপায়িত করবার পরিপূর্ণ আশ্বাস দিয়ে নবনির্বাচিত মন্ত্রী-সংঘ সহ অধিনায়ক উগ্রসেন দেশ-পরিচালনার কার্যে আত্মনিয়োগ করলে। গণরাষ্ট্রের সাধারণ সভায় সে বললে, "আমরা চন্দ্রকেতনের ইস্পাতের রাজতন্ত্র ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু ভেঙে দেওয়ার কোনো সার্থকই থাকে না, যদি-না ভেঙে দেওয়ার অব্যবহিত পিছনে গ'ড়ে তোলবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প বর্তমান থাকে। কণমাত্র বিলম্ব না ক'রে আজ থেকেই আমরা দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ ক'রে আমাদের দেশকে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী গ'ড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হব।"

কিন্তু গঠন-কার্যে প্রবৃত্ত হবার এবং অগ্রসর হবার জন্য যে সহজ শান্ত আবহাওয়ার প্রয়োজন—সেটা যেন তার অস্তিত্ব ঠিক নেই। গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার মুখে সঙ্গে যে-সকল অসন্তোষ এবং অশান্তি আপনা আপনি অন্তর্হিত হবে ব'লে মনে করা গিয়েছিল, তার অস্তিত্বের রেখা মাত্র না থাকলেও, সময়ে সময়ে তার ঘুমন্ত ফণী আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। বহুদিন ধ'রে অনাহারে ধ'রে-ধ'রে অনাহারে থাকার যে দুঃখপনের অভ্যাস জাতির অস্থি-মজ্জার মধ্যে শিকড় গেড়েছিল, তা থেকে মুক্তিলাভ করা কোনো রোগীর পক্ষেই কঠিন হ'ল। যে লাঠি এতদিন শত্রুর পিঠ ভেঙে এসেছে, শত্রু পেছনে পিঠ ভাঙা অভ্যাস তার যেন যায় না।

গঠন-কার্যের উদ্বোধনায় উগ্রসেন এতদিন যেন নীরবের কথা ভুলে ছিল। মনে পড়লো মহারাজা চন্দ্রকেতনের সাবধান-বাণী,—যৌবনমুগ্ধ রাজা যে ভুলেই যান না কেন, শক্তিকে কখনো অবজ্ঞা কোরো না। শক্তি আত্মরক্ষার রক্ষা করে, শাসন করে না। সজ্ঞ হ'য়ে দেশ-শাসন কোরো।

কি ভাবতে ভাবতে উগ্রসেন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করলে। দেখলে অস্ত্র সকল সযত্নরক্ষিত। তার সঙ্গে মন্ত্রণা যাদ মোটামুটি মিলিয়ে নেবে মনে হ'ল, বহু অস্ত্রের যেন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—বহুদিন ব্যবহৃত হয়েছে।

সৈন্যাবাসে উপস্থিত হ'য়ে উগ্রসেন দেখলে, সৈনিকেরা অলস জীবন-যাপন করছে; নিয়মিত কুচ-কাওয়াজ, এমন কি তন-বৈঠকও করে না। অস্ত্রচালনায় পরিত্যাগ ক'রে অনেকে দলকর্মে মনোনিবেশ করেছে।

মহারাজ চন্দ্রকেতনের প্রধান সেনাপতি ছিল পঙ্কজনাথ। ত্রিশ বৎসর বয়সের দুর্ধর্ষ যুবাপুরুষ; বীর বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে সিংহের পরাক্রম। বয়সে নবীন, কিন্তু সাহসে এবং রণপ্রতিভায় প্রধানতম সৈন্যাধ্যক্ষকে সবাই মানায়।

পঙ্কজনাথের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে উগ্রসেন দেখলে, পঙ্কজনাথ ছবি আঁকছে। বিস্মিত হ'য়ে বললে, "একি পঙ্কজনাথ। ছবি আঁকছ তুমি?"

মৃদু হেসে পঙ্কজনাথ বললে, অস্ত্র মরচে পড়ছে, সৈনিকেরা জীবন চর্যা আরম্ভ করেছে—এ অবস্থায় আমি যদি ছবি আঁকার মন দিই, তাহলে বিস্মিত হবার কি আছে, উগ্রসেন? 'নেই কাজ ত' খই ভাজ' বলে একটা কথাও ত' আছে।"

উগ্রসেন। কিন্তু কাজ তুমি কেন করছ না? কাজ করতে মানা করেছি তোমাকে?

পঙ্কজনাথ। না, মানা কর নি, কিন্তু করতেও বল নি। অনকরায়কে জান? অগ্রণী সঙ্ঘের অনকরায়?

উগ্রসেন। জানি।

পঙ্কজনাথ। অনকরায় আমাকে কাজ করতে বলেছে।

[illegible] উগ্রসেন বলে, [illegible] কাজ করতে বলছে? তাদের পক্ষে?"

[illegible] কথা বলছে। তাদের [illegible] বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহ

[illegible] পঙ্কজনাথের মুখে দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠল, বললে, "মহারাজ চন্দ্রকেতনের বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহ করতে পার, আর আমি তোমার বিরুদ্ধে করলেই অপরাধ হবে? বিদ্রোহ করবার অধিকার তোমারই কি একচেটে উগ্রসেন? কিন্তু ভয় নেই তোমার, অগ্রণী সঙ্ঘে যোগ দেবার হ'লে আমি বসে এমন ক'রে ছবি আঁকতাম না, এ সময়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে আর সৈন্য গঠনে ব্যস্ত থাকতাম।" একটু মুহূর্ত মনে মনে কি ভেবে নিয়ে, বললে, "তোমাদের রাজশাসনের পরিচালনার উদ্যোগ আর সাহায্য দেবার জন্যে আমার প্রতি আদেশ আছে মহারাজ চন্দ্রকেতনের। তুমি সঙ্ঘে যোগ দেবে না শুধু অনকরায়ের বিরুদ্ধেই তোমাকে প্রস্তুত হতে বলছি। অনকরায় ত' তোমাদেরই পুরীতলের অধিবাসী। তার সঙ্গে [illegible] ছবি আঁকা। কিন্তু ভুলো না, তোমাদের রাজশাসনের গোলযোগের প্রধান [illegible] হয়ে দেখা দিয়েছে অনকরায় আর তার বহিশিখা। ওকে হাতে পেলে দুই বছরের জন্যে [illegible] পঙ্কজনাথ পিছিয়ে যাবেন—এ নিশ্চয় জেনো। অতএব তৎপর হও।"

উগ্রসেন। তুমিও তৎপর হও শঙ্করনাথ।

"কি লাভ হবে রৈবতের তৎপর হ'লে, যদি-না তার হাতে উপযুক্ত অস্ত্রের যোগান থাকে?" ব'লে শঙ্করনাথ হাসতে লাগল।

উগ্রসেন। কি চাও তুমি?

শঙ্করনাথ। পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার, আর বৈজ্ঞানিক শক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ নূতন অস্ত্র। কেবলমাত্র প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষের শক্তিকে পরাস্ত করা যাবে না।

উগ্রসেন। সে নূতন অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে?

শঙ্করনাথ। তার পরিচয়ও আমি গ্রন্থে দিয়ে রেখেছি—উপযুক্ত অর্থের অভাব না হ'লে আমাদের রাজ-কারখানাতেই তৈরি হ'তে পারবে।

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে উগ্রসেন বললে, "আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি সৈন্য-সংগঠনে তৎপর হও।"

(৩)

অবিলম্বে উগ্রসেন সংসদের জরুরি অধিবেশন আহ্বান করলে। নূতন অস্ত্র প্রবর্তনের সমীচীনতা সম্বন্ধে উগ্রসেনের বক্তব্য শোনার পর মন্ত্রী-সংসদ একবাক্যে সর্বাধিনায়কতার অস্ত্র নির্মাণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করল।

কিন্তু রুখে দাঁড়াল জনকল্যাণের দল। তারা বললে, এই নূতন অস্ত্র প্রবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সকল লোক অথবা দলকে দাবিয়ে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া, উগ্রসেন-মন্ত্রী-সংসদের দমিত যারা সব বিষয়ে চোখের বদলে চোখ মিলিয়ে দেখতে পারে না। গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরও যদি মন্ত্রীদিগকে এমন সাম্রাজ্যিকভাবে দৃষ্টির [illegible] হ'ল তা হ'লে কি অপরাধ করেছিল নরহত্যা চরমোৎকর্ষের রাজতন্ত্র? সুতরাং সারাদেশব্যাপী আন্দোলনের দ্বারা উগ্রসেন-মন্ত্রী-সংসদের এই দুরভিসন্ধি প্রসূত প্রস্তাবকে নাকচ করতে হবে।

শুধু সংসদে নয়, সভায় সভায় উগ্রসেন নূতন অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগল। সে বারংবার এই আশ্বাস দিয়ে বলল, যারা রাজনৈতিক গণরাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের প্রতি অকারণে এবং অযথা বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে যারা রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হবে না, মন্ত্রী-সংসদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কখনই বিপরীত হবে না কেন, মুহূর্তের জন্যও নূতন অস্ত্র তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবে না। স্বাধীনতা পাওয়া কঠিন, কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও কঠিনতর। এই মহান স্বাধীনতার প্রতি হিংসে যারা তাকিয়ে আছে তাদের বিদ্বেষবিষদগ্ধের চক্ষুশূলবার মতো নয়; তারা বহিঃশত্রু। তাদের জন্য এই নূতন অস্ত্রের প্রয়োজন।

জনকল্যাণের দলের নায়ক ধ্রুবসিংহ বললে, যারা কখনও তাদের এমন কোন্ বৈর আচরণের প্রমাণ পেয়েছে, তারাই এই নূতন অস্ত্রের ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে।

উগ্রসেন বললে, এ সূত্রের কথা রাষ্ট্রের গোপন বিভাগের কথা, খুলে বলা চলে না।

জনকরায় বললে, কিন্তু ভুলে যেয়ো না, রাজতন্ত্র আর বহাল নেই, এখন গণতন্ত্র চলছে; সকলেরই এখন সব বিষয়ে সমান অধিকার।

মৃদু হেসে উগ্রসেন বললে, এ কথার উত্তর মুলতবি রইল। ভবিষ্যতে যেদিন জনকরায় গোপন বিভাগের মন্ত্রী হবে, সে দিন সে নিজের কাছ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর পাবে।

ক্রুদ্ধ হ'য়ে জনকরায়ের একজন সহকারী বললে, বহিঃশত্রুর নাম ক'রে যে সর্বনাশা অস্ত্র তোমরা নির্মাণ করতে চলেছ, সে অস্ত্র যে একদিন আমাদেরই সর্বনাশ করবে না, তা কে বলছে?

উগ্রসেন বললে, ডাকাত ঠেকাবার জন্যে গৃহস্থ বাড়ীতে বন্দুক থাকে, তা দিয়েও ত' সময় পরিজনদের হত্যা ক'রে গৃহকর্তা একদিন সর্বনাশ করতে পারে বলেই ব'লে তাদের বন্দুক রাখা বন্ধ করতে হবে না কি? অপপ্রয়োগের কথা ভেবে সুপ্রয়োগের পথ বন্ধ করতে গেলে কলম-কাটা ছুরিটি পর্যন্ত ঘরে রাখা চলবে না। একটা ঘুমন্ত মানুষকে ছুরি দিয়ে অনায়াসে হত্যা করা যায় তা মানো ত? হাঁ যদি মানো, তা হ'লে আমাদের সমস্যার একমাত্র মীমাংসা হচ্ছে নূতন অস্ত্র।

(৪

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনো মীমাংসা অথবা নিষ্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রশ্ন এবং উত্তর, তর্ক এবং বিতর্ক, কলহ এবং বিবাদের মধ্য দিয়ে যে অগ্নি প্রতিদিন ঘনীভূত হচ্ছিল, প্রদীপ্ত শিখায় তা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল যেদিন রাজ-অস্ত্রকারখানায় শোনা গেল নূতন অস্ত্র নির্মাণের প্রথম লৌহাঘাতের শব্দ।

[illegible] জনকরায়ের ছায়া বিদ্রোহীর দল হানা দিলে এসে অস্ত্র-কারখানায়। [illegible] ছিল [illegible] যে [illegible] দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রবল চাপের বেগ সহ্য [illegible] কপালের জন্য বন্দুকের বিয়ারিং তৈরীর ভেঙে পড়ল। তখন মরিয়া হ'য়ে মারিবের দল বলপূর্বক কারখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার জন্য রক্তপিপাসু; ভিতরের দলও প্রাণপণ শক্তিতে তাদের বাধা দিতে লাগলো।

উগ্রসেন এবং শঙ্করনাথ উভয়েই কারখানার মধ্যে উপস্থিত ছিল। চিন্তিত হ'য়ে উগ্রসেন বললে, "কি করা যায় শঙ্করনাথ?"

শঙ্করনাথ বললে, "হুকুম দাও, পিণ্ডের সারের বন্দুকগুলো [illegible] নিয়ে যাই।"

উগ্রসেন। প্রাণে মারবে?

শঙ্করনাথ। মারতে হ'লে প্রাণে মারাই উচিত।...কি বল?... হুকুম দিলে?

মুহূর্তকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে উগ্রসেন বললে, "আচ্ছা, তবে যেতে পারো। আর অপেক্ষা নয়।"

মৃদু হেসে শঙ্করনাথ বললে, "অসুরের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, তবে থাক। আচ্ছা, আমি চললাম।"

উগ্রসেন। কোথায়?

শঙ্করনাথ। ছবিটা শেষ করতে। এবার যদি আমার উপর কোনো হুকুম চাপাতে চাও তা'হলে যাও সঙ্গে মহারাজা চন্দ্রকেতনের সম্মতি লিখিয়ে এনো।

চকিত হ'য়ে উগ্রসেন জিজ্ঞাসা করলে, কেন? এবার থেকে চন্দ্রকেতনের অনুগত হ'য়ে তুমি চলবে না কি?"

স্মিতমুখে শঙ্করনাথ বললে, "এবার থেকে [illegible]" ব'লে প্রস্থান করলে।

কারখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে অনেক [illegible] কারখানা এবং উৎসবের মুখোসির কতক কতক আগ জেগে চুরে দিয়ে সে দিনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু পরদিন থেকে অজস্রনীর রক্তস্রোত এবং অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ এমন করাল মূর্তি ধারণ ক'রে অগ্রসর হ'ল যে, দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে রত্নকোট শ্মশানসার হ'য়ে উঠল। পথে লোক চলে না, মন্দিরে আলো জ্বলে না, রোগী ঔষধ পায় না, মৃতের সৎকার হয় না, এমন কি, পুত্রহারা জননী শোকানুভবও করে না। বাণাহত অজগর সর্পের ন্যায় একটা নিষ্ফল নির্জীব দেহ নিয়ে রত্নকোট অসহ্য বেদনায় কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে।

সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

অনকরায়ের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে উগ্রসেন বললে, "সংবাদ অবশ্যই শুনেছ অনকরায়? বিশ্বাস যাকে না করবার ছল করেছিলে, সেই বহিঃশত্রু পশ্চিম সীমান্ত ভেদ ক'রে রত্নকোটের চার পাঁচখানা গ্রাম অধিকার করেছে।"

এ দুঃসংবাদ অনকরায়ের অজানা ছিল না। চিন্তান্বিত মুখে অনেকক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, "কি ব্যবস্থা করেছ?"

উগ্রসেন। যারা যেবার জন্যে কিছু বল পাঠিয়েছি, কিন্তু তাদের যা শক্তি-সামর্থ্য তা'তে দিন তিনেকের মধ্যে রাজধানী আক্রমণ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অনকরায়। সৈন্য সংগ্রহ করছ?

উগ্রসেন। কোথা থেকে করব?—অগ্নিসংযোগ থেকে?

অনকরায়। শঙ্করনাথ কি করছে?

উগ্রসেন। ছবি আঁকছে।

অনকরায়। তুমি কি করবে?

উগ্রসেন। আত্মসমর্পণ করব। পাঁচ ক্রোশ দূরে পঞ্চমুনির অরণ্যে মহারাজা চন্দ্রকেতন [illegible] রয়েছেন। স্থির করেছি আজ রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রে বিচার প্রার্থনা করব। সেখান থেকে

[illegible] এখন অবশ্যি মহারাজাকে প্রণাম জানিয়ে দাঁড়ানো হয়। যদি পার, মহারাজাকে অগ্রাহ্য ক'রে তুমি কাজে লাগিয়ে এবং জোরে।

[illegible]। [illegible], সে-প্রসঙ্গ করা যাবে। কিন্তু বিচার প্রার্থনা করতে তুমি কোন্ অধিকারে?

[illegible]। পক্ষিতের সঙ্গে মহারাজার উপস্থিত অবস্থায় ক'রে বিদ্রোহের প্রথম দিনেই পক্ষির [illegible] আঘাত করে তোমাদের অনুচর বিনাশ করি কি, সেই অপরাধে।

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করে অনঙ্গপাল জিজ্ঞাসা করলে, "পক্ষটি যাবে তুমি কিনেছ?"

উগ্রসেন। আজ্ঞে হাঁ।

অনঙ্গপাল। কত?

উগ্রসেন। একশো মোহরের মূল্যে।

একশো মোহরের মূল্যে কেনা পক্ষি উগ্রসেন এবং অনঙ্গপাল উভয়ের পাশাপাশি অশ্বারোহণে পক্ষটির দিকে চলেছে।

এক সময়ে মৌন ভঙ্গ ক'রে উগ্রসেন জিজ্ঞাসা করলে, "মহারাজার কাছে তুমি কথা প্রার্থনা করবে অনঙ্গপাল?"

অশ্বের বল্গা টেনে ধরে উগ্রসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনঙ্গপাল বললে, "তুমি চাইবে বিচার, আমি চাইব কথা প্রার্থনা—[illegible] ভুলে যেয়ো না উগ্রসেন।

ক্রান্তিপাত

অরুন্ধতী দেবসেন

সরকারি কাজে পশ্চিম পাঞ্জাবের এক শহরে ছিলুম। বেশ আরামেই ছিলুম। অনেকগুলি বাঙালী একজোট হয়ে সন্ধ্যের পর ক্লাবে [illegible] হইচই। খেলুড়ে না জোটা পর্যন্ত আমরা দেশের অবস্থা ও রাজনীতি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করতুম। সংখ্যায় অল্প হলে কি হবে, আমাদের মধ্যে মৃদু প্রধানেও কংগ্রেস-হিন্দুমহাসভা আর মুসলীম লীগের নীতি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে দলাদলি ও ঝোগাড়ও যথেষ্টই ছিল। কিন্তু খেলা সুরু হলেই আমরা সব একসঙ্গে মিশে যেতুম। এমন কি ক্লাব ইয়ুনিয়নের জোড়া কমিটিরই ঝেরাণীগুলি পর্যন্ত হয়ে উঠতো আমাদের কনফিডেন্ট। তখন আমাদের বাদ-প্রতিবাদ চলতো শুধু তাস, বড়ের ফুল চাল আর ব্রীজের ফাঁকা টাক নিয়ে।

দিন চলছিল ভালই। মাঝে মাঝে মোসলেম লীগের সঙ্গে পাঞ্জাবী হিন্দু ভ্যাষ শিখেদের সম্বন্ধে আমরা দূর থেকে বেশ উপভোগ করতুম। তখন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে এই অতি-ক্ষুদ্র লিঙ্গ একদিন দাবানল হয়ে উঠে পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবে খাণ্ডব দহন সুরু করে দেবে। তবে, এটা বুঝেছিলুম যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

পাকিস্থান আর অখণ্ড ভারতের আদর্শ নিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব পাঞ্জাবে যেমন প্রত্যক্ষ রূপ নিয়েছিল এমন বোধ করি আর কোথাও হয়নি। পাঞ্জাবের প্রায় তিনকোটী অধিবাসীর মধ্যে শিখেদের সংখ্যা মাত্র বাট লক্ষ। কিন্তু আয়তনে পাকী দুই বাদশাহের দুইই। কিন্তু রণজিৎ সিংহের জাতি ভাইয়েরা পাঞ্জাব মুলুকটা ভাগের বিনিময় সম্পত্তি হিসেবে আর কারুর সে মেজাজী-বাদশাহী থাকতে পারে এটা মানতে রাজি ছিলেন না।

আমরা ভিন্ন প্রদেশের লোক। ধর্মঘট, ভেদ ও দেওয়ালী মামলা নিয়ে মাথা ঘামাতে কখনো ইচ্ছে হলেও সাহস করতুম না। সেই দু'দুটো দল চলতো, ইয়া পাকীস্তান অথবা খুন খাবী লোক আর পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী তার উপর পাথরিয়া চশমা, কালাপানি, কলুষ, কুসংস্কার ভেবে ভয়ে একটা কাছেই ঘেঁসতুম না। তবে সিগারেট বিড়ি তামাক চাঁদা দু বেলা, কিন্তু মোদ্দা যোগাযোগ মধ্যে সেটা খুঁজিয়ে নেয়। নতুন মানুষের এক একটি তবু একটা সন্দেহ আমাদের মনে উঁকি মারতো যে এই লোকটা ঘাটোয়াল শিখের মধ্যে সত্যিই কই? সাহিত্য আর শিরোমণি আকালীদের মধ্যে তফাৎ বোঝা বিষয়, একদিন হয়তো তাদের সর্বনাশেরই কারণ হবে। শ্রীগুরুদ্বারাদের মধ্যে যেমন মিশ্রিত একতা + অন্য পক্ষে বলাগুলির বিরুদ্ধে এই শিখেদের শেষ পর্যন্ত রুখে দেবেই হবে।

না ভেবেছিলুম তাই। প্রকাশ্য দাঙ্গা বেধে গেল যখন দু'দলে—শিখেরা যোগ করলে। খুন জখম হত্যা লুটতরাজ অগ্নিদাহ আর নারীহরণ ও নারীধর্ষণ অবাধে চলতে শুরু হল। এই সময় ইংরেজ বেপরোয়া ভাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, কিন্তু কার হাতে তারা ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে যাবে? লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও রকম মীমাংসা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো, তখন পাকিস্তান স্বীকার করা ছাড়া উপায় রইল না। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের সর্তে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তান মেনে নিলে।

কংগ্রেস ভেবেছিল যে ভারতবর্ষ থেকে কুটচক্রী বিদেশী তৃতীয়পক্ষ বিদায় হলে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ মিটে যাবে। স্বাধীনতাবোধ ও জাতির উন্নতি [illegible] হয়ে উঠে উভয় সম্প্রদায় ভারতের, তথা পাকিস্তানের কল্যাণে একযোগে দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক হয় আর। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা হতে না হতে ম্যাডক্লিফের ভাগ-বাঁটোয়ারার রায় মেনে বিভক্ত পাঞ্জাবের কোন অংশই খুশী হতে পারলে না! দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো চারিদিকে: গর্জন মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দ। পালাও পালাও রব।

আশেপাশের অবস্থাটা যখন বিপজ্জনক হয়ে উঠলো তখন চোখ মেলে চেয়ে দেখি আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসছি। কিছুদিন থেকে গিন্নী বলেছিলেন বটে যে, চলো পালাই। চাকরির জন্য কি সেবটা সবাই মনে প্রাণে চায়? কথাটা কানে তুলিনি। মোটা মাইনের চাকরি। আর কয়েকটা বছর চোখকান বুজিয়ে কাটাতে পারলেই পুরো পেন্সন পাওয়া যাবে। তাছাড়া, এখন তো গভর্নমেন্ট আমাদেরই নিজের হল। সরকারি চাকুরে আমরা। আমাদের গায়ে হাত দেয় কে?

[illegible] একদিন মুখ থেকে এসে বললে তাদের [illegible] টাকার দিল্লী ভাড়ি কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। [illegible] কেউও যাচ্ছী হচ্ছেনি। তাদের [illegible] নিয়ে গেছে। আমাদের মুখ কালো সব

[illegible] এই গোলমালের মধ্যে বেরোনো ঠিক নয় বাওয়াই ভালো।

[illegible] অফিসের ছেলেরা তখনও 'স্বাধীন হয়ে সেবক সঙ্ঘ' তুলে দেয়নি! সারারাত গার্ড দিচ্ছে তারা সবাই। [illegible] আর হিন্দু ছেলেরা মিলে 'রক্ষীদল' গঠন করেছে। আমার ছেলে দুটোও তাদের হয়ে যোগ দিয়েছে।

যাক্, অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু, আমার স্ত্রী শুনে বললেন—যদি কুলী ওর মধ্যে না গেলে পাইছে। আমরা বিদেশী, স্থায়ী বাসিন্দা নই, আমাদের ওপর করা কেন?

সন্ধ্যের পর গফুর খাঁ এসে চুপি চুপি বলে গেল—বাবুজী, এখান থেকে আপনাদের চলে যাওয়াই ভালো—শুনছি দু'একদিনের মধ্যেই শহর লুট হবে।

গফুর খাঁ আমার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। একবার মস্তবড় একটা বিপদ থেকে আমি তাকে উদ্ধার করেছিলুম। সেই থেকে লোকটা আমার ভক্তী অনুরক্ত। ওরা, আর পাই লোক নিমকহারাম নয়। আমার ছেলে [illegible] খুব ভালবাসে। রথন তখন মুঠো মুঠো বেলা আর পেঁয়ারা এনে দিয়ে যায়। ওরা গফুরকে চাচাজী বলে। গফুর আবদুল এ অঞ্চলের একটা মাতব্বর লোক। লীগের সেক্রেটারী।

খবরটা কিন্তু স্ত্রীর কানে আর তুলি নি। চেপে গেছলুম। সন্ধ্যের পর ক্লাবে গিয়ে সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ করে যাহোক একটা কর্তব্য স্থির করা যাবে ভেবেছিলুম।

কিন্তু ক্লাবে আর যেতে হল না। সন্ধ্যের আগেই খবর পাওয়া গেল ওপাড়ায় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছে, ঘরবাড়ী দোকানপাট সবকিছু লুঠতরাজ চলছে। কালীবাড়ীটা ন্যাকি ওঁরা ভেঙে চুরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে!

বোসজা শুকনো মুখে এসে বললে—কাল বাঙালের গানবিল্ডিংএই যত্ত সবরে সপরিবারে পালিয়েছেন। এখন আমি কি করি? রিটির টিকিট কেটে [illegible] বসেছি, কিন্তু রাস্তায় একখানা টাঙ্গা নেই, একটা ঘুড়ি নেই। ষ্টেশন পর্যন্ত এই লাটবহর নিয়ে যাই কি করে?

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—সবাই কি [illegible]

বোসজা নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালে—সবাই।

চিন্তিত ভাবে বললুম—তাই তো! বাঙালীরা কেউ নেই?

বোসজা নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—একা আমি পড়ে আছি। টিকিট কেটেও যেতে পারছি নি!

মনে একটু ম্লান হাসলুম। আমিও যে পড়ে রয়েছি সে কথাটা বোসজার খেয়ালই নেই। নিজের সম্বন্ধেই শুধু সচেতন সে। বললুম—তুমি রফীদলকে গিয়ে ধরো। তারা হাতাহাতি করে তোমার মালপত্র জিনিসপত্র কিছু স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, আর তোমরা তাদের সঙ্গে ষ্টেশনের পথটুকু হেঁটে চলে যাও। এ ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না।

বোসজা একটু ভাবী চুকে বললে—'রফীদল' কি পালোয়ান-টেলে আমার সঙ্গে যাবে? তুমি দাদা হুজুরটির সিঙ্গে যাও না—মস্ত দোকান করেছে।

আমি বললুম—আমার কথা যদি রফী তো শুনবে না। তুমি বরং গিয়ে ওদের দলের কাপ্তেন গর্জন সিংকে বলোগে।

বোসজা মুখখানা বিকৃত করে বললে—বাপ রে, দাদা! আমি ও দুঁদে শিখসাদের কাছে সাহায্য চাইতে যাব না। ওদের উপর আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। ঘণ্টা একাদন বলেছিল—'শির দেউঙা মনর পেয় ওহি, দেউঙা' তারা যেদিন প্রাণভয়ে বেনাগেল জাহাজের হুকুমে রাস্তায় উপুড় হ'য়ে পড়ে বুকে হেঁটে চললো—সেদিন বুঝলুম ওরু গোবিন্দ সিংহের বীর শিখরা বেঁচে নেই। আছে ভীতকাপুরুষ ব্যবসাদার বেনে। বাইরের খোলসটা ও বদলায়নি। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ দুব।

আমি একটু হেসে বললুম—তোমার মত বীরপুরুষেরাও তো প্রাণভয়ে সব পলায়ন করছেন!

বোসজা রেগে উঠে বললে—আমরা এখানে পরদেশী। এদের দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে আইকে থেকে নির্বোধের মতো প্রাণ দিতে যাবো কেন? এখানে 'ফ পলায়তি স জীবতি'—এই বাক্যবাক্য মেনে চলাই শ্রেয়ঃ মনে করি।

আমি হেসে বললুম—নোঙ্গাখালির লঙ্কাকর ব্যাপারের পর ওকথা বলা কি আমাদের মুখে আর সাজে?

বোসদা আর কিছু না বলে সম্ভবতঃ তীর্থ চটে চলে গেল।

সে রাত্রে আমার ছেলে দুটো আর বাড়ী ফিরলো না। ভাবলুম ওদের 'নাইট্-ডিউটি' পড়েছে বোধ হয়।

রাত্রে থেকে থেকে খুব ভেতর চমকে উঠেছি। পশ্চিম দিক থেকে বহু কণ্ঠের উদ্যত চিৎকার আর হৈ-হল্লার আওয়াজ কানে এসেছে। বন্দুকের শব্দও মাঝে মাঝে শুনেছি। পশ্চিমের আকাশ আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠেছে দেখেছি।

স্ত্রী সেই যে না-খেয়ে পথের দিকে জানলায় বসে ছিলেন ছেলেদের ফেরার আশায়, সেই এক ভাবেই সারারাত কাটিয়েছেন। মেয়েটাও চুপটি করে [illegible] পাশে তার কেরেনি বলে।

ভোরে উঠেই 'রক্ষী শিবিরে' খবর নিতে গেলুম। কোনও চিহ্ন নেই শিবিরের! পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চৌধাঘাট দোকানপাট সবই দেখলুম ভেঙে তছ্‌নছ্ করে লুটে পুটে নিয়ে গেছে। রাস্তায় জনমানব নেই। বাজার বন্ধ। আগুন লাগানো অনেক বাড়ীতে বৈশাখনের ঝুরা তখনও শান্ত হয়নি। এখানে তো ধমকল নেই, আগুন ধরলে নেভানো শক্ত!

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গফুরের সন্ধানে গেলুম।

আমাকে দেখেই যে চমকে উঠ্‌লো। বাবুজী! আপনি এখানে এলেন কেন? কোন্ জলায় ছেলেরা? পালান—এখনি পালান। কেউ দেখতে পেলে আপনাকে আর বাঁচাতে পারবো না।

[illegible]—ছেলেরা যে কেউ ফেরেনি গফুর। কাল রাত্রে ওদের মা—

[illegible] আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়াবেন না। এইমাত্র [illegible] অনেকগুলো লোক জখম হয়েছে। আমি ছেলেদের খবর নিয়ে [illegible] ওরা। আপনি বাড়ীর ভেতরে যান।

গফুর একরকম জোর করেই তার বাড়ী থেকে আমাকে ঠেলে বিদায় করে দিলে।

বাড়ী ফিরে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই হন্তদন্ত হয়ে গফুর এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—গাড়ী এনেছি বাবু—সঙ্গে নেবার যা না নিলেই নয় তাই নিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ুন—আমি নেমে এলুম—এ পাড়ায় যে কোন্ সময় হল্লা আসছে। আর এক মিনিট আপনি দেরী করবেন না।

ছুটে গেলুম বাড়ীর মধ্যে। স্ত্রী চুলুকে কেঁদে উঠলেন—বাবারা যদি কাল এখনও ফেরেনি তো। তাদের ফেলে আমি একপাও নড়বোনা কোথাও।

গফুর শুনতে পেয়ে বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বললে—তাদেরকেই আমি নিতে যাচ্ছি মা। আপনি বেরিয়ে পড়ুন [illegible]। মেয়েটার ইজ্জৎ—আপনার সম্মান—আমার [illegible] বাবুজীর প্রাণ বাঁচান—

তাড়াতাড়ি সেখানে যেটুকু রেখে, যৎসামান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে নিয়ে গফুরের গাড়ী আর টাঙ্গাকাড়ি [illegible] আমরা 'ফুর্সা' ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে তখনো টংগা দাঁড়িয়েছিল। গফুর তার মধ্যে একটার উপর আমাদের উঠতে ইঙ্গিত ক'রে বললে—ইসমাইল, সাবধানে নিয়ে যাস। মোগলসরাইয়ের রাস্তায় যাসনি। গুরুদ্বারের পথ ধরে নিয়ে যা—

ইসমাইল বিরক্তির সুরে বললে—ওপথে গেলে আর আমার গাড়ী নিয়ে ফিরতে হবে না। সর্দার সব সিংয়ের দলের হাতিয়ার নিয়ে ওধারে উৎপাত লেগেছে।

গফুর বললে—ভয় নেই। তারা সব পালিয়েছে। আর যারা ছিল, পীরপাহাড়ের সাধের কাছে একেবারে নিঃশেষ সাফাই করে দিয়েছে। তুই যা। কোন ভয় নেই। খবর পেয়েছি ওরফার—একেবারে জনশূন্য।

মনটা কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো। বলনুম—না গফুর, থাক, এ গাড়ীতে—

গফুর যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—মুসলমান টংগাওয়ালা দেখে ভয় পাবেন না। ইসমাইল আমার ভাগ্নীপতি। নিজের বলে সব-কিছু হাতে পায়ে ধরে এনেছি। নইলে হাজার টাকা খরচ করলেও কোন কাফের আজ একখানা টংগা পাবে না। আপনাদের হিন্দু টংগাওয়ালা কি আজ একজনও বেঁচে আছে? বিলকুল খাতেম হয়েছে।

চুপ করে থাকতে পারলুম না। গাড়ীতে উঠতে উঠতে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলুম—কেন তোরা এমন করছিস গফুর? এ যে মহাপাপ! মানুষ হয়ে মানুষের—

বাধা দিয়া গফুর কঠিন ভাবে বললে—পাপ পুণ্য কিছু বুঝিনি বাবুজী। এরা উপকারের প্রত্যুপকার যদি বেহেস্তি কাম হয় তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কেও আমরা হারামীকাম বলে মনে করিনি। সোনাতালাওয়ের মস্‌জিদ—আল্লার গরীব্ যারা ভেঙ্গে দিয়েছে তারা শোধার দুষ্মন। তাদের খুন করলে গুনাগারি হয় না—

শিখেরা 'মাঈর ঘরং সেবক সকলের' বলে ভিড়ে মুসলমানদের বিখ্যাত সোনাতালাও মস্‌জিদ ভেঙ্গে দিয়েছে শুনেছি বটে—খবরের কাগজেও পড়েছি, কিন্তু সেকে কালী বাড়ী তাদা আর নানকশাহী ইট মুসলমের প্রতিশোধ নেবার জন্যই করা হয়েছিল—এর পর আর গফুরের মুখের উপর বলবার আমার সাহস হ'ল না।

মুখ বুজে চলেছি ষ্টেশনের দিকে। কিছু দূর যেতে না যেতেই পাকিস্থানি পল্টন মোড়ের কাছে আমাদের গাড়ীখানা ঘিরে ফেললে। কে যায়? গফুর! কী আছে সঙ্গে? আমাদের যার বিছানা খুলে তারা টানাটানি সুরু করলে।

আমরা তখন প্রাণভয়ে হরিনাম জপ করছি।

পিছনের টংগা থেকে গফুর হাঁক্ ছিলে "কোন্ হায়, গাড়ী ছোড় দেও।"

ইসমাইলও এবার সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"হট্ যাও, ইন্‌লোগ হোস্তি যায়।"

মুসলমান ফুজদের অতো দীর্ঘ পল্টনের দল বিচলিত হ'ল। গাড়ী চললো ষ্টেশনের দিকে।—

টংগাওয়ালাদের বর্ণনায় ফিরে যাব পলাতকের তীব্র অসহায়তা গোটাকয়েক মুহূর্তের যখন স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরে উঠে ন, পত্নী কেঁদে উঠলেন ছেলেদের জন্য। ওগো আমার যদি কখনো কি হবে—

গভীর বিশ্বাস নেবার সময় আমি গলার মিয়ারে আমার মনে পেয়েছে—'রফীকদের' একজনও জীবিত নেই। খবরটা শুনে পর্যন্ত বুকের ভিতরটা শূন্য বোধ করলেও স্ত্রীকে সেকথা জোনাতে পারিনি। বলনুম—ওদের জন্য ভেব না, প্রাণে বেঁচে থাকে যদি অবশ্যই আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

রেলের বাবুরা টিকিট দিচ্ছে না। প্রাণভয়ে ভীত মানুষগুলোর আতঙ্কের সম্পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে তারা। বৈলগড়িয়ার চালের ব্যবসায়ীদের কর্মযজ্ঞ কারণাবিতে ১৩৫০ সালের মন্বন্তর এসেছিল বাংলা দেশে, তাদের কথা মনে পড়ে গেল। এরাও দেখছি সেই জাতীয় জীব! মোটা টাকা রেলের বাবুদের ঘুষ দিয়ে কোনো রকমে টিকিট জোগাড় হল। কিন্তু ট্রেন আর আসে না।

ভুল পাইনি। যে দু'টার কম ট্রেনগুলি ছিল, মোট পিছু পাঁচ টাকা মজুরী চায়। কাজেই মোট ঘাট বাঁধা বিছানা নিয়েকেই গাড়ী থেকে নামিয়ে প্লাটফর্মে [illegible]। ছাত হ'য়ে তার উপরই বসে পড়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। কত রকম গুজবই কানে আসছে। ফটিয়ায় নাকি সীমান্তের আফ্রিদী দস্যুরা আক্রমণ করায় এ লাইনে ট্রেন আসতে দেরী হচ্ছে।

দু'ঘণ্টা লেটে গাড়ী এলো। মরি বাঁচি করে উঠে পড়লুম। কতক জিনিষ তোলা গেল, কতক গেল না। ট্রেনের কামরায় যে কী ভীষণ ভীড় তা কল্পনাও করতে পারা যায় না। সঙ্গে মেয়েছেলে দেখে একটি অল্প শিখ যুবক অনুগ্রহ করে আমাদের ট্রেনের দরজা ছেড়ে দিলে। যুবক দরজার পাহারা দিচ্ছিল যাতে গাড়ীতে আর কেউ না উঠে পড়ে ভীড় বাড়ায়। আমাকে আর আমার স্ত্রীকেও সে প্রথমটা ঠেকিয়েই দিয়েছিল, কিন্তু আমার মেয়ে রেবা এগিয়ে যাওয়ায় ছোকরা যেন কাবু হয়ে পড়লো। রেবার মুখের দিকে একবার চোখ রেখে আর না বলতে পারলে না। রেবার বয়স বছর ষোল হলে কি হবে, গায়ে মাংস হয়েছে, সেই জন্যেই বড় হয়েছে, দেখতে যেন আঠারো [illegible] মেয়ে! বিভাজার আশীর্বাদে [illegible] যৌবনের [illegible] তার সর্বাঙ্গে যেন উথলে উঠেছিল। যোলআনা [illegible]—তার সামনে [illegible] কিছু নিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু [illegible]

[illegible] তাকে সহজেই দিয়ে দিলে। পিছু পিছু আমরাও গিয়ে কামরায় ঢুকলুম। কিন্তু পলাতক [illegible] গাড়ীর ভিতরটা যেন তৃতীয় শ্রেণীরও বেহদ হয়ে উঠেছিল।

বিরক্ত হয়ে একজন যাত্রী বলে উঠলেন—নাঃ, এর চেয়ে হেঁটে এলে আরামে আসা যেত।

কথাটা শুনে এই দুঃখের মধ্যেও আমি না হেসে পারলুম না। এরা বলে কি? এতটা পথ পায়ে হেঁটে কখনো যাওয়া যায়? তার ওপর সঙ্গে মেয়েছেলে—নানা জিনিষের গাঁটবরা।

ট্রেন ছাড়লো। যাত্রীরা একটা স্বস্তি করে উঠলো। সেটা আর যাই হোক আরোগ্যের নয়। বহুক্ষণ আমাদের অর্থাভাবিক যেদনায় মন মোচড়ের বিরাম হয়নি। মুক্তির নিশ্বাস ফেলে পরিত্রাণ পাবার সন্তাবনা একটা দীর্ঘ নিরুদ্ধ শ্বাস মুক্তির সুবিপুল পথ।

ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখতে পেলুম তখনও কাতারে-কাতারে লোক ট্রেনের প্লাটফর্মে পড়ে রয়েছে। কতদিন পড়ে আছে তারা কে জানে? কী খায়? কেমন করে বেঁচে আছে?

ষ্টেশনের আশেপাশে মাঠের মধ্যে ও পথের ধারে মাঝে মাঝে তুমি অনেক লোক দেখতে পেলে। তুমি কিছু অনেক লোক এক এক দল মিলিয়ে, যারা দুদিন আগেও স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছিল! আজ তারা পথের ভিখারী—একেবারে নিঃস্ব!

সারাটি পথ ট্রেনের কামরায় মধ্যে কারুর মুখে আর অন্য কোনো কথা নেই। সংখ্যালঘিষ্ঠদের বর্বরোচিত নিষ্ঠুর আক্রমণে হিন্দু গ্রামের ক'জন পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে, কোন শহর কতখানি ধ্বংস হয়ে গেছে, কোথায় কত মেয়ে ধর্ষিতা ও অপহৃতা, কাদের কত টাকা ও ঘর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে—এই আলোচনাই চলছিল।

নিষ্ফল আক্রোশে দাতে দাত ঘষছে কেউ! দু'হাতে মাথা ধরে বসে আছে! পরক্ষণেই সৌজন্যমাত্র হ'লে ফেলে পড়তো এতক্ষণ! তাদের বলিষ্ঠ কব্জীতে লোহার কঙ্কণ ঝন্‌ঝন্ করে উঠছিল! সেই সঙ্গে বোধ করি তাদের প্রাণও টন্‌টন্ করছিল। কারুর পুত্র গেছে, কারুর কন্যা গেছে, কারুর স্ত্রী গেছে, কারুর ভগ্নী গেছে। কোনও কোনও বিশ বছরের ছেলের মাকেও পাঠানরা ধরে নিয়ে গেছে!

সবারই মুখে একই আফসোস—সংখ্যায় বেশী ছিল বলে কিছু করতে পারলুম না! বন্দুকেরা কয়েক এনেছিল। কৃপাণ কারো দাদলো না! এর প্রতিশোধ নিতেই হবে—

একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামলো। মুন্সিপ্রধান স্থান এটা। সীগ স্বেচ্ছাসেবকের দল লাঠি নিয়ে গাড়ীর ভেতর এসে ঢুকলো।

"পাকিস্থানসে লোগা চাঁদি রূপেয়া পয়সা যৎ লেযানা। বিস্কুটো সাথ যো কুছ হায় তুরন্ত উসা দেও।

কয়েকটা মাত্র ছোকরা! অবশ্য মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা ছিল। টুপীতে তাদের সীগ পতাকার ব্যাজ আঁটা। হাতে এদের কঞ্চি বা মিলিটারি ছিপ্‌টি ছড়ি। আমরা গাড়ীতে যত লোক ছিলুম—ইচ্ছে করলে তাদের মেরে ছাতু করে ফেলতে পারতুম! কিন্তু, কি যেন একটা অস্বাভাবিক ভীরুতা সমস্ত মানুষগুলোকে কাপুরুষ ক'রে ফেলেছিল। কোথায় গেল সে পঞ্চ ভক্ত সে খুনি পাঞ্জাবীর দাতে দাত চেপে প্রতিশোধ নেবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা! ভড় ভয় ক'রে যার কাছে যা ছিল বার করে তারা সন্তানীদের হাতে দিতে লাগলো—

"—কুছ্ খানা পিনা কা চীজ বগ্ত সেহারা সাথ।

আদেশ প্রচারিত হবামাত্র খাদ্যদ্রব্য সমর্পণ সুরু হ'ল। চাল ডাল পাঁউরুটি থেকে ছুরিটা ভরকনো ছুরী পর্যন্ত বার হয়ে গেল। ছোকরা দুজন পথও ছেড়ে দিয়ে গেল তারা।

ট্রেন আর ছাড়ে না। পাঁচঘণ্টার গাড়ী দাঁড়িয়েছে। ষ্টেশনের সমস্ত কামরার খানা-তল্লাসী শেষ হ'তে তবে ইঞ্জিন বাজলো। ছেলের মাকে ফিরে পাবার।

ট্রেন চলতে সুরু করে। মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের বাজার আর তাদের সে-শৌর্য বীর্য সৌকর্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

রাত ছুটে নাগাদ একটা ষ্টেশনের কাছে এসে গাড়ী থেমে গেল। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল লাইন ক্লিয়ার পাওয়া বলে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক ঘণ্টা গেল··· দু' ঘণ্টাও যায়··· আর ত সহ্য হয় না।

ড্রাইভার ও গার্ড ইঞ্জিনখানা খুলে নিয়ে এগিয়ে চল্লো আগের ষ্টেশনের দিকে—ব্যাপার কি জানতে। যাত্রীরা তখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে। যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে। পুরুষকারের ধনুর্গুণ। যে যার গায়ের চাদর আর একটু টেনে জড়িয়ে নিয়ে পরস্পরের গায়ে ঢ'লে প'ড়ে নাক ডাকাতে সুরু ক'রে দিলে।

রাত আর নেই। পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠছিল ক্রমে। উষার আগমন বার্তা অরুণোদয়ের সূচনা ব্যক্ত করছে। আমি ভাবছিলুম: পৃথিবীর এক কোণে এই যে নৈশাচিক উন্মত্ততা চলেছে ক্ষুব্ধ মানুষের উদ্ধত অহঙ্কার নিয়ে, আকাশের কোনও কোণই তো তার ছায়া পড়ে এতটুকুন ম্লান হয়নি? নির্মল নীল চন্দ্রাতপে লঘু শুভ্র মেঘের চকন দীলা। প্রভাতের অকলঙ্ক স্নিগ্ধ আলো ধীরে ধীরে উদ্ভাস করে তুলছে চারিদিক। ভোরের বাতাসের মৃদু স্নেহস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে একটা সজীবতা এনে দিচ্ছে যেন।

যাত্রীরা জেগে উঠছে একে একে। কেউ কেউ ঈশ্বরের নাম করছে। মুখ হাত ধোওয়া ও প্রাতঃকৃত্য সারার একটা ব্যস্ততা দেখা দেয় সবার মধ্যে। সহসা সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল রেল লাইনের পাশ দিয়ে যে গাড়ী ঘোড়া ও বাস চলাচলের প্রশস্ত পথটা চলে গেছে—পশ্চিম থেকে পূবের দিকে—সেই পথে এক অভাবিত দৃশ্য চখে পড়ল আমাদের।

সারিবন্দী চলেছে কাতারে কাতারে মানুষ! স্ত্রী পুত্র পরিবার গরু, বাছুর মহিষ ছাগল ভেড়া এমন কি পোষা কুকুরগুলি পর্য্যন্ত চলেছে তাদের সঙ্গে। কাঁধে পিঠে হাতে ও বগলে সবারই কিছু না কিছু ছোট বড় মাঝারি গোছের মুটকি ও পোটলা পুঁটলি। ছোট খাটো বিছানার বাক্স প্যাটরাও চলে পড়েছে। হুঁকো গড়গড়া আর লাঠি তো রয়েছে তাদের সঙ্গে।

[illegible] আমরা ভদ্রলোক। আমরা জানি, চলেছি বাপীয় রথে পরমুখাপেক্ষ [illegible] ভাগ্যের ভাগে গায়ে হেঁটে চলেছে গন্তব্য স্থানে।

[illegible] সহস্র সহস্র দুঃখে বিচ্ছিন্ন বাসভূমি পরিত্যাগ করে, প্রাণাধিক প্রিয় বাস্তু ভিটার মায়া [illegible] দিয়ে কতদিনের সঞ্চয়ে সঞ্চিত কত ছোটখাটো খুঁটিনাটি সখের জিনিস ও বিলাস বস্তু ফেলে রেখে প্রাণ বাঁচাতে ও মান ইজ্জৎ রক্ষা করতে বেরিয়ে পড়েছে পথের উপর, এরা আজ হরিয়া হয়ে। হঠাৎ ঘরে আগুন লাগলে যেমন করে মানুষকে সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়, তেমনি করেই বেরিয়ে পড়েছে এই ভীত সন্ত্রস্ত ধর্ম্মান্তর পলাতক আত্মরক্ষাপ্রার্থীর দল।

চলেছে তো চলেইছে তারা। শেষ নেই যেন এ চলার। এক হাজার—দু' হাজার—তিন হাজার—না এ যে অসংখ্য লোক। পাঁচ সাত হাজার মানুষ হবে—

ট্রেন শুদ্ধ সমস্ত যাত্রী আমরা সব কিছু ভুলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলুম এই অগণিত মানুষের [illegible] দিকে? কোথায় চলেছে এরা? কোথা থেকে সুরু হয়েছে এদের এমন যাত্রা। অনাদি কাল থেকে চলেছে কি মানুষ এমনি করে নিরুদ্দেশ যাত্রায়? বহু প্রাচীনকালে এক প্রাগৈতিহাসিক

যুগ যুগ এশিয়ার উপত্যকা হ'তে যে আর্য অভিযান অগ্রসর হয়েছিল এই সিন্ধুদেশের পথে—এ কি তারই পুনরাবৃত্তি? বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য পৃথিবীতে সভ্য মানুষ কি আবার বর্বর হ'য়ে উঠলো?

আমাদের গাড়ীর ইঞ্জিনটা ফিরে এলো। গাড়ীসুদ্ধ লোকে আমরা যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। ব্যাপার কি জানবার জন্য সবারই মনে একটা দুনিবার ঔৎসুক্য। ক্রমে মুখে মুখে খবর এসে পৌঁছলো ব্যাপার কিছুই নয়। ষ্টেশনমাষ্টার একেবারে সম্পূর্ণ আনকোরা এক নূতন লোক, হিন্দু ষ্টেশনমাষ্টারের বদলে সম্প্রতি এ লোকটি ওখানে কাজে নিযুক্ত হয়েছে। ইনি আগে পাকিস্থানের কোন্ এক ষ্টেশনপথে কাজ করতেন। রেলের কাজ তিনি কিছুই জানেন না এবং পারবেন না বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ওঁর আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নি। তিনি নিরুপায় হয়ে চাকরি রক্ষার খাতিরে ষ্টেশনে এসে বসেছেন বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কাজের কিছুই বোঝেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ লাইন দিয়ে একখানি গাড়ী যায়—একখানা আসে। তারা এসেছে এবং চলে গেছে। তিনিও নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন গিয়ে নিজের কোয়ার্টারে। "রেফিউজী-স্পেশাল" আসছে এ খবর টেলিগ্রাফ যন্ত্রে টরে-টক্কা শব্দে অনবরত বিঘোষিত হ'লেও তিনি তা ধরেন নি, আর ধরেই বা কি করবেন? টেলিগ্রাফের কোড ওঁর কাছে গ্রীক্ ভাষার চেয়েও দুর্বোধ্য। গার্ড ও ড্রাইভার গিয়ে যখন ওঁকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে গাড়ী তিন ঘণ্টা ডিটেন করে রাখার জন্য কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন, তিনি অম্লান বদনে বলেছিলেন—তা আমি কি করবো? আপনারা অনর্থক এতক্ষণ অপেক্ষা করলেন কেন? সেই তো ইঞ্জিনখানা নিয়ে এখানে এলেন, গাড়ীখানাও তো এই সঙ্গে টেনে নিয়ে আসতে পারতেন।

'সাইন ক্লীয়ার পাওয়া যায়নি' বলায় তিনি জবাব দেন—ওটা কি আমার কাজ মশাই! হিন্দু সিগন্যালার আর পয়েন্টস্‌ম্যান যারা আর হসপিটের ওরে কাল সন্ধ্যে থেকেই পালিয়েছে। আমি এসব কাজ কখনো করিনি। কোন্‌টা টানতে কোন্‌টা টানবো—শেষে কি একটা ফ্যাসাদে পড়বো? তার চেয়ে 'সিউয়ার' থাকাই নিরাপদ মনে করে বাসায় গিয়ে শুয়েছিলুম।

বিবরণ শুনে দুঃখের মধ্যেও আমরা হো হো করে হেসে উঠেছিলুম। কে জানতো যে শেষ নিতে যাবার আগে প্রদীপ যেমন করে জ্বলে ওঠার মতো সেই আমাদের শেষ হাসি।

ট্রেন চললো সারারাত। সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো ক্রমে আমাদের ট্রেনের কামরায় মধ্যে। বাতী নেই গাড়ীতে। কাল রাতটা অন্ধকারেই কাটিয়েছি, আজও তাই। সামান্য কিছু ফলমূল আর চা' ভিন্ন পেটে কিছু পড়েনি। ষ্টেশনের ধারে কেরিওয়ালাদের কাছে যা কিনতে পাওয়া গেছে। শীখ দস্যুরা আমাদের সোনা দানা কেড়ে নিলেও, নগদ টাকা কারুর নিশ্চয়ই খুইয়ে যায়নি। কিছু না কিছু আমাদের সকলের কাছেই লুকানো ছিল।

আগের ষ্টেশনের বাবটা দেখে অনুমানে বুঝেছিলুম যে পাকিস্থান সীমান্ত পার হতে আর আমাদের বিলম্ব নেই। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চোখবুজে ছিলুম। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেনের প্রত্যেক কামরা থেকে ভীষণ আর্তনাদ উঠছে। দাড়ি সোঁটার ধস্তাধস্তি আওয়াজের সঙ্গে গুলি গোলার শব্দও কানে আসছে।

রাত্রি তখন গভীর! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! আমাদের কামরাতেও যেন ডাকাত পড়েছে! আশেপাশে ধারালো ছোরা চলছে! চিৎকার! কান্না! মাথা ফাটাফাটি! কাতর প্রার্থনা! স্ত্রী ও মেয়ে দুপাশ থেকে সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরলে! ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তারা! ঘুমের আলস্যজনিত জড়তা কেটে গেছে আমার তক্ষুণি। অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে বিলম্ব হল না। আমাদের ট্রেন পাকিস্তান সীমান্তে এসে দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে!

দুটি শিখ তরুণ ও একটি হিন্দু ভদ্রলোককে হানাদারেরা গাড়ী থেকে জোর ক'রে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেল। আমার স্ত্রী ও কন্যা দু'পাশ থেকে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলো! দুর্বৃত্তরা তাদের হাত ধরে টানাটানি করছে। আমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠলুম। হঠাৎ চোখ পড়লো—ট্রেনের দরজার কাছে যে পাঞ্জাবী ছেলেটি পাহারা দিচ্ছিল সে মারা-কাটা অবস্থায় রক্তাক্ত দেহে সেখানে পড়ে রয়েছে—প্রাণহীন নিষ্পন্দ দেহ! আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি মুহ্যমান!

হঠাৎ কেন জানি না—আমি গর্জন করে উঠলুম—গদ্দর!··· ইমপাইট্!···

হানাদারেরা হকচকিয়ে খুকীর আর খুকীর মা'র হাত ছেড়ে দিলে! আমার তখন মনে পড়লো গদ্দর আমাকে একখানা সবুজ রঙের কার্ড দিয়েছিল, তার একপিঠে কায়দে আজমের ছবি আছে, আর একপিঠে চাঁদতারা দিয়ে আঁকা, তার তলায় উর্দুতে কি সব লেখা। বলেছিল গদ্দর, পাকিস্তান এলাকার মধ্যে কোথাও বিপদে পড়লে এই কার্ডখানা দেখাবেন। মিলিটারী, পুলিশ, এমন কি দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদের হাতে পড়লেও এই কার্ড দেখে আপনার রক্ষাকর্তা।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন থেমে যাবার আগেই ঝট্ করে টেনের কামরার আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার করে দিলে কে বা কারা। আমি তখন স্তম্ভিত! পকেট হাতড়ে কার্ডখানা খুঁজে বার করলুম। [illegible] দুলে উঠে বললুম—ইমাদার মো হায় আমি হই, ডরো না।

দুমদুম করে কাকে কি দিয়ে আঘাত করলে। সেই মুহূর্তে ট্রেনখানা বিউগিল বেজে উঠলো। সঙ্গীন্ তুলে নেমে গেল আমাদের কামরা থেকে। গাড়ী নড়তে সুরু করেছে। তারা নেমে গেছে বটে, কিন্তু চেয়ে দেখলুম—আমাদের কামরার একজনকেও জীবিত রেখে যায়নি।

গাড়ী তখন ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে ছুটছিলো। ভূ-ভারতের অন্যান্য রক্তাক্ত মৃতদেহের মধ্যে জীবন্ত হয়ে বসে আছি আমরা তিনজন অর্দ্ধমৃত প্রাণী। গাঢ় অন্ধকারের জন্যে পরস্পর কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে। শুধু স্পর্শের দ্বারা বুঝতে পারছি—আমরা আছি এখনো বেঁচে আছি।

সীমান্ত পার হ'য়ে ট্রেন যখন লেমরাণি বরাবর পূর্ব পাকিস্তানের গন্তব্যস্থানে প্রায় এসে পৌঁছেছে—তখন অন্ধকার দূর করে মেয়ের কান্না গাড়ীর মধ্যে জাগল। আমার স্ত্রী হঠাৎ বুকফাটা চিৎকার করে উঠলো—আমার খুকী! আমাদের খুকী! রেবা—রেবা কই?

আমার পত্নীর কোল থেকে যে মেয়েটি নিশ্চিন্ত নির্ভরে তখনও সুষুপ্তিলীন ভোরের আলো তার ঘুমন্ত শেফালির মতো ম্লান মুখে একটা স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়ে তুলেছে দেখলুম। মেয়েটির সাজ পোষাকই বলে দিচ্ছে সে একটি পাঞ্জাবী মেয়ে।

রাত্রির ঘটনা মনে পড়ে গেল। হানাদারেরা যখন অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন আক্রমণ করেছিল সেই সময় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়েছিল দুটি শিখ মেয়ে ও একটি হিন্দু মেয়ের মুখ চেপে ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়েছে তারা। তবে কি সেই হিন্দু মেয়েটি আমারই মেয়ে রেবা? সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় একটা হিম শীতল শিহরণ অনুভব করলুম। রেবা···নেই···দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েছে···সেই ফুটি ফুলের মতো মেয়ে। বুকের পাঁজরাগুলো বেদনায় টনটন করে উঠলো। পত্নীকে প্রশ্ন করলুম—কেমন ক'রে এটা সম্ভব হ'ল? সে তো বরাবর তোমার পাশেই ছিল।

স্ত্রী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'বুঝিছি'। তারপর, তাঁর বুকের মধ্যে আশ্রিত মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—এই সর্বনাশীর জন্যই আমরা রেবাকে হারিয়েছি। হানাদারেরা যখন ওকে ধরতে যায় ও প্রাণভয়ে ছুটে আমার আশ্রয় নিতে আসে। সেই সময় নিশ্চয়ই এ বেটী আত্মরক্ষার জন্য জানোয়ার হয়ে আমার রেবাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল, দুর্বৃত্তরা ওর পিছু পিছু তাড়া করে এসে অন্ধকারের মধ্যে রেবাকেই টেনে নিয়ে চলে গেছে। ওগো, কী হবে? আমার মেয়ে যে—

উদ্গত অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। আমিও নির্বাক! শুধু দুটো চোখ ফেটে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। একটা মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস বুক ভেঙে বেরিয়ে এল। বিহ্বলের মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—এর চেয়ে যদি কন্যার মতো রেবা যদি ওদের হাতে খুন হ'ত আমার এতটুকুও দুঃখ হ'ত না!

—এঁ্যা। আমার যদি কন্যা নেই?

চাপা কান্নার একটা গোঙানী শব্দ পলকের জন্য শোনা গেল। তার পরই সব স্থির। রেবার মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

মেয়েটির ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো সে।

ট্রেনের কামরার মধ্যে চেয়ে চেয়ে সে কোঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। গাড়ীর কামরা ভর্তি অসংখ্য মৃতদেহ। একবার সে ছুটে যায় বৃদ্ধ শিখটার নিষ্পন্দ দেহের কাছে, কাতর ভাবে ডাকে—কে সাড়া দেবে? ছুটে যায় বৃদ্ধা নারীর পাশে—ডাকে—ব্যাকুল হয়ে ডাকে। গায়ে হাত দিয়ে নাড়তে গিয়ে চমকে হাত সরিয়ে নেয়। দুই চোখে ঘনায় বিহ্বল বিস্ময়।···কেইয়া। কেইয়া। মেয়ে কেইয়া। আছাড় খেয়ে এসে পড়ে সেই ট্রেনের প্রবেশ পথে একটা মৃত পাঞ্জাবী যুবকের কাঁধের।

আমার স্ত্রী তখনও সংজ্ঞাহীন। মৃতদেহ পরিবেষ্টিত সেই চলন্ত শ্মশানে সদ্য মৃত কোলে নিয়ে আমি বসে রয়েছি নির্বিকার।

গাড়ী ছুটে চলেছে। কোথায় চলেছে। কেন আর ফিরে যাওয়া—কাদের জন্য ফিরে যাওয়া?

•

•

আমার স্ত্রীর জ্ঞান আর ফেরেনি। কিন্তু তবু আমাকে ফিরতে হয়েছিল। সেই অনাথিনী পাঞ্জাবী মেয়েটির মুখ চেয়ে। আজ যে-আমিই তার বাপ [illegible]—একাধারে সব।

দিল্লীর আহত শিবিরে তাকে নিয়ে আসি। রণাগত হয়ে আছি। স্বেচ্ছাসেবিকেরা আমাদের সেবা করে। চন্দা একদিন বললে—বাবুজী! সেবা নিতে লজ্জা করে। হুকুম দাও, আমিও সেবার কাজে লাগি।

লাগলো সে শরণার্থীদের পরিচর্যায়। কিন্তু এই সুযোগে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সে যে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করছিল—তা কি আমি জানি?

হঠাৎ একদিন দিল্লী শহরে আগুন লেগে গেল। পশ্চিম পাঞ্জাবের বৃশংসতার প্রতিশোধ প্রকট হয়ে উঠলো পূর্ব পাঞ্জাবের সর্বত্র। সে কী ভীষণ নির্মম অমানুষিক হিংস্র তাণ্ডবলীলা! মানুষ পশুরও অধম হয়ে উঠেছে। কেউ জানুক বা না জানুক, আমার কাছে একথা অবিদিত ছিল না যে এ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আমারই সঙ্গে এসেছে···

বোঝাতে চেষ্টা করলুম—বেটী! বন্ধ কর তোর এই সংহার লীলা। প্রতিহিংসার মধ্যে শান্তি নেই, সুখ নেই, তৃপ্তি নেই!

কে শোনে সে কথা? মা তখন রণচামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা! বলে—হাজারো ঔরৎকা শুদ্ধি হরি হাতি [illegible] লুকায়গা, বাবুজী—যে-ইজ্জতিকি কিসারা লোনা চাই।

একদিন জোর করে ধরে নিয়ে এলুম তাকে মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায়। সহস্র লোকের মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে [illegible] প্রতিজ্ঞা আমাদের "কোনো পাপ [illegible] চাই না।" শক্ত করে তাকে সমর্থন করলে।

[illegible] প্রার্থনা সভা শেষে ফিরে চলে গেলেন সেদিন।

[illegible] পার। নিজে তাকে বোঝাই আমি—এ পথ মানুষের পথ নয়। এ যদি করো তবে দুষ্কৃতকারীদের [illegible] তফাৎ রইলো কোথায়? তোমরা মায়ের জাত, ক্ষমা সহিষ্ণুতা ধৈর্যই যে ভারতীর নারী জীবনের আদর্শ।

তার অন্তরের মানুষটির কাছে আমার আবেদন ব্যর্থ হল না। চাঁদা শান্ত হয়ে এল অনেকটা। এই সুযোগে আমি নিয়ে গেলুম তাকে আর একদিন একেবারে মহাত্মাজীর পায়ের কাছে।

বিদ্রোহিনী ফিরে এলো শান্তির দূতে রূপান্তরিত হয়ে। বিপ্লবের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রেম-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হল তার মধ্যে।

ভারতীয় নারীর গৌরবময় রাজধানী জেগেই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের দুর্নীতি থেকে মুক্ত হয়ে তার কলুষিত মানুষের মুছে দিয়ে এল কল্যাণময় অন্তর দিয়ে।

অপরাজিতা

শ্রীসীতা দেবী

খোকার কিটা বেড়াইয়া কিছিতে বড় দেরি করিতেছে। কণক একবার ঘরে ঢোকে, আবার ব্যস্তভাবে রাস্তার ধারের বারান্দায় বাহির হইয়া আসে। গেল কোথায় দস্যিছাড়ী ছেলে লইয়া? যা দিনকাল! পলকে প্রলয় হইতেই আছে।

বার কুড়ি ঘরবার করার পর দূরে গলির মোড়ে শ্রীমতীর উদয় হইল। নিশ্চিন্তভাবে খোকার গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে অতি মন্থরগতিতে আসিতেছে। কণকের ইচ্ছা করিতে লাগিল ছুটিয়া গিয়া শ্রীলোকটার কান খুব জোরে মলিয়া দেয়।

কাছে আসিতেই ঝাঁঝিয়া চলিল, "পীতের সন্ধ্যে, তোর আক্কেল নেই? গিয়েছিলি কোথা ছেলে নিয়ে?"

গৃহিণীর মেজাজের উচ্চতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া কি বলিল, "এই ত ঐ মোড়ের পার্কে বসে ছিলাম। দেশের থেকে লোক এসেছে মা, আমার পিসীর বড় অসুখ। বুড়ী বাঁচে কি না বাঁচে। আমাকে এক মাসের ছুটি দিতে হবে।"

কণকের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কোলেরটি বড় হইতেছে, তার বড়টির এখন পাঠ্য তিন পূর্ণ হয় নাই। ইহাদের সে সামলাইবে কি করিয়া, আর সংসারের কাজই বা চালাইবে কেমন করিয়া? চাকর গজপতি ত বাজার করিয়া, খাইয়া ঘুমাইয়া আর কিছু করিবার অবকাশই পায় না। যতক্ষণ তাহার কাজ চলে, ততক্ষণ কণককে সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত মুখ চালাইতে হয়, হাতও তাহার অবসর পায় না। কুটনা কোটা, তরকারি রান্না দেখাইয়া দেওয়া, প্রয়োজন মত নিজে রান্না করিয়া দেওয়া, স্টোভ জ্বালাইয়া স্বামী ও দেবরের টিফিন তৈরারি করিয়া দেওয়া, এ ও লাগিয়া আছে সারাক্ষণ। স্বামী দেবর অতিশয় সময়জ্ঞান বিশিষ্ট মানুষ। প্রত্যেকটি জিনিষ তাহার সময়মত করিয়া দিতে হয়, তাহা না হইলে আর রক্ষাকালির শেষ থাকে না। বুড়ু ও খোকনকে সামলাইয়া কণক কখন যে এত কাজ করিবে, তাহা ভাবিয়াও পাইল না।

ঝি খোকার গাড়ী টানিয়া তুলিল। খোকাকে তাহার রেলিং দেওয়া ছোট খাটে বসাইয়া, বাহির হইতে তাহাদের কাপড় চোপড় তুলিয়া আনিয়া পাট করিয়া রাখিতে লাগিল। করুণস্বরে বলিল, "কাল সকালেই আমায় ছুটি দিতে হবে মা। বুড়ো মানুষ কখন আছে কখন নেই, শেষ চোখের দেখাটাও দেখব না?"

কণক বলিল, "আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমাকে ছুটি দিতে দেরি হবে না। লোকটোক একটা দিয়ে যাবে, না আপনি চলবে নাচতে নাচতে?"

কি বলিল, "লোক ছুট্ করে আর জোগাড় পাব না। তুমিই একটা দেখে নিও।"

কনক বলিল, "লোক আমায় দেখে নিতে হয় ত বরাবরের মতই দেখব, জোগাড় আর করা করে আসতে হবে না।"

কি বলিল, "তাই নিও তা হলে। না গিয়ে ত উপায় নেই? নিজের সাক্ষাৎ পিসী, একেবারে মরতে বসেছে।"

গৃহস্বামী রমেশ এই সময় ঘরে আসিয়া ঢোকাতে কি কথা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমেশ বলিল, "ঠাকরুন্ কি নিয়ে এত বক্তৃতা করছিলেন?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "তিনি বারো ঘণ্টায় নোটিশে এক মাসের জন্যে বাড়ী চলেছেন, এই সুখবরটা আমাকে দিচ্ছিলেন।"

রমেশ বলিল, "এই সেরেছে!" মাস ছয় আগে একবার অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখনকার অভাব স্মৃতি তাহাকে কিছু কালের জন্য নীরব করিয়া দিল। রমেশ মানুষটা একটু সৌখীন শৌখিন, চটের থলি হাতে বাজার করা বা ভাঙা বালতি করিয়া কয়লা বহিয়া আনা, বা ছেলের ঠেলা গাড়ী ঠেলিয়া তাহাকে হাওয়া খাইতে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কাজে সে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করে। পাড়ার সব ভদ্রলোকরাই এ সব কাজ হাসিমুখে করে এ কথাটা কনক তাহাকে দিনে দশবার শোনায়। রমেশ শুনিয়াও শোনে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ বলিল, "লোক না দিয়ে গেলে যেতে দেব না।"

কনক ধীরস্বরে বলিল, "না দেবে কি করে? তুমি ত আর তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না? [illegible] আটকানো এক উপায়, তা এরা [illegible] করে আগাম নিয়ে প্রায় সব শেষ করে রেখেছে, ও ছেড়ে আসা।"

রমেশ চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া রহিল। বাহিরের ঘরে কে একজন আসিয়া প্রবেশ করিল। রমেশ [illegible] বলিল, "কে?"

বাহির হইতে আগন্তুক বলিল, "আমি, রেজদা। তোমরা এই সন্ধ্যেবেলা থেকে ঘরে দোর দিয়েছ কেন? এটা ত হিন্দুপাড়া, তাতার ভয় থাকলেও ত কথা নয়? না, খুব 'রোমান্টিক্ মুড্'এ আছ?"

"আঃ কি যে বল তুমি ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই।" বলিয়া কনক তাড়াতাড়ি শুইবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নবাগত যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ হঠাৎ শুভাগমন যে?"

যুবক তখন নিজের স্যুটকেসটা একটা সোফার তলায় ঠাসিয়া রাখিতেছিল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন আপত্তি আছে কিছু?"

"তা আপত্তি থাকতে যাবে কেন? এমন সোনার চাঁদ দেবর যখন, তুমি এলে ত আমি হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু হিসেবটা কিনা যে আসতে সাতসাট দিন দেরি হবে, তাই বলছি আর কি।"

দেবর দ্বিজেশ বলিল, "দেরি হবে ভেবেছিলাম, তারপর দেখলাম যে বাড়ের উপকারের জন্যে ওখানে থাকতে হয়েছিলাম, তাঁরাই গুছিয়ে নিয়ে সহরে ফিরে আসছেন, অতএব আমিও ফিরেই এলাম।"

কণক হাসিয়া বলিল, "ও জ্যোৎস্নারা চলে এসেছে বুঝি? তাই বুঝি আমাদের আঁধার লাগল যে আর টিঁকতে পারলে না?"

দ্বিজেশ বলিল, "কি করে আর টিঁকি? জ্যোৎস্না বিদায় হল, তাই ভাবলাম এবার কণকের জ্যোতিতে পথ চলতে হবে।"

"ইঃ ভারি ভাগ্যি কণকের। ভয় নেই গো ভয় নেই। জ্যোৎস্না এক আধদিন মেঘে ঢাকা পড়ে বটে, আবার পরের দিনই জগৎ আলো করে।"

পাশের ঘর হইতে রমেশ ডাকিয়া বলিল, "তোমার খোকা কি কীর্তি করেছেন দেখ এসে, আলো অন্ধকারের আলোচনা পরে হবে এখন।"

কণকের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেশও আসিয়া তাহাদের ঘরে ঢুকিল। বুলুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "একমাসেই বেড়ে হয়ে গেছে। চিন্‌তে পারিস?"

বুলু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, কথার উত্তর দিল না।

দ্বিজেশ জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাটা হাঁটে চলে?"

কণক বলিল, "ছমাসেই আবার হাঁটবে চলবে কি? এর বিটি ত কালই পথ দেখাবেন. আমার যে কি দুশা হবে এই দুটো অপোগণ্ডকে নিয়ে তা ভগবানই জানেন।"

দ্বিজেশ বলিল, "আমি বড় বেতালা সময় এসে পড়লাম দেখছি। অপোগণ্ডের সংখ্যা আর একটা বাড়ল।"

কণক ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "তুমি অপোগণ্ড হলে কিসে শুনি? তোমায় কি বোতলে করে দুধ খাওয়াতে হবে, না কোলে করে বেড়াতে হবে? তুমি থাকলে শুধু দু'চারটে জিনিষপত্র এনে দেবে, চাকরটা অন্য কাজ করবার সময় পাবে।"

রমেশ বলিল, "পরলোকগত এক হাস্যরসিক বলেছিলেন, "বড় গলায় গলায় গো নাস্তি" সেই হল অপোগণ্ড। তা সে sense এ দ্বিজেশ অপোগণ্ড বটে।"

গজপতি এই সময় দ্বিজেশের বিছানাটা ঘাড়ে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এটা কোথায় রাখবো মা?"

কণক বলিল, "তুমি বাছা কি দিন দিন নূতন হচ্ছ? চিরকালই ত জান কাকাবাবুর বিছানা ঐ বারান্দার উপর থাকে, আবার বলে দিতে হবে কেন? যাও চা'য়ের জল চড়াও আর ভিম ভাজ দুটো। ঠিক আছে ত?"

"আজ্ঞে একটুখানি আছে। এখন ছিলে কাল সকালে হবে না।"

কণক বলিল, "এই নাও। রুটি পাব রোজ এক টিন্‌তে করে, কোনোদিন যদি আর মাইল্‌ বেশী খরচ করেছি ত তখনি কম পড়ে গেল। সকালে পঞ্চাশ রকম line করতে করতেই ত বারোটা বেজে যায়, তা চাকরে আর কাজ করবে কখন? কয়লা আন লাইন করে, রুটি আন লাইন করে, চাল আটা, কাপড়, চিনি, তেল সব লাইন করে আন। একটা চাকরে পারে কখনও অত করতে?"

বিজেশ বলিল, "কাজ নেই, তোমার ও অমূল্য রুটি খরচ করে। ও সকালের জন্যে তোলা থাক। আমার স্যুটকেসে ছোট একটা টিফিন বাক্স আছে, সেটাই বার করছি। ওতে এখনও গোটা আষ্টেক নারকেল নাড়ু আছে, তিন ভাগা সহযোগে ঐ দিয়েই আমাদের দুই ব্রাহ্মণ তনয়ের চা খাওয়া হয়ে যাবে।"

গজপতি তিন ভাগিতে প্রস্থান করিল। বিজেশ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "এখানে বেশ নিশ্চিন্ত মনেতে আছ না? কোনো দাদা হাঙ্গামা নেই।"

কণক বলিল, "তা আছি বটে। এত শান্তি দেখেই মাঝে মাঝে অশান্তি লাগে। খবরের কাগজে এক্সপ্লসনের কথা পড়ি, অথচ এখানে কিছুর নাম গন্ধও নেই। বড় বেশী নিশ্চিন্ত হয়ে উঠছি, পরে এর জন্যে আফ্‌সোস্‌ না করতে হয়।"

রমেশ বলিল, "এদিকে গোলমাল হবার ভয় বিশেষ কিছু নেই। সাত পাড়া ডিঙিয়ে এখানে কে করতে আসবে?"

ট্রেতে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম ও ডিমভাজা লইয়া গজপতি আসিয়া ঢুকিল। টিপয়ের উপর সব নামাইয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিজেশ চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "নাও চা টা খেয়ে একবার পিসীমাদের ওখানে ঘুরে আসি।

কণক বলিল, "তোমার আর কষ্ট কোন সুযোগে? যা 'কায়কিউ'-এর ঘটা, তোমাদের মাছেরঝোলানো বাড়ীর এখন দফা রফা।"

"যাক, দশটা অবধি ত বেয়ারা আছে।" বলিয়া বিজেশ চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রুমাল একবার বড় ভাইয়ের চিরুনি দিয়া আঁচড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পিছন হইতে ডাকিয়া কণক বলিল, "তোমার পিসীমার মত সংসার, যি চাকর ত গণ্ডা খানেক আছে, বোলো ত তাদের দয়া করে একটা যি যদি রেখে যেতে। ছোকরা চাকর হলেও চলবে।"

দরজার কাছ হইতে বিজেশ বলিল, "ঠিক বলব।" তাহার পর সদর দরজা ভেজাইয়া দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

পরদিন সকালেই বি তাহার ছেলে আনা বাহিনী আসিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিল। কণক যেন চোখে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল। কোনটাকে সামলায়? খোকাকে এক মুহূর্ত ছাড়িয়া রাখা যায় না। সে

তৎক্ষণাৎ কুঁজা উল্টাইয়া ফেলিয়া, বাপের চুড়ায় জামাটা দিয়া, নিবিষ্ট চিত্তে খাইবার চেষ্টা করিয়া যথারীতি খণ্ডপ্রলয় বাধাইয়া বসে। বুড়ুও এখনও সাবালিকা হয় নাই, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে পদে পদে তাহার মায়ের সাহায্য দরকার। এদিকে পঞ্চপতিকে যদি একলা রান্নাবান্না সারিতে বলা হয়, তাহা হইলে বেলা দুইটার আগে সে ভাত দিতে পারিবে না। কণক নিরুপায় হইয়া বলিল, "তুমি খোকাটাকে অন্ততঃ একটু ধর গো, আমি ঝোলের তরকারিটা কুটে দিয়ে আসি, না হলে ও হতভাগা আজ তোমাকে অফিসের ভাত দিতে পারবে না।"

রমেশ বলিল, "রক্ষে কর, তুমি এখন তরকারি কুটতে যেয়ো না। ও বেটা যা পারে করুক, আমি বেড়টার সময় এসে খেয়ে যাবো, না হয় ওদিকেই কোনো হোটেলে খেয়ে নেব। তোমার খোকাকে সামলান আমার কর্ম্ম নয়।"

"তা ত বটেই, কাজের বেলা খোকাটা সম্পূর্ণ আমার হয়ে যায়। তা না হয় হল, এখন কতদিন মা না পাওয়া যাবে, সকলের এই রকম অসিধম হতে থাকবে নাকি?"

"যেদিন যাতে ঝির বিরহ সহ্য করতে না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। কাল তুমি ওরে অফিসটে, ঝিয়ের কিরবার সময়। সে একটা লোকের সন্ধান এনেছে।"

"সত্যি নাকি?" কণক আনন্দে একেবারে লাফ দিয়াই প্রায় খাট হইতে নামিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, যদি এমন সুখবরটা আমলে তা আমায় জানালেও না একবার?"

দ্বিজেন পাশের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি এমন সুখবর? বিশেষ কিছু সুখবর এনেছি বলে ত মনে পড়ছে না? বুড়ুর রাজপুত্র বরের খবর এনেছি কি?"

"রাখ বাপু তোমার রাজপুত্র বরের খবর শিকেয় তুলে। মেয়ের বরের চেয়ে আমার ছেলের ঝিয়ের প্রয়োজন শতগুণে বেশী। বর এখনও কুড়ি বছর পরে এলেও চলবে, কিন্তু ঝি যে আমার আজই দরকার। সিসীমা ঝি দিতে পারবেন বলেছেন নাকি?"

দ্বিজেন বলিল, "সিসীমা বলেন নি, তার একতলার ফ্ল্যাটে যে গজেনবাবু থাকেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল তিনিই বলছিলেন। লোক একজন আছে তাঁর হাতে, আর সব দিকেই ভাল, ঘরদোরের কাজ সবই জানে, তবে কচি ছেলের কাজ আগে কখনও করে নি।"

কণক সাগ্রহে বলিল, "তুমি আজই তাকে নিয়ে এস, লক্ষ্মীটি ঠাকুরপো। এক বেলাতেই আমার প্রাণ যেন খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড় হয়েছে। কাজ আমি তাকে শিখিয়ে নেব। ছেলের ঝি হতে হলে কিছু specialist হবার দরকার নেই। সাধারণ হাত পা ওয়ালা মানুষ হলেই হবে।"

দ্বিজেন বলিল, "বাপ রে! এক বেলা ঝি নেই তাতেই একেবারে মরতে বসেছ। সাহেবলোকে পাঁচ কয়া মেয়ে ঝির কাজ করতে ভয় পায়! দেখ না আমাদের মা মাসীরা এক হাতে ঘরের কাজও করেছেন, আবার দেড় গণ্ডা ছেলেও মানুষ করেছেন, কারো ঘরে আয়া রাখতে হয়নি।"

"হাঁ, সে যা মানুষ করার ছিরি, ক, আমার দেখা আছে। সেই রকম আমি কল্পনে তোমার ভাই কাপড় বদ্ধ করে আমার বাড়ীর যার বন্ধ করে দেবে। যাক্, ওসব আলোচনার আমার সময় নেই, তুমি লোকটাকে আনবে কিনা বল!"

"আনব, আনব, আনব, এই তিন সত্যি করলাম। অফিস থেকে ফিরবার সময় একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।"

"বেঁচে থাক, একশ বছর পরমায়ু হোক, লাল টুকটুকে বউ হোক।"

হিরেন বলিল, "মোটেই নয়, অমন আশীর্বাদ কোরো না। একশ বছর এই পৃথিবীতে বেঁচে কোন লাভ আমার হবে? আর লাল টুকটুকে বৌ নিয়ে ঘোড়াপ্রেম যা নাজেহাল হচ্ছেন, তাতে আমার সখ সম্পূর্ণ উঠে গেছে।"

"সে তা আর না? ঘরে ও ক্যাংলা ভাত খাবি, না হাত রোব কোথায়? সখ যা করেছে তা আমি জানি। জ্যোৎস্নানুবর্তী একবার হাঁ বললেই হয়।"

"বেশ মনগড়া একটা romance তুমি সৃষ্টি করেছ।" হিরেন আর একটা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিতে আরম্ভ করায় সে তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

লোকের বাড়ীর উপর ঘরে কাচ্চাবাচ্চা নাই, সে মাঝে মাঝে কণকের ছেলেমেয়ে ধার লইয়া লইয়া যায়। খানিকক্ষণ আদর সোহাগ করিয়া আবার ফিরাইয়া দেয়। আজও সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তাহার আবির্ভাব ঘটিল। খোকাকে কণকের কোল হইতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এখন নিচে যাই, খানিক পরে ফিরে যাব এখন।"

কণক বলিল, "যাওনা ভাই, দুদণ্ড বসে গায় জিরুতে, তাই কোরো।"

খোকার হাত হইতে ছিপটি পাইয়া কণক তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিল। ষ্টোভ আনিয়া একটা তরকারি বসাইয়া দিল, গরমজিনেও খানাতাবে তাড়া দিয়া রান্নার গতি দ্রুততর করিয়া তুলিল। খুব তাড়াতাড়ি না হোক, এক রকম কাজ চালান গোছ ব্যবস্থা হইয়া গেল এবং যমেশ ও হিরেন দুইজনে খাইয়া ও টিফিন লইয়া কাজে বাহির হইতে পারিল। উমা বেশ খানিকটা দেরি করিয়া খোকাকে ফেরাবতে, কণক নিজেও স্নান সারিয়া লইল, মেয়েকেও নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া রাখিল।

দুপুরবেলাটা অবশ্য সে বিশ্রাম করিতে পারিল না। খোকা পাছে উল্টাইয়া খাট হইতে নীচে পড়িয়া বা খুব বেশী ধুলা মাটি মাখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহাকে জাগিয়াই থাকিতে হইল।

হিরেন অন্যদিন সন্ধ্যার আগে ফেরেই না, আজ দোর গোড়ায় কণকের উৎসুক মুখ দেখিয়াই সকাল সকাল চলিয়া আসিল। সঙ্গে খোকার ঝি।

ব্যস্তভাবে ডাকিয়া কণক কিছিৎ অবাক হইয়া গেল। ঝি সম্বন্ধে যে কথা হইতে পারিবে তাহা, তাহার বেশী কিছুতেই হইবে না। শামলা রং, মুখশ্রী ভালই, তবে স্বাস্থ্যের বিশেষত্ব আছে। কাপড় চোপড়

দিবার মত, তবে সেমিজ ও ব্লাউজ পরা। কনক আসিতে মেয়েটি বোকার মত হাসিল, অবশ্য বিস্মিত হইতে পারে।

বিজেন বলিল, "এই নাও বৌদি, তোমার ঝি। ঘরদোর টাইরে ঠিক করে নাও। কি কি কাজ করতে হবে বোঝিয়ে দাও" বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা?"

মেয়েটি জবাব দিল, "মলিনা।"

"আগে কার কাজ করতে কোথা?"

মলিনা বলিল, "কলকাত্তাতেই কাজ করেছি, তবে ছোট ছেলের কাজ করি নি।"

"সে আমি শিখিয়ে নেব এখন। শক্ত কাজ কিছু নয়, কাপড় চোপড় কতগুলো কাচতে হবে আর ঝিগিরি। তা পারবে তো?"

"হ্যাঁ, পারব।"

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "মাইনে আগে কত পেতে, এখন কত চাও?"

মলিনা বলিল, "আপনি আগের ঝিকে যা দিতেন তাই দেবেন, আর্যি কাজ যদি আমি তার চেয়ে ভাল করে পারি।"

কনক বলিল, "আচ্ছা, তিনি যা তাল কাজ করতেন, তা আর বলে কাজ নেই। আচ্ছা, তাকে যা দিতাম, তোমাকেও তাই দেব। তোমার কাপড়-চোপড় এনেছ তো? বিছানা আমিই দেব।"

মলিনা বলিল, "এনেছি, ঐ বাইরে বারান্দায় রেখেছি।"

কনক বলিল, "এস আমার সঙ্গে, কোথায় কি রাখলে চলিবে দিচ্ছি কাজও বোঝিয়ে দিচ্ছি।"

মলিনা কণকের নির্দেশমত নিজের কাপড়ের পুঁটলি তাঁড়ার ঘরে আনিয়া রাখিল। কনক বলিল, "এই ঘরেই শোবে তুমি। ঐ যে কাঠের বড় বড় সিন্দি দুটো রয়েছে, ওগুলো দরজার পাশে নিও, তাহলে একটা ছোট চৌকির মতন হবে। ঐখানে বিছানা রয়েছে। তোষকটা বড় নোংরা হয়ে গেছে, তোমায় ফেচে নিতে হবে।"

মেয়েটি সব তাতেই রাজী, বলিল, "আচ্ছা, কেচে নেব। আর একটা শাড়ী পেতে শুলেই হবে।"

খোকা প্রথম দুচারদিন চীৎকার করিয়া শেষ পর্যন্ত মলিনার কোলে থাকিয়াই গেল। বুড়ু প্রথম দিন কিছুতেই তাহার কাছে যাইতে রাজী হইল না। ঘরের কাজ-কর্ম যাহা কিছু মলিনাকে করিতে বলা হইল সে বেশ পরিপাটী করিয়াই সমাধা করিল। বেশ তাড়াতাড়ি কাজ করে, বকবকানিও বেশ আছে। কর্তা-গিন্নি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিতেছে তাহা শুনিবার জন্য কনক ঘন ঘন আড়ি পাতিয়া থাকে না। কনকের শয়নকক্ষে থাকিবার তাহার কোনই উৎসাহ দেখা গেল না।

কনক বলল, "মানুষটা ছেঁকে বস্তি তাহলে তাদেই হয়ে। বেশ ভদ্র আর কাজের। খ্রীষ্টান নাকি কে জানে! আমার অবশ্য তাতে কোনো আপত্তি নেই, তবে তোমার মাসীমা বা পিসীমারা শুনলে আপত্তি করবেন।"

রমেশ বলিল, "তাঁরা ত আর রোজ আসছেন না! খ্রীষ্টান কিনা জেনে নিলেই ত হয়!"

কনক বলিল, "কাল জেনে নেব। গজপতিও গোলমাল করতে পারে যদি শোনে যে খ্রীষ্টান।"

রমেশ বলিল, "হুঁ:, ও বেটা ভারি ধার্মিক। সেবার টেনে মুরগীর ডোমটা ঝিনিয়ে মেরে দিল। ওর ছুটো কাজ যে করে রেখে, তাকেই ও ধরকার মা মৌসাইটের নাতনী বলে মেনে নেবে।"

সকালে উঠিয়াই কনক দেখিল ইতিমধ্যে ছুষো মলিনা বাড়িটার কাজ অনেকটা সারিয়া রাখিয়াছে। গজপতিরও কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। ঝেঁটা ন্যাকড়া দিয়া পুতুল ও খবরের কাগজ দিয়া পরগোস ও হাতী বানাইয়া ছুটুকেও বশ করিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। কনক আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মানুষটা এখন টিঁকিলেই হয়।

মলিনা পর্ব চা দিতে আসিলে কনক একবার নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তোমরা হিন্দু ত? আমার অবশ্য হিন্দু না হলেও কোনো আপত্তি নেই, তবে বুড়ী শাশুড়ী-টাশুড়ি আছেন শুনলে হয় ত তাঁরা আবার একটু পিটপিটে।"

মলিনা বলিল, "আমি হিন্দুই মা, তবে আমার জাত কাল না। তাঁরা যখন আসবেন তখন না হয় আমি একটু তফাৎ হয়েই থাকব।"

কনক বলিল, "হিন্দু হলেই ঢের হল, জাত-টাত কেই বা দেখতে আসে! তাঁরা এখানে খুব বেশি একটা আসেনও না। এই গরমাদের সময়টা থাকলে এক আধ দিনের জন্যে আসেন। তুমি রান্নার কাজও জান নাকি?"

মলিনা বলিল, "সবই জানি।"

দিনটা কনকের ভালই কাটিল, খাওয়া-দাওয়ার পর অবসর করিয়া মাথাটাও মলিনা দিয়া দিল। মলিনা বলিল, সে দিনে ঘুমায় না, কাজেই ছেলেমেয়ের ভার কিছুক্ষণ তাহার হাতেই ছাড়িয়া দিল।

পরদিন সকালে কনকের শরীরটা তত ভাল ছিল না বলিয়াই চিঠিখানা তৈয়ারি করিতে বসিল। বিকালে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ বলিল, "শুনলে তুমি রাগ করবে, কিন্তু খাবারটা মলিনা তোমার চেয়ে ভালই করেছে।"

ক্ষুণ্ণ হইলেও কনক সেটা মুখে কিছুই প্রকাশ করিল না। বলিল, "নূতন হাতের তৈরি, ভালই ত লাগবে। তা ছাড়া মেয়ে জেতে পৃথিবীর আর সব মেয়েমানুষকেই উৎকৃষ্টতর ভাবা তোমাদের জাতের বিরুদ্ধ।"

রমেশ বলিল, "বাস, এতেই অভিমান হয়ে গেল! রান্না তুমি at all যে কর, সেই ত ঢের, কোনোদিন ত ভয় ছিল আগে? একেবারে অজ্ঞান দ্রৌপদী হবে এটা কেউ প্রত্যাশা করে না তোমার কাছে। কি রাঁধুনী নিয়েও যদি jealous হও, তা হলে ত আর পারা যায় না।"

দ্বিজেশ বলিল, "বসবার ঘরটায় চিঠি লিখেছ। তোমার লেখার ব্যাঘাতের জন্যেই ওটা গোয়াল ঘর কি বসবার ঘর সব সময় বোঝা যায় না।"

কনক বলিল, "সবাই মিলে ওকে অত বাড়িও না দীপু, মাথায় উঠে যাবে।"

দ্বিজেশ বলিল, "না শুনতে পেলে মাথার উঠবে কি করে? তাকে ডাকে ও বলা উচিত। বন্ধু হলে তাদের নিয়ে করতে একটুও ত আপত্তি দেখাও না? ঝি-চাকর বলেই কি সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে যা নিয়ম আছে, তা তাদের বেলা খাটবে না?"

"সাধারণ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম তাদের বেলা হয় বই কি?" বলিয়া কনক কাজে চলিয়া গেল। স্বামী ও দেবর মলিনা সম্বন্ধে বড় বেশী মাতিতেছে, ইহা তাহার বিশেষ ভাল লাগিল না। মেয়েটাকে চেহারায় বা সাজ-পোষাকে একেবারেই ঝি বলিয়া মনে হয় না। কোনো ব্যাপারে না বাধে! অবশ্য স্বামী বা দেবর সম্বন্ধে সন্দেহ তাহার ছিল না, তবু তরুণী স্ত্রীলোক লইয়া জগতে অঘটন ত কম ঘটে না? এত ভাল লোক না জুটিয়া একটা সাধারণ ছেঁড়া কাপড়পরা বুড়ী ঝি জুটিলেই বোধ হয় ভাল হইত। দিন দুই পরে বিকালে বাড়ী ফিরিবার জন্য টাঙ্গে উঠিতেছে, এমন সময় দ্বিজেশের সঙ্গে তাহার বন্ধু শচিপতির দেখা হইয়া গেল। দ্বিজেশকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আরে এই যে! থাক কোথায় তুমি সারাটা দিন? সেদিন বিকেলের দিকে গিয়েছিলাম তোমাদের ওখানে, তা শুনলাম তুমি বেশ দেরি করেই বাড়ী ফেরো।"

দ্বিজেশ বলিল, "বৌদির ঐ এক রোগ, চায়ের পর আধ ঘণ্টা দেরি হলেই তিনি ধরে নেন যে রাত হয়ে গেছে। চিরকালের দেরী, বড়ই ছোট ব্যাপার।"

"তোমার বৌদি বোধ হয় বাড়ী ছিলেন না, আর একজন—কি মহিলা তাঁকে নিয়ে বসেছিলেন তিনিই দেখলেন।"

দ্বিজেশ বলিল, "মহিলা এখন পর্য্যন্ত ত বাড়ীতে একটিই, তিনি বৌদি। তুমি কি সত্যই তুমি এখনই মহিলা মনে কর কি?"

শচিপতি বলিল, "যাই না। বিয়ার মত পোষাক-পরা একটি মহিলা তোমাদের বাড়ীতে সেই করতে চাও? এই চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ে?"

দ্বিজেশ উচ্চহাস্যে হাসিয়া বলিল, "ও ও আমাদের নূতন ঝি মলিনা।"

শচিপতি বলিল, "মহলের আর কি ছাঁদ-নাঁদ তাও বুঝবার মত বয়স আমার হয়েছে। ঝিরা কি আজকাল বাড়ি ঝাঁটের বই পড়ে? তার কোলে ত দেখলাম একখানা Intelligent Woman's Guide to Socialism রয়েছে?"

দ্বিজেশ বলিল, "কি জানি ভাই, ব্যাপার কি কিছু বুঝলাম না। আজ বৌদির খাওয়া গিয়ে পৌঁছ নিতে হবে।" মলিনা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

বাড়ী গিয়া শুনিল বৌদির ভীষণ জ্বর আসিয়াছে, দাদা তখনও বাড়ী ফেরেন নাই। ঝিনা ছেলেমেয়েদের সাবধানে রাখিয়াছে, কনকের শুশ্রূষাও তাহাকে করিতে হইয়াছে। গণ্ডগোলে অপটু হাতে বিজেশকে এক পেয়ালা চা ও দুইখানা বিস্কুট দেওয়া গেল, ইহার বেশী কিছুর ব্যবস্থা সে করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সেইটাই কোনো মতে গিলিয়া বিজেশ কনকের শুইবার ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "বৌদি, হঠাৎ কি ব্যাপার হয়েছে?"

মলিনা দরজা খুলিয়া বলিল, "বড় বেশী জ্বর হয়েছে, কেমন যেন আচ্ছন্নের মত ভাব একটা। ডাক্তার ডাকা দরকার বোধ হয়। বাবু ত এখনও এলেন না!"

বিজেশ বলিল, "ম্যালেরিয়া জ্বর ওঁর মাঝে মাঝে হয় বটে, তবে এত বেশী জ্বর কখনও দেখি নি। ডাক্তারকে কোন্ করছি আমি, দাদাও কোথায় আছেন দেখছি।"

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি icebag আছে?"

বিজেশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি জানি, আমি বলতে পারব না। ওসব বৌদিই জানেন। তুমি মাথায় একটা ভিজে পটি দিতে থাক, আমি আসছি এখনি। বুচু কোথায় গেল?"

"পাশের বাড়ীর মা এসে তাকে নিয়ে গেছেন খানিক আগে।"

বিজেশ আর কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। মলিনা সাধারণ কিরেশীর স্ত্রীলোক যে নয়, তাহাও তাহার ভাষা শুনিলেই বোঝা যায়। শচিপতি তাহাকে ইংরাজী বই পড়িতে দেখিয়া গিয়াছে। রোগীর চিকিৎসা বিষয়েও সে অভিজ্ঞা। কে এ মেয়েটি? কেনই বা কিরের কাজ করিতে আসিয়াছে?

কিন্তু সে-সব পরে জানা যাইবে, এখন ডাক্তার ও দাদাকে ডাকা আগে দরকার। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তারই বৌদি অসিতে পাওয়া গেল। ডাক্তার আবশ্যকীয় নথে আসিবেন বলিলেন এবং ঔষধ জানাইলে তাহা লিখিয়া এখনই দিতেছেন।

বিজেশ ফিরিয়া আসিল। কনকের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। মলিনা থাকাতে সে অসহায় হইয়া পড়ে নাই, সে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো, ডাক্তার বাবু বলা, কি জানা হইবে বলিয়া দেওয়া সবই রোগীর কাছে কাছে করিয়া যাইতেছে। বিজেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বুচু ফিরে এসে বড় গোলমাল করছে বেড়াতে যাবার জন্যে। আমি ত এখন যেতে পারব না, কি করব?"

বিজেশ বলিল, "দাদা ফিরুন আগে, তারপর আমি না হয় ওকে পার্ক থেকে একটুখানি ঘুরিয়ে আনব।"

ডাক্তারই আগে আসিয়া হাজির হইলেন। রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ম্যালেরিয়াই ও মনে হচ্ছে, তবে জ্বরটা একটু অতিরিক্ত হয়েছে। একটা পরীক্ষা করে আজ রাতেই দেখব। মাথায় বরফ দিন, আর এই ওষুধটা এনে খাওয়ান।"

বরফও আসিয়া পৌঁছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মালের কোথা করব?"

ডাক্তার বলিলেন, "যেমন হট্ করে এসে ছর আসে যায়ও তেমনি তাড়াতাড়ি। আজকের রাতটা কাটিয়ে দিন কোনোমতে। রক্তটা পরীক্ষা করে কাল কুইনিন injection দিলেই অমনটা যাবে বোধ হচ্ছে।"

জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সিস্টার?"

ঔষধ ওষুধ আনিতে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই নার্সটি বাহির হইয়া গেল। মলিনা বলিল, "আপনি কি বাবেন বুলুকে নিয়ে? ওকে কাপড় পরিয়ে দিই?"

বিজেশ বলিল, "ওকে তৈরি রাখ, যাবা দিয়ে এলেই নেব।"

রমেশ অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তাহাকে চা জলখাবার এবার মলিনাই আনিয়া দিল, বুলুকেও কাপড় জামা পড়াইয়া বিজেশের কাছে দিয়া গেল। গরমটিকে একটু সাহায্য না করিলে সে হয়ত রান্নাই করিতে পারিবে না, তাই খোকাকে কোলে করিয়া সে রান্নাঘরে চলিল। রমেশ বলিল, "একটা নার্স আজকের রাত পাঠিয়ে দিতেই বললাম ডাক্তারকে। আমরা সকলেই অত্যন্ত tired হয়ে আছি, হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব, ওকে ঠিক মত দেখতে পারব না। Malignant malaria যদি হয়, তাহলে বিপদ ঘটতে পারে এতে।"

বিজেশ বলিল, "ভালই করেছ। রোগীর সেবার কাজে আমিও একেবারে অনভিজ্ঞ, তুমিও ক্লান্ত, আর দুটো এইটুকু বাচ্চা সামলে মলিনা কতটাই বা করতে পারবে? আমি আসছি একটু ঘুরে।"

বুলুকে লইয়া সে খানিকক্ষণ নিকটের পার্কে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর মনটা একটু উষ্ণ থাকায় বাড়ী ফিরিয়া চলিল।

রমেশের জ্বর নামায় একটু ঘুমিয়াছে। চোখ খুলিয়া সে এদিক ওদিক তাকাইতেছে। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

রমেশ বলিল, "জ্বর হয়েছে, কমে আসছে। কথা বোলো না, চুপ করে বিশ্রাম কর।" রমেশের মাথা একবার রোগিনী সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, রমেশ সেটা জোর করিয়া তাহার মাথায় চাপাইয়া ধরিয়া রাখিল।

সন্ধ্যাবেলার কাজকর্ম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কে কোথায় শুইবে, তাহা লইয়া দাদামা। খোকা খুকী ও মায়ের সঙ্গে বড় খাটে শুইত, তাহাদের সেখানে রাখা চলে না। অবশেষে পাশের ফ্ল্যাট হইতে [illegible] ধার করিয়া তাহা দিয়া একটা খাট বানান হইল, বাড়ীর ক্যাম্পখাটটাও তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। খোকা খুকীকে লইয়া মলিনা এইখানে থাকিবে স্থির হইল। বিজেশ বলিল, "আমি খাবার ঘরের উপর বিছানা করে ঠিক শুতে পারব। দাদাও দরকার হলে এখানে এসে একটু গড়িয়ে নিতে পারবেন।"

খোকা খুকীর খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হইল। খোকার অত ঘুমায় নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িল, খুকু নূতন স্থানে শুইতে বড় আপত্তি অনুভব করিতে লাগিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া অনেক ছড়া ও গল্প বলিয়া ও বারান্দায় খুরপাক খাইয়া তবে মলিনা তাহাকে ঘুম পাড়াইল। তাহার পর বাচ্চা দুজনকে নূতন বিছানায় শোয়াইয়া, মশারি

ফেলিয়া ভাল করিয়া ওঁছিয়া দিয়া সে কাজে মন দিল। প্রায় এখনও শেষ হয় নাই, রমেশের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়া সে তাহা শেষ করিল। রমেশ ও বিজেশকে খাইতে বসাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ কনকের কাছে বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে নার্সও আসিয়া উপস্থিত হইল। মলিনাই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কাজকর্ম বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

রমেশ খাইয়া আসিয়া মলিনাকে বলিল, "তুমি এইবেলা খেয়ে নাও গিয়ে। নইলে খোকা খুকী হঠাৎ উঠে কি চেঁচাতে আরম্ভ করে তাহলে তোমার খাওয়াই হবে না। ওদের কাছেও একজন থাকা দরকার, নইলে ভয় পেয়ে যাবে।"

মলিনা পাঁচ মিনিটের ভিতর খাওয়া শেষ করিয়া আসিল। খাইবার টেবিল পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া বিজেশের বিছানা সেখানে পাতিল, রমেশের সাহায্যে মশারিও টাঙান হইল। তাহার পর খোকা খুকীর কাঁথা, কাপড়, চাদর প্রভৃতি শুইবার ঘর হইতে বসিবার ঘরে লইয়া গেল। নার্সের অনুরোধে তাহার জন্য চায়ের যোগাড়ও করিয়া দিয়া আসিল।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে লাগিল। খোকা খুকী মধ্যে মধ্যে উৎপাত করিতে লাগিল। তাহাদের লাইনে গিয়া মলিনার সারারাত ঘুমই হইল না।

ভোরে একবার কনকের ঘরে গিয়া উঁকি দিল। রমেশ বিজেশের পাশে গিয়া শুইয়া আছে, নার্স ইজি-চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছে।

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন উনি?"

"ভালই আছেন, জ্বরটা কমেছে, কিন্তু রক্ত আমাশার মত হয়েছে।"

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কি বলেছেন?"

"ডাক্তারবাবুকে কোন্ খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি সাতটার সময় আসবেন বলেছেন।"

মলিনা ফিরিয়া আসিল। রমেশ উঠিয়া আসিয়া মলিনাকে বলিল, "খোকা খুকীকে ওর ঘরে একলাটি ফেলে দিও না, ওদের জিনিষপত্র সব বার করে নাও। তুমিও যেন এসো না এ দিকে, কি যে ইনি বাধিয়েছেন তা কে জানে?" মলিনা তাহার কথামত খুকু ও খোকার সব জিনিষ বাহির করিয়া লইল। বুধিষ্ঠির কাজে যথাসম্ভব সেই করিতে লাগিল, কারণ রমেশের এ সব কাজে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া কুইনিন্ ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দিনের বেলা জন্য একজন নার্সের ব্যবস্থা করা হইল। রমেশ অফিসে বলিয়া পাঠাইল যে সে যাইতে পারিবে না। বিজেশ কিছু খাইয়া বাহির হইল, বলিয়া গেল দুই তিন ঘণ্টা পরেই ছুটি লইয়া ফিরিয়া আসিবে।

মলিনা জিজ্ঞাসা করিতেই সে নিজেদের গলির মোড়ে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে ডাক্তার দিদিমা আর একজন মহিলা রহিয়াছেন দেখিয়া বাহকের মাথে নিজের পরিচয় ও আসার কারণ বলিয়া দিয়াছেন। রমেশ প্রায় তীর্থ করিয়া বাইবার যোগাড়।

জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "বাচলমে বাবা, আরোগের যেটা সুতরে কিছু যদি আমি বোঝাতে পারি। যে ত তোদের বাড়ীটা দেখিয়ে।"

বিজেশের সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌শওয়ালা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়া নাড়িতে গজপতি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সকলে ভিতরে ঢুকিতেই রমেশ বোধিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "এইখানেই বোসো। ও একটু ঘুমিয়েছে মনে, এখন ওর ঘরে গিয়ে কাজ নেই।"

সকলে বসিলেন। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা খুকী কোথায়?"

রমেশ বলিল, "আসছে। খাচ্ছিল, বোধহয় খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।"

মলিনা খোকা খুকীকে লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। পিসীমার সঙ্গিনী মহিলা তাহাকে দেখিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিলেন, তাঁহার গলা দিয়া একটা অদ্ভুত চীৎকার বাহির হইয়া পড়িল। মলিনার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল, সে দরজার কপাট ধরিয়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজেশ তীব্র দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি, হয়েছে কি?"

রমেশ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা বলিলেন, "কি গা বেহাইঠাকুরুণ, কি হল?"

প্রৌঢ়া মহিলা বলিলেন, "এ ছুঁড়ীকে তোমরা কোথায় পেলে?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন, ঐ ত পঙ্কজবাবুর স্ত্রী ও একে দিলেন, এই তিন বছর বারো আগে। বোধার বিছেলে গেল, তাই আমার বন্ধুর স্ত্রী একে আনিয়ে দিলেন।"

"ওর সাত পুরুষে কেউ ছিল না গো। ও ছুঁড়ী আমারই এক মামাতো বোনের বিধবা মেয়ে। ঘরে ঠাঁই হ'ল না, তাই পরের দাসীবিত্তি করতে এসেছেন। বলুন কাণ্ড! বিয়েতে চার না, অমনেই যখন ওর নেই, তা ঠাকুরপরে সহ্য হ'ল না। তা তোমরা কি এর হাতে জল-টল খাচ্ছ না কি? কুটুমগুলির মধ্যে তোমরা, না বলেও ত পারি না।"

পিসীমা অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন। "সর্ব" ছোঁওয়া জলপাত্র করে একাকার করেছে নিজের। যেমন আচার-বিচার আর কোনো দিনই নেই। তা ছুঁড়ী করেছে কি? বয়স থেকে কেন বিয়ের বসে রয়েছে?"

মলিনার প্রাণপ্রতিমার মত মুখ এবার আরক্ত হইয়া উঠিল, চোখেও কোন অন্তর্দাহ হইয়া উঠিল, অত্যন্ত তীব্র স্বরে বলিল, "খোকাকে দাও।"

রমেশ সচকিত হইয়া খোকাকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইল। তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া রহিল খুকী।

পিসীমার স্বামী বলিলেন, "ওকে ও বাপের বাড়ী মুসলমান ওস্তাদ করে নিয়ে গিয়েছিল। দু' সাতদিন ওর ওকে পাড়ার লোকে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনে। ঘরে রেখে আর কি করে? ওর ধর্মে ভরাডুবি হতে পারে না ত? খোকো পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা আছে ত?"

পিসীমা বলিলেন, "দূর করে দে, এখুনি দূর করে দে, রাম রাম, কোথাকার পাপ কোথায় এসে জুটল।"

রমেশ বলিল, "ওর কেন করতে যাবে? সৎপথে চাকরি করে খাচ্ছে, তা তোমাদের এত খারাপ লাগছে কেন? আমি ওকে ছাড়াব না। খোকা খুকীকে ও মায়ের মত যত্ন করে।"

"আমি এসে তোর ছেলে রাখব, তুই ওকে বিদায় করে দে। কত আত্মীয়-টাত্মীয় রয়েছে সেখানে যাক। ভদ্রলোকের বাড়ী কেন?"

বিজেশ বলিল, "ও ত কারো চেয়ে কম ভদ্র নয়। যারা সব ঝিয়ের কাজ সাধারণতঃ করেন, তাঁদের কি তোমরা টিপ্‌টিপ্‌ কুর্ণি দেখে চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়ে রাখ?"

পিসীমা চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তুই তাহলে তোদের কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে? ছুঁড়ীকে বার করবি কি না বল? না হলে আমি আর তোদের ছায়া মাড়াচ্ছি না।"

রমেশ উত্তর দিল না। পিসীমাকে খুব বেশী চটান উচিত কি না? কিন্তু মল্লিকাকে ছাড়ানও ত উচিত নয়।"

বিজেশ বলিল, "দাদা ছাড়ানও যদি, আমি রাখব ওকে।"

পিসীমা বলিলেন, "ও মর বেহায়া ছোঁড়া। তুই আবার রাখবি কি? তোর ঘর না সংসার?

বিজেশ বলিল, "ওকে নিয়েই ঘর সংসার বাঁধব।"

পিসীমা বলিলেন, "উচ্ছন্নে গেছিস, একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস," বলিয়া ছুটিয়া গিয়া খিড়কীতে চাপিয়া বসিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীও ছুটিয়া গিয়া খিড়কীর দ্বার অধিকার করিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে মার ঢাকিতেছে, রমেশ তাড়াতাড়ি দ্বার কাছে চলিয়া গেল। বিজেশ খোকাকে কোলে করিয়া বলিল, "ভয় নেই, তোমার ভার আমি নিলাম। ঝিয়ের কাজ তোমাকে বেশী দিন

[illegible] বলিল, "আমার ভার কাউকে নিতে হবে না, জীবনে কারো গলগ্রহ আর [illegible] পথে বেরিয়েছিলাম, তুমি শুধু একটা উপায় বলে দিন।"

বিজেশ বলিল, "আমার বাড়ীতে আপনি কাজ করুন। কোনো অসম্মান তোমার আমি করব না, [illegible] করে বলছি।"

মল্লিকার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বলিল, "আপনার দিকে শুধু করুণা, আর আমার দিকে শুধু কৃতজ্ঞতা, এ ত বিয়ের ভিত্তি নয়?"

বিজেশ খানিকক্ষণ [illegible] থাকিয়া বলিল, "কি করতে চাও তাহলে?"

"হতভাগা মানুষের [illegible] উৎসর্গ করুন, তাকে পথ বলে দিন, তাকে উপায় করে দিন।"

বিজেশ বলিল, "বেশ তাই চেষ্টাই করছি। কিন্তু যেন আমি অপেক্ষা করে থাকব।"

মল্লিকা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "যদি কোনো দিন এমন একটা লোকের ঘর যে মাথা উঁচু করে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারি, [illegible]।"

স্বাধীনতার সন্তান

ফাল্গুনী দাস

(এক)

অবশেষে এলো স্বাধীনতা···

কিন্তু এলো বিখণ্ডিত করে ভারতবর্ষকে··

তবুও স্বীকার করে নিতে হলো তাকে···হোক বিখণ্ডিত, তবুও তো স্বাধীনতা!

অন্ত কবে দেশ ভাগ হ'ল সেই পর্যন্ত। রেডও বার পড়ল না। যতদূর চারিদিকে। সেদ অফিসের বিভাগগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। চোদ্দই আগষ্টের মধ্যে অফিসের যাবিপত্রগুলোও ভাগ করে নেওয়তে হবে। রাখতে এবং পাঠিয়ে দিতে হবে, তার আর বাদ—দুটো জায়গায়।

অফিসের ফাইলের চাপে তারিণীশংকর, স্বাধীনতা এসেছে সেটা বুঝলো কিন্তু তার আগমনে যে আনন্দ পাওয়া উচিত, তার স্বাদ গন্ধ পেলো না।

তারিণীশংকর হাঁপিয়ে উঠছিল। সে আর পারে না পাতার পর পাতা লিখে। সাবডিভিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অফিসের কেরানী সে।···তিনদিন হ'ল উপরের অফিস থেকে একটা সার্কুলার এসেছে,—সমস্ত কেরানীদের প্রস্তুত থাকতে, যখনই বলা হবে···আদেশ পাওয়া মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জিনিষ-পত্র গুটিয়ে নৌকুল জায়গায় পাড়ি দিতে হবে।···সার্কুলার পড়ার পর তারিণীশংকরের ভাবনাগুলো যেন আরো বেড়ে পড়লো। কখন বদলীর হুকুম এসে পড়ে। বাড়ীতে সংসার নিয়ে কোথায় উঠবে, কি করবে! ভেবে কোন কূল কিনারা পায় না!

পাকুড়ি থেকে বাইরে শুকনো গাছগুলোর ডালে এসেছে বসন্ত···এসেছে স্বাধীনতা···

দৈনিকটাই মেলে নি তারিণীশংকর···তার দৃষ্টি ঘুরছে আদেশ বদলীর পরোয়ানা।

যখন পরোয়ানা এসে গেল হঠাৎ। তারিণীশংকরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তৈরী হ'য়ে অন্য জায়গায় পাড়ি দিতে হবে। কাটিহার ডিস্ট্রিক্ট অফিসে তার বদলী হয়েছে।···

বিপদ শুধু একটা নয়—বহু। ছেলে বহু দিন থেকে অসুখে ভুগছে। ডাক্তার বলে, যক্ষ্মা রোগ··· তারিণীশংকরের মনকে চোখ ঠারে, পুরোণো ঘর বলে। অবশ্য এখনকার মধ্যে। বুক বুক ভয়ে কোনমতে

বেঁচে আছে। কখন যে মরে পড়ে তার নিশ্চয়তা নেই। তারিণীশংকরের হাতও প্রায় নিত্য। দু'মাসের মাইনে আগাম পেয়েছিল বন্দনীর জন্য। অর্ধেকের উপর তাও দিতে হয়েছে অপরকে, বাজারে! তার উপরে তারিণীশংকরের স্ত্রী হৈমবতী মাসের উপর অন্তঃসত্ত্বা। বিপদের জাল চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তারিণীশংকরকে।

কোন কূল-কিনারা দেখে পায় না সে।···

দেশের ছেলেরা মত্ত স্বাধীনতার উৎসবে।···

ক্লান্ত দেহ এবং ভারী মনে কোয়ার্টারে ফিরলো তারিণীশংকর বন্দনীর পরোয়ানা নিয়ে। ঘোর গোড়ায় না দিয়ে ধমকে দাঁড়ালো।

কাশির আওয়াজ আসছে···ছোটই তো, খাসে···

ঘরে ঢুকে দেখলেন—নন্দ কাঁপছে,—কাশির সঙ্গে বেরিয়ে এলো খানিকটা কেটে রক্ত। হৈমবতী ব্যস্ত হাত দিচ্ছেন ছেলের মাথায়।

—"কাশি আজ বেড়েছে দেখছি!" চারীলায় বলে তারিণীশংকর।

—"আমি আর পারি নে।" বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে হৈমবতী বললেন,—"শরীর আমার মোটেই ভাল নেই। তোমার 'বুমনী' বসে একটুও নন্দর কাছে বসে না···মন পাখী কোথাকার।"

কোলের ছেলেটি খিদের জ্বালায় বিরক্ত করছিল। ঠাস্ করে একটা চড় কষে দিলেন হৈমবতী তার নিকট চীৎকারে বন্দনীকে কাঁদিয়ে তুললে সে। তারিণীশংকরের ভাষা মন উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

[illegible] নন্দর [illegible] ভুল হচ্ছে। চল্লিশ ঘণ্টার নোটীশ। কালই সন্ধ্যের মধ্যে [illegible]

[illegible] হৈমবতী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ স্বরে বললেন,—"কোথায় যেতে হবে আমি?"

—"কাশিয়াং। রাত্তারাতি সব তছিয়ে ফেলতে হবে।" তারিণীশংকর উত্তর দিল।

—"কিন্তু আমার কি নড়বার শক্তি···আরে ও ঘর বুমনী।" হৈমবতী কোলের ছেলেটিকে নামালেন নীচে, ছুটে গেলেন নন্দর কাছে। নন্দ কাশতে কাশতে [illegible] হয়েছে। দুই তারিণীশংকরের চোখে, পড়িয়েছিল নন্দর মাথার পাশে, চেপে ধরতে পারছে না নন্দকে। হৈমবতী ওকে তুলে নিলেন কোলে।···

তারিণীশংকর অন্ধ নয়। চোখে তার স্ত্রীর বর্তমান অবস্থা। বুঝেও তাই চুপ করে থাকতে [illegible]

দেশে এসেছে স্বাধীনতা···তাকে অস্বীকার করবার উপায় কি!

নন্দকে কোলে নিয়ে হৈমবতী বললেন—"আর দেখছি নন্দর কাশিটা আরও বেড়েছে।···বা তো বুমনী তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়। তুমি একটু পরিষ্কার করে নিলে বেশনের চিনি তো ফুরিয়ে গেছে?"

"যাক, এখন আর কী করতে হবে—ইস্টিশনের বন্দোবস্ত করে আসি।"

ওয়াগনের বন্দোবস্ত করে তারিণীশঙ্কর যখন বাড়ী ফিরলো তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। হৈমবতী অপেক্ষমানা। ঘড়ি দেখে ফেলে ক্লান্ত হয়ে এইমাত্র ঘুমিয়েছে। খুব মৃদু ঘা দিচ্ছে ছোট জানালিকে।

তারিণীশঙ্করের ঘরে ঢুকতেই হৈমবতী প্রশ্ন করলেন,—"মালগাড়ী ঠিক হল?"

—"হ্যাঁ—ঈশ্বরদী থেকে এই 'পাইলটে' এসেছে।" ক্লান্ত স্বরে তারিণীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করে,—"রান্না হয়েছে?"

—"সব তৈরী। আলু ভাতে ফাউ করে রেখেছি।"

—"তাড়াতাড়ি সব সেরে ফেল।"

—"হাত মুখ ধোবে না? অফিস থেকে এসে তো ধোও নি।"

—"আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি ভাত বাড়োগে" তৎক্ষণাৎই তারিণীশঙ্কর চলে গেলো হাত মুখ ধুতে।

সে রাত্রির ঘটিটা বাজ হয়ে থাকলো তারিণীশঙ্করের ঘরে। রাত্রি দুপটার পর বাওয়া দাওয়া চুকিয়ে—জিনিসপত্রের বাঁধা-ছাদা শুরু হ'ল। সারাটা রাত ধরে জিনিসপত্রের বাঁধা-ছাদা চললো। সবশুদ্ধ কাজ যখন শেষ হ'ল তখন রাত্রি ভোর। পূর্বাকাশ একটু লাল হতেই তারিণীশঙ্কর দুইজন কুলীদের ডেকে আনলে। জিনিসপত্রগুলি সকালের মধ্যেই বোঝাই করতে হবে ওয়াগনে।

উষাকালে বেরিয়েছে প্রভাতকেরীর দল হাতে নিয়ে চিরন্তনী বাণীনতার ঝাণ্ডা…

(দুই)

তারিণীশঙ্কর কলিয়ারে এসে বাসী হয়ে বিসুয়ানে। এসে দেখলো তার জন্য কোন কোয়ার্টার খালি নেই। সহরের মধ্যেও বাড়ী খুব সহজে মেলে, কোয়ার্টার খালি বাড়ী নেই। তার পূর্বাগত দু' একজন কর্মচারী বাসার অভাবে ওখানে ছিলেন,—তারিণীশঙ্কর তাঁদের সঙ্গেই আশ্রয় করলো। সেও সেইটা এখন দরকার।

[illegible]…

তখনো তারিণীশঙ্করের সে-রাত্রির ওয়াগনবাস হয় নি। ট্রেনের পানিপাড়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলো ঘরের জলের।

আর পানিপাড়ে আসে নি,—জল দিয়ে যায় নি।

হৈমবতী ধমকের দিয়ে উঠলেন—"জল নেই,—এক বালতী জলের দরকার যে।"

—"খুদু—অ্যা খুদু!" খুদুকে ডাক দিলো তারিণীশংকর, বললো,—"যা তো মা চট্ করে প্রাটফর্মের কল থেকে এক বালতী জল নিয়ে আয়। বুকের ভিতরটা যেন আমার কেমন করছে—হাঁপানিটা বাড়লো কিনা কে জানে!"

হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি সেলাই করা কর্ডের শাড়ীটা সামলে নিয়ে খুদু তাড়াতাড়ির কোণ থেকে জলের বালতীটা তুলে নিল হাতে।

—"তোমার কি আক্কেল! ঐ নোংরা নেয়েকে প্রাটফর্ম জল আনতে পাঠাচ্ছ?" বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুললেন হৈমবতী।

—"তাতে কি হয়েছে। একটুখানি তোলা জল নেই।" তারিণীশংকর বলে।

খুদু নেমে গেল নীচে জলের বালতী নিয়ে।

হৈমবতী প্রশ্ন করলেন—"আর তো এই মালগাড়ীতে বাস করতে পারি নে। তা ছাড়া আমার তো একটু—"

—"হ্যাঁ, আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি, কেউ যদি দিন পনেরর জন্য একটু স্থান দেয়; কিন্তু ঘরের সামনের দালানের এক কোণও কেউ একটু ছাড়তে চাইল না।

—"একঘরে কাল হয়,—কেউ দুদিনের জন্যে একটুখানি ভাবলো…"

—"তাদের দোষ দিই না—যে অবস্থায় রয়েছে তারা, আমাদের অনেকের বিশেষ ভাল বলা যায় না। তোমাটাদের ঘরিতে পরিবার ও ছেলে ও কি করছে।"

[illegible] বালতী রাখলো তারিণীশংকর কোণে। বললো—"আমি [illegible] লোকটা বড় পাজী।"

[illegible] বাধা দিয়ে বললেন,—"আমি তো বারণ করেছিলাম।"

[illegible] পারে না। কেরানীর সব কথা কানে তুলতে নেই।

খুদু কেশে উঠলো খক্ খক্ করে। হৈমবতী গেলেন নজর রাখতে। বললেন তারিণীশংকরকে—"এদিকে এস তো একটু। দেখ আবার রক্ত বেরুতে পড়ছে।"

তারিণীশংকর উঠে এল নজর রাখতে।

খুদু কাশছে, রক্ত মেশানো কফের সঙ্গে। শ্রান্ত, নির্বোধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জলের দিকে। একটা নিঃশ্বাস আপনা থেকে বেরিয়ে এলো। হঠাৎ দৃষ্টিটা একবার বাইরে আকাশের দিকে চলে গেল। খুদু হঠাৎ বলে উঠলো,—"মাগো দেখি একটা বিশ্রি। রেলের হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে আসি।"

হৈমবতী তাকালেন খুদুর।

খুব একটা ওষুধের শিশি এসে দিল তারিণীশংকরের হাতে। তারিণীশংকর নেমে এল নীচে—ওয়াগনের সংসার থেকে।

ওষুধ নিয়ে যখন ফিরলো তখন স্বর্ণা অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। স্নান করবার অবসর পেলো না সেদিন।

—"অত তাড়াহুড়ো কিসের? স্নান করে খেয়ে অফিসে যাও।" হৈমবতী বললেন।

—"না, সময় নেই—" তারিণীশংকর বলে, "ঘণ্টা বেজে গেছে। হাজিরা খাতা আর পেন্সিল নোঙর ঘণ্টার মধ্যে সাহেবের ঘরে চলে যাবে। দেরী করা চলবে না। দুপুরে এসে খাবো। নতুন ওষুধটা তার ঘণ্টা পর পর খাইয়ে দিও।"

—"তুমি তো না হয় দুপুরে এসে খাবে। কিন্তু দুপুরে কে নিয়ে যাবে ওষুধটা? কমে স্নান করাবে?" একটা প্রশ্ন তুলে ধরলেন হৈমবতী।

—"এলে যদি সময় পাই তো খুকুকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসবো। আর একদিন স্নান না করলেই কি আসে যায়।" উত্তর দিলো তারিণীশংকর। আর দেরি করা যায় না। নেমে পড়লো নীচে। জোর পায়ে ছুটে চললো অফিসের দিকে।

স্বাধীন দেশে এখন সবকিছুকে ঘড়ি ধরে মেনে চলতে হবে নিয়ম-কানুন।

দুপুর বেলা, প্রখর রোদ মাথার উপরে। অফিস থেকে খাবারের ছুটি নিয়ে তারিণীশংকর এসে দাঁড়ালো ষ্টেশনে। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে, সামনে গিয়েই চমকে উঠে; ওয়াগনটা নেই। ওয়াগনটা ছিল তিন নম্বর ও-টির ইক লাইনে। এখন তার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সারা ষ্টেশন ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু ওয়াগনের কোন পাত্তাই নেই। এক গাড়ী ভর্তি মাল। নিশ্চলাবস্থ তারিণীশংকর বিদ্যুতের মত দাঁড়িয়ে থাকে—তারপর ছুটলো ষ্টেশন মেকানেকে।

—"২১২১ নম্বরের সি, বি, ওয়াগনটা কোথায় সন্ধানে হদিস বলতে পারেন?" তারিণীশংকর প্রশ্ন করলো ষ্টেশন ক্লার্ককে।

—"ও-টির ইক লাইনে ছিল?" ষ্টেশন ক্লার্কও পাল্টা প্রশ্ন করলো।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"ওয়াগনটা টেনে ইয়ার্ডে নিয়ে রাখা হয়েছে।"

তারিণীশংকর স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণের জন্য। নেমে এলো বাইরে, নেমে পড়লো লাইনের উপরে রেল-লাইন ধরে চললো সোজা উত্তরে ইয়ার্ডের দিকে।

মিনিট পনেরো ছেঁটে ইয়ার্ডের সীমানায় এসে দেখে চারদিকে মালগাড়ীর বিশৃঙ্খল জটলা। হতভম্ব হয়ে রইলো কিছুক্ষণের জন্য। তারপর খুঁজে বেড়াতে লাগলো নিজের ওয়াগনটা।

অনেক—অনেক পরে এদিকে খোঁজাখুঁজির পর—অবশেষে আবিষ্কার করলো ইয়ার্ডের এক প্রান্তে, রয়েছে সেই ওয়াগনটা···তার "হোম্, সুইট্, সুইট্ হোম্···"

—"মা, বাবা এসেছেন।"

ছোট ছেলেটিকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হৈমবতী। ঘুম ওঁকে ঠেলা দিয়ে তুললো। কড়া রোদে ওয়াগনটা তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। তারিণীশঙ্কর নেমে উঠেছিলো, আলা ছাড়তে ছাড়তে বললো—"উঃ, কি গরম! আগুন বর্ষাচ্ছে যেন।"

হৈমবতী উঠে বসলেন। বললেন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে—"আর পারি না মালগাড়ীর মধ্যে থাকতে।··· ষ্টেশনে তাও ভাল ছিলাম—এখন আবার কোথায় টেনে এনে ফেলেছে। এর চেয়ে গাছতলায় থাকা ভাল।"

পরদিন।

অফিস থেকে এসেই খবর দিলো তারিণীশঙ্করের,—"আমাদের পাকড়ীবাবু, বড়সাহেব বন্দী হয়ে এসেছেন এখানে। এবার হয় তো তাঁকে ঘরে একটা কোয়ার্টারের যোগাড় হতে পারে।"

—"শুনছি তো এখানে বাড়ী নেই। কোথায় উঠলেন তিনি?" হৈমবতী তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলেন।

—"অফিসারদের 'রেষ্ট হাউসটা' সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর জন্য। আর বাংলোটার চুণকাম [illegible] বাবে।"

[illegible]—"বেশ চাকর পুষিও—তিনিও। তাঁর জন্য এতখানা বাংলো চুণকাম করা হচ্ছে [illegible] পুষতে উঠেছেন তিনি। আর তোমাদের শেয়াল কুকুরের মত খোঁয়ার খাঁচায় থাকতে হচ্ছে···এ অবিচার আমরা সইছি—কিন্তু ভগবান সইবেন না।"

তারিণীশঙ্কর কোন জবাব দেয় না···তবে ভগবান এ-সম্বন্ধে যে কি করবেন, সে-সম্পর্কে হৈমবতীর সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলো না।

সাতদিন, সেদিনই। হৈমবতীর প্রসব যন্ত্রণা উঠলো হঠাৎ। তারিণীশঙ্করের ভয় হয়ে ছেলো। বুক কাঁপছে ধক্ ধক্ করে। হৈমবতী কাতরাচ্ছেন—আর কাঁদছে ছোটের ছেলেটি। সকলেরই যেন সন্ধ্যা হয়েছে।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে—একটা দৃঢ়তা নিয়ে তার মুখ ফিরে তারিণীশংকরের দেখে পড়লো নীচে ওয়ার্ড থেকে। মালগাড়ী আর লাইন টপ্‌কে টপ্‌কে চলেছে নার্স আর বাই ডাকতে।

যখন ফিরলো বেল হাসপাতালের নার্স আর ধাইকে সঙ্গে নিয়ে তখন হৈমবতী যন্ত্রণায় চীৎকার করছেন। খুব বাড়াবাড়ি করছে হৈমবতীর শিশুরা বলে।

নার্সের ইশারায় খুড় উঠে সরে এল। হৈমবতীকে নার্স পরীক্ষা করলেন।

—"আপনার ছেলেটার চৌকিখানা সরাতে হবে যে।" নার্স নম্বর চৌকিখানা দেখিয়ে দিলো বললেন—"সময় আর বেশী নেই...।

টেনে নম্বর চৌকিখানা সরিয়ে আনলো তারিণীশংকর—সাহায্য করলো খুড়। আড়াল ওয়ার্ডের মাঝামাঝি একটা কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল। ওয়ার্ডটা বিভক্ত হ'ল দুই ভাগে। একপাশে পর্দার অন্তরালে রইলেন হৈমবতী আর এক পাশে এরা।

বিরাট ঘড়ার ওয়ার্ডটা কেঁপে উঠল অকস্মাৎ ইঞ্জিন এসে জুড়ল ওয়ার্ডে। ওয়ার্ডটা হয় তো আবার টেনে নিয়ে যাবে।

—"মালগাড়ীটা টানতে মানা করুন আপনি। বেশী নাড়াচাড়া এখন মোটেই ভাল নয়।" নার্স বললেন তারিণীশংকরকে। একটা চাপা নিঃশ্বাস নিয়ে তারিণীশংকর নেমে পড়লো নীচে। দেখলো ওয়ার্ডের সম্মুখে ইঞ্জিন জুড়েছে।

ইঞ্জিন ড্রাইভারের কাছে গিয়ে তারিণীশংকর অনুরোধ করে—"একটু সবুর কর ভাই। মালগাড়ীটা টেনো না এখন।"

ইঞ্জিন ড্রাইভার তীব্র স্বরে প্রশ্ন করল—"কিউ?"

—"মেরা মরানা হো সকতা হোগে বাবা যায়। ডাক্তার বোলা।" কণ্ঠস্বরহীন স্বরে পরিষ্কার উত্তর দিলো তারিণীশংকর।

—"নেহী বাবুজী,—আপকো গাড়ী তুরন্ত ইয়াসে হটানে পড়েগা। দুসরা মালগাড়ী আ রহা হ্যায় এক লাইন পর। টিমন ঘাটোয়কা হুকুম হুয়া।"

নরম কম্বু খোলাটে হয়ে যায় তারিণীশংকরের চোখের সামনে। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো—আকস্মিক ইঞ্জিনের বাঁশী বাজিল। তারিণীশংকর ফিরে দাঁড়ালো এসে উঠলো ওয়ার্ডে। দেখলো কাপড়ের পর্দার আড়ালে নার্স আর দাই ব্যস্ত। শুনলো প্রসব যন্ত্রণায় আর্তনাদ।

ওয়ার্ড দুলে উঠলো।...

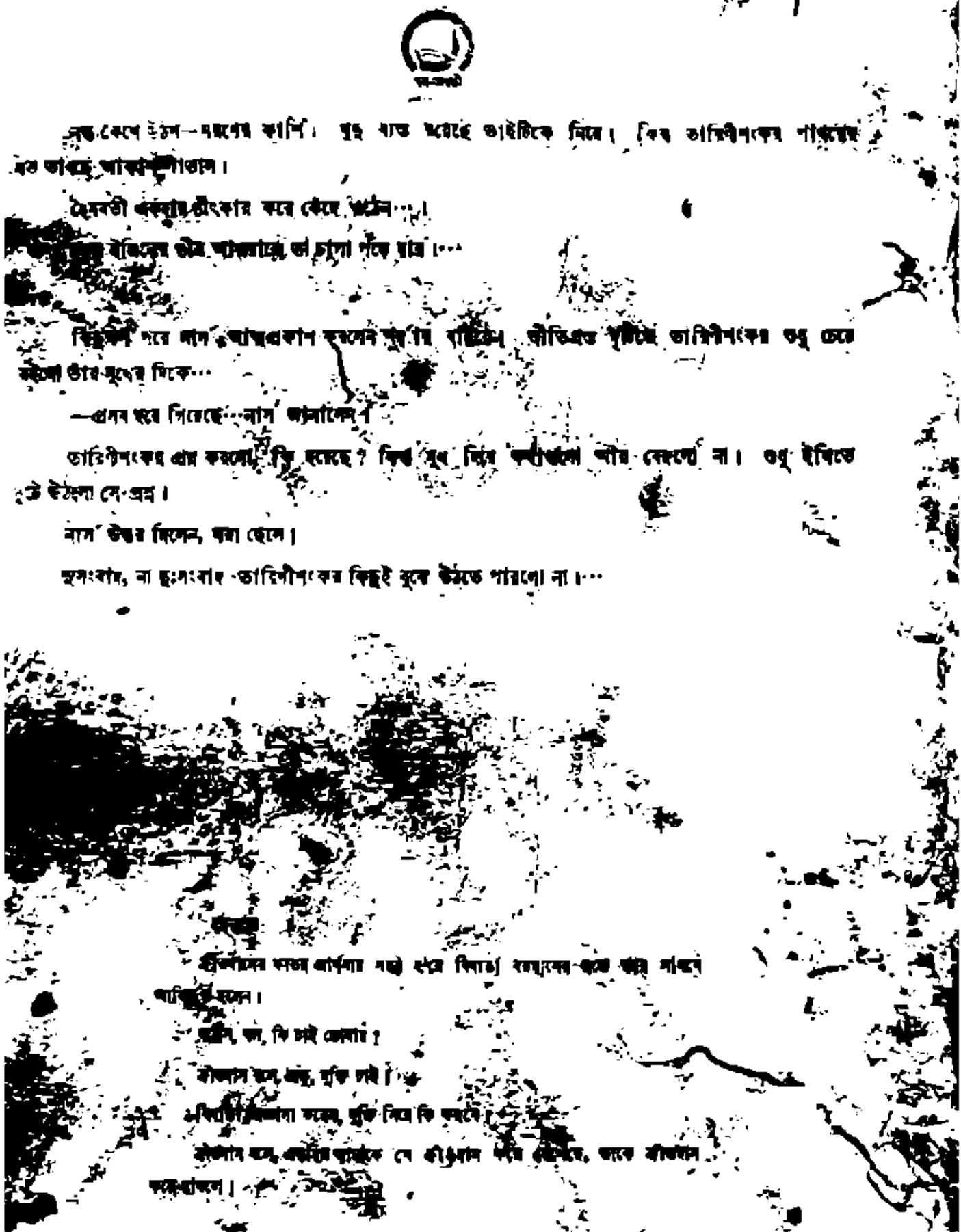

—প্রসব হয়ে গিয়েছে···নার্স জানালেন।
তাপিসীশংকর প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে?
নার্স উত্তর দিলেন, মরা ছেলে।
সুসংবাদ, না দুঃসংবাদ—তাপিসীশংকর কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।···

অথচ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এই শীতের দিনেও অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ঘরটা। ভেতরে পা দিয়েই মনে হল যেন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। ঘরময় মৃতের গন্ধ—মৃত্যুর তুষারস্পর্শ। একটা তীব্র শিহরণকে ঠেকানোর চেষ্টা করেও আমি ঠেকাতে পারলাম না—দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে শব্দ উঠলো আমার।

ডোমটা একটানে দেরাজের মতো একটা জিনিস খুলে ফেলল খড়্‌খড়্‌ করে। বললে, দেখিয়ে বাবুজী—মুহূর্তের জন্যে আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে রইল বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহটার দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় হাত পায়ের আঙুলগুলো কুঁকড়ে গিয়েছিল—কালো কালো কতগুলো আংটার মতো দেখাচ্ছে তাদের। বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন পাতলা দুটো সিল্কের পর্দা দিয়ে ঢাকা। শুধু মাথার ব্যাক-ব্রাশ চুলগুলো প্রায় তেমনি সযত্ন-বিন্যস্ত, এত বিপর্যয়েও তারা অনধিকারী হয়ে ঝুঁকে পড়ে নিটোল কপালটার ওপরে। অত বড় দীর্ঘকায় পুরুষটা কী অদ্ভুত ভাবে সংকীর্ণ আর সংক্ষিপ্ত হয়ে এই দেরাজটুকুর ভেতরে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে—আশ্চর্য!

মুহূর্তের জন্যেই আমি দ্বিধা করলাম। মুহূর্তের জন্যেই ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল আমার। তারপর শীতার্ত কাঁপা গলায় জবাব দিলাম, না, এ নয়।

বাইরে বেরিয়ে আসতে রাশি রাশি সূর্যের আলো ঝরে পড়ল আমার শরীরে। সূর্য। ওর আলোতে ফুল ফোটে, সকাল হয়, জীবনের স্নিগ্ধ-সুন্দর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। প্রচুর সূর্যকিরণে স্নান করে নিচ্ছে কলকাতা, অবগাহন করে নিচ্ছে তার সীমিত প্রাণ-প্রাচুর্যতায়।

আমার শরীরের ভেতরে এখনো সেই মৃত্যুর শীতলতা বয়ে যাচ্ছে শিউরে শিউরে, এখনো বাতাসের ভেতরে পাক খেয়ে ফিরছে সেই মৃত্যুর গন্ধ। এত রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন কেমন ধাঁধা লেগে গেল চোখে। মিনিটখানেক আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ফুটপাতের ওপরে। পথে মানুষের ভিড়। নির্মম নীলিম আকাশ, সূর্য জ্বলছে সেখানে। দু তিনটি মেয়ে হেঁটে গেল পাশ দিয়ে, বয়ে গেল মৃদু সুগন্ধের একটা উচ্ছ্বসিত ঝলক।

রাস্তা পার হয়ে এলাম। সামনে ফোয়ার। ট্যাঙ্কের নীলজল রোদে ভরা একটা তরল আকাশের মতো উঠছে ঝলমলিয়ে। এপাশে ছোট দেবদারু গাছটার ঘন সবুজ নতুন পল্লব। বাঁধানো ঘাটে একপাল কাকের স্নান চলছে নিশ্চিন্ত মনে, জলের মধ্যে নেমে পাখা ঝাড়ছে, ছোট শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে খুঁটছে

চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ির মতো ছাই রঙা নরম পালক, ঝুপ করে উড়ে গিয়ে বসছে রেলিঙের ওপরে। মর্গের মূর্তিটার নীচে কাঠের বাক্সে টানেবাবার আর মটরডালা সাজিয়ে বিমুচ্ছে সতেরো আঠারো বছরের একটা ছোকরা কেরিওয়ালা।

বেঞ্চিতে নয়, নরম ঘাসগুলোর ওপর বসলাম পা বিছিয়ে। দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে শীতের মিঠে রোদের টুকরো মুখের ওপরে এসে দুলে দুলে যেতে লাগল। ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরালাম একটা। দুপুরের আলোয় ঝিমন্ত ফোয়ারটার মতো কেমন ঝিম ধরছে, কেমন ঘুম ঘুম আবেশে ভারী হয়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা দুটো। মনে হচ্ছে আপাতত মনটা ওই নীল আকাশের মতো ফাঁকা, কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো কাজ করবার নেই আমার। অচ্ছন্দে এখানে এই ঘাসের ওপর ঘণ্টাকয়েক গড়িয়ে নিতে পারি আমি।

অথচ মাত্র পনেরো মিনিট আগেই মনে হচ্ছিল কত কাজ আমার! অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর, বিষাদ কাজ! মড়াটাকে সনাক্ত করতে পারলে লোকজন যোগাড় করতে হবে, করতে হবে গোড়ানোর ব্যবস্থা। তারপর পাঠাতে হবে অন্তত দুখানা টেলিগ্রাম। কিন্তু কী আশ্চর্য ভাবে আমি দায়মুক্ত হয়ে গেলাম। শুধু একটিমাত্র কথা, একটুখানি অস্বীকৃতি। শেষ মুহূর্তের এই কৃতঘ্নতার খবরটুকু কেউ জানবে না, পৃথিবীর কোনো লোকই না।

অলসভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমি ভাবতে লাগলাম এর পরে কী হবে শিবশঙ্করের? আচ্ছা, বেওয়ারিস মৃতদেহগুলো নিয়ে কী করে ওরা বাস্তবিক? গাড়ী বোঝাই করে পাঠিয়ে দেয় নিমতলার ঘাটে? নাকি হার্ট, লিভার, কিডনি—এগুলোকে কেটে কুটে নিয়ে ভিজিয়ে রাখে কাচের পাত্রে। আর তারপর একটা ধবধবে সাদা নির্মুত নরকঙ্কাল দিয়ে সাজানো হয় অস্থি-বিদ্যা? সেইটেই সব চেয়ে বেশি সম্ভব—অন্তত শিবশঙ্করের ক্ষেত্রে। ঐমন স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা বাঙালির মধ্যে দুর্লভ বললেও বেশি বলা হয় না। ওর পরিপুষ্ট নির্মুত হাড়গুলো নিশ্চয় বিদ্যার্থীদের মনে কাজের আলো বিতরণ করতে প্রভূত সহায়তা করবে। হঠাৎ হাসি এল আমার। প্রচণ্ড আর প্রবলভাবে বাঁচতে চেয়েছিল শিবশঙ্কর। বাঁচবে বই কি। অনেকদিন ধরেই বেঁচে থাকবে চক্ষুহীন কালো কোটরের অন্ধদৃষ্টি আগামী ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে।...

...অথচ। অথচ এই শিবশঙ্কর?

বেশ মনে আছে সাত বছর আগে যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল ওর সঙ্গে। তখন থাকি শোভাবাজারের একটা বাড়ীতে, খাই পাইস হোটেলে। দশটাকা ভাড়ায় একটা লম্বা ঘরে আমরা প্রাচজন পাঁচটা মানুষের বিছানা পেতে লম্বা হয়ে রাত্রিযাপন করি, দিবাযাপন করি কলকাতার রাস্তায় হেঁটে চাকরীর চেষ্টায় এবং পাইস হোটেলে দুবেলায় চারআনার ওপরে সতেরো পয়সা খরচ করবার আগে চারবার হিসেব করি। ট্রামে বাসের পয়সা জোটে না, তাই চোদ্দআনা দামের স্যাণ্ডেলে চড়েই প্রদক্ষিণ করি কলকাতা, গায়ের একটু জামাটিকেও নিজের হাতেই সাবানে কেচে আবিষ্কার করে নিতে হয়।

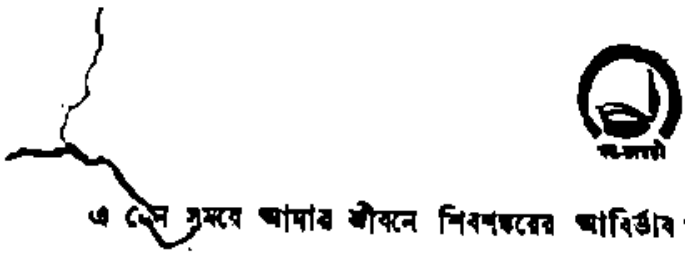

এ যেন সময়ে আমার জীবনে শিবশঙ্করের আবির্ভাব।

হোটেলে আমার পাশেই খেতে বসেছিল। হঠাৎ বিশ্রী চীৎকার করে উঠল একটা। সমস্ত ঘরটা কেঁপে উঠল, ক্ষুধাতুরদের হাতগুলো আটকে গেল ভাতের থালায়। একটানা মন্ত্র পড়ার মতো ঠাকুর আউড়ে যাচ্ছিল : শিখরেন তেরো নম্বরে ভাত দুপয়সা, চোদ্দ নম্বরে ডিমের লবঙ্গ-লতিকা, সাত নম্বরে—কিন্তু চীৎকারে থালা হাতে করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। একটা আশ্চর্য স্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে ফেলল ঘরটাকে। যেন পুরোদমে চলতে চলতে হঠাৎ বিনা নোটিশে থেমে গেল একটা রেলের ইঞ্জিন।

—বলি মশাই, এটা হোটেল না মানুষ মারবার কল?

চশমাপরা প্রোপ্রাইটার তথা ম্যানেজারবাবু নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছিলেন কাঠের বাক্সের ওপরে খাতা রেখে। ত্রস্ত স্বরে বললেন, আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন, হয়েছে কী?

—হয়েছে কী? তাকা আর কী! মাথায় চুল সাদা হয়ে গেছে, ভাতের ব্যবসা করে গোঁফ পাকিয়েছেন আর জানতে চাচ্ছেন হয়েছে কী?

ম্যানেজার শিবশঙ্করের প্রকাণ্ড শরীরটার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, চিনে নিলেন লোকটাকে। তারপর বিনীত স্বরে বললেন, আহা হা, রাগারাগি করছেন কেন, ব্যাপারটা বলুন না?

—ব্যাপার! এই দেখুন না এই চারটি তো ভাত দিয়ে গেছে, তার দাম আবার দুপয়সা। বলি মশাই, এভাবে চামারগিরি করলে পারা যায়? এমন করে যদি পয়সা আদায় করেন তাহলে কী খাই বলুন তো?

—কিন্তু ভাত তো আপনাকে নেহাৎ—ঠাকুর দুর্বল স্বরে সাফাই গাইতে চেষ্টা করল।

—তুমি থামো হে বাপু, বকর বকর কোরো না—চড়া গলায় একটা ধমক দিলে শিবশঙ্কর। তারপর ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে বললে, এই চারটি ভাত—এ হল নেহাৎ! এর কম খেলে মানুষ বাঁচে কখনো। বড় যন্ত্রের এই দেহটি মশাই, বহু তোয়াজ করে একে রাখতে হয়। এর ঠিকমতো খোরাক না জুটলে সেটা কেমন করে হবে শুনি?

তা বটে। বড় যন্ত্রের যে দেহ তাতে সন্দেহ করবার তো নেই। রাক্ষসের মতো চেহারা। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মাথার চুলগুলো আঁচড়ানো হয়েছে পাট করে। মোটা নাকের নীচে বেশ সমাদর করে ছাঁটা সরু গোঁফের রেখা। বেশে-বাসে অবশ্য কৌলীন্য নেই কিন্তু মশাসই চেহারায় সেটার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে।

ম্যানেজার বিব্রত ভাবে বললেন, থাক থাক, যেতে দিন। আমি কেটেই দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের অবস্থাটাও একটু বিবেচনা করবেন মশাই—

—আহা, বিবেচনা তো করবই। কিন্তু তার আগে এই দেহটির কথাও তো বিবেচনা করতে হবে মশাই। এইটির জন্যেই সব। অমন করে টুঁটি টিপে পয়সা আদায় করলে আর দেহধারণ করা যাবে না মশাই, দেহরক্ষা করতে হবে! কথাটা বলে নিজের বেয়াড়া রসিকতায় শিবশঙ্কর নিজেই হো হো করে হেসে উঠল।

হোটেল থেকে খেয়ে এক মুঠো মৌরি মুখে দিয়ে বেরিয়েছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে শিবশঙ্করও পথে নামল। বেশ খুশি মুখে একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, আপনি কোন্ দিকে থাকেন দাদা?

—এই কাছেই, কৃপানাথ লেনে।

—আমি থাকি আর একটু এগিয়ে, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে। চলুন, চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।……

……হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলাম। রেলিং টপকে ট্যাঙ্কের জলের মধ্যে গিয়ে সেটা পড়ল। বাঁধা ঘাটে কাকেদের স্নান হয়ে গেছে। ওদিকে ট্যাঙ্কের জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে এদিককার চেনা পাগলাটা। বেরিওলা ছোকরা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে অভ্যাসবশেই যেন একটা হাঁক দিলে: চাই চানাচুর মটরভাজা—

মাথার ওপরে ঘন দেবদারুর পল্লব একটা মিষ্টি খস্ খস্ আওয়াজ তুলছে। ছেঁড়া ছেঁড়া রোদ দুলে যাচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে।……

কেমন করে যে ওই কাঠখোট্টা গম্ভীর লোকটার সঙ্গে এত হৃদ্যতা জমে গিয়েছিল ভালো মনে পড়ে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অত্যাগ সহজো হয়ে দাঁড়ালাম আমরা। আমি চাকরী আর টিউশনির সন্ধানে চোদ্দ আনা দামের স্যাণ্ডেলটিকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলি আর শিবশঙ্কর কাটকা খেলবার চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘোরে পাটের বাজারে। কিন্তু অবস্থা দুজনেরই সমান—পাইস হোটেলের ধনুর্ভঙ্গ চর্বণ করা ছাড়া আর কিছুই জোটে না কপালে।

বড়লোকের পুরোণো ভাঙা বাড়ির গ্যারাজের পাশে একখানি অন্ধকার ঘর। সেই ঘরেই থাকে শিবশঙ্কর। দিনে আলো আসলেও চলে, কিন্তু শিবশঙ্কর আসায় না। বাপসা অন্ধকারের ভেতরে বসেই ফিস্ফাস্ করে কথা বলাবলি করি আমরা।

ঢক্কানোবটা খট্ খট্ করে বাজে। ছিনের বেলাতেই নির্ভীকভাবে আক্রমণ করে ছারপোকার নারায়ণ সেনা। শেষে আর না পেরে উবু হয়ে বসি দুজনে—দুটো বিড়ি ধরাই।

বিরক্ত বিষাদ গলায় শিবশঙ্কর বলে, না, আর পারা যায় না।

সংক্ষেপেই জবাব দিই আমি, হুঁ।

—বড় ঘরের এই শরীর।—আবছায়া অন্ধকারেও দেখি পরম স্নেহে নিজের দিকে তাকিয়ে আছে শিবশঙ্কর, দেখছে নিজের পেশল বাহু দুটো, দেখছে কবাটের মতো চওড়া বুকখানাকে: অনেক ছোলা খেয়েছি, ডেয় ডন্-বৈঠকী মেরেছি একসঙ্গে। তাইতেই না এমন শরীরটি তৈরী হয়েছে? কিন্তু নমুনা যা দেখছি, কিছু আর থাকবে না, এই কলকাতার ছারপোকা শালারাই চুষে মেরে মেরে সমস্ত। বলো কিহে, আমার রক্ত খেয়ে খেয়ে ব্যাটারা সব কচ্ছপের মতো হয়ে উঠছে, ওদিকে আমারও হয়ে এল।

আমি চুপ করে থাকি। এতদিনে ওর দুর্বলতাটা ধরতে পেরেছি আমি। নিজের শরীর সম্বন্ধে ওর অসাধারণ মোহ, অবিশ্বাস্য রকমের অনুরাগ। শুধু স্বাভাবিক শরীর বলে নয়, এ যেন ওর একটা সৃষ্টি, একটা

শিল্প। সমস্ত মন দিয়ে, ওর সমস্ত একাগ্র আর একাগ্র অনুরাগ দিয়ে এই শরীরকে ও গড়ে তুলেছে, শিল্পীর মতো আশ্চর্য সজাগ দৃষ্টি মেলে রেখেছে ওর শিল্পের পরিপূর্ণতার ওপরে।

শোঁ করে বিড়িটায় একটা টান মেরে শিবশঙ্কর—আগুনটা যেন এক লাফে সরে যায় ওর ঠোঁটের কাছে। বলে, দুত্তোর, যদি বড়লোক হতে পারতাম! খেতাম সেতা বাদ্যর মনকা, কাশ্মীরী আপেল আর পেশোয়ারী মেওয়া। ঠিক যেমনটি দরকার তেমনি তোয়ালে রাখতে পারতাম শরীরটাকে। কিন্তু বেলাংই মন্দ বরাত—তাই তাঙা খাটে পড়ে ছারপোকার কামড় খাচ্ছি। এদিকে হোটেলের ম্যানেজার ব্যাটা গলা কাটবার জন্যে ছুরি শানাচ্ছে, ওদিকে নাকের সামনে টাকার তোড়াগুলো ঘষর ঘষর করে বাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মারোয়াড়ী আর ভাটিয়াগুলো। নাঃ, শরীরটা আর রাখা যাবে না!

লম্বা চওড়া মানুষ, বাঘের মতো স্বাস্থ্য। শিবশঙ্করের জলজলে ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই আমার মনে সংশয় জাগত কোন্‌দিন ও একটা কেলেঙ্কারী করে বসবে।

গঙ্গার ঘাটে স্নান করছি দুজনে। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল।

—কী হল হে?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে—

বিকৃত যন্ত্রণাকাতর মুখে শিবশঙ্কর উঠে এল জল থেকে। তারপর মূর্ছিতের মতো এলিয়ে পড়ল পোস্তার ওপরে, অস্পষ্ট স্বরে বললে, আমায় বাঁচাও।

আতঙ্কে আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বললাম, অমন করছ কেন? কী হয়েছে?

শিবশঙ্কর বললে, পা।

তাকিয়ে দেখি ডান পায়ের নীচে ছোট একটা কাচের টুকরো বিঁধে আছে। একটু টান দিতেই কাচের টুকরোটা বেরিয়ে এল আর সেই সঙ্গে আকাশ ফাটানো একটা চীৎকার করে ধড়ফড় করে উঠে বসল শিবশঙ্কর।

বিরক্ত হয়ে বললাম, ছোট্ট একটু কাচ, তার জন্যে অমন তাক হাঁক করছ কেন?

—ছোট একটু কাচ? ওঃ—খন্তির আঘাত ফেলে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল শিবশঙ্কর, হঠাৎ বিহ্বল বিমূঢ় ভাবে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল স্তব্ধ দৃষ্টিতে।

—আবার কি হল?

প্রায় অবরুদ্ধ গলায় শিবশঙ্কর বলিল, রক্ত।

—হাঁ, রক্ত। তার জন্যে অমন ঘাবড়াবার কী আছে? পায়ে কাচ ফুটেছে, দু ফোঁটা রক্ত পড়বে না?

—দু ফোঁটা রক্ত—শিবশঙ্কর আবার পোস্তার ওপরে বসল, যেন ঝরে পড়ল দুর্বল হাঁটুর ওপর ভর রাখতে না পেরে। বললে, হাইজিন পড়েছ কখনো? কতটা পোঁটাই খেলে শরীরে এক ফোঁটা রক্ত হয় হিসেব রাখো তার?—উত্তেজনায় চোখমুখ তার লাল হয়ে উঠল: ভাবো ওই পাইস হোটেলে খেয়ে একফোঁটা রক্ত জমে শরীরে? আর এমনি করে যদি তা বেরিয়ে যায় দু ফোঁটা দু ফোঁটা করে, তা হলে আর কদিন?

আর কেউ হলে হেসে উঠত, কিন্তু শিবশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হাসতে পারি নি। আমি জানি, আমাদের কাছে যা মূল্যহীন, যা একান্তই নিরর্থক, সেইটেই সব চাইতে বড় সত্য ওর কাছে। ওইটুকু ফোঁটা রক্তকে হারানোর চাইতে কোনো বড় ক্ষতি কল্পনাও করতে পারে না শিবশঙ্কর। এ পাগলামি—এক ধরণের উৎকট ন্যাপামি ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু এই পাগলামি—নিজের শরীর, রক্তের প্রতি ওর এই মোহ একটা সর্বনেশে নেশার মতো সঞ্চারিত হয়ে আছে ওর রক্তে। এর হাত থেকে ওর পরিত্রাণ নেই, তাই অত বড় পাথরে গড়া অতিকায় শরীরটাকে নিয়েও বিন্দুমাত্র রক্তের অপচয় ও সইতে পারে না। একবিন্দু রক্তের মধ্যে যেন ও প্রতিফলিত দেখতে পায় মৃত্যুর রক্তাক্ত হাতছানিকে।···

ট্যাঙ্কের নীল জলে ডুব সাঁতার কাটছে পাগলাটা। ওদিকে কতগুলো ছোট ছোট নোংরা ছেলে ঢিল ছুঁড়ছে ওর ওপরে—পাগলা থেকে থেকে ক্রুদ্ধ অসন্তোষে চীৎকার করে উঠছে। ঠিক অমনি ভাবে যেন চীৎকার করত শিবশঙ্কর—যেন সমস্ত পৃথিবী ঢিল ছুঁড়ছে ওকে লক্ষ্য করে। একটা লাল রঙের কাটা ঘুড়ি উড়তে উড়তে চলেছে, কাছাকাছি পড়বে কোথাও, ছেলেরা পাগলাকে ছেড়ে হৈ হৈ করে তারই পেছন পেছন ছুটল। মাথার ওপরে দেবদারু পাতার মর্মর।

আঃ, ঘুম আসবে নাকি? এলে মন্দ হয় না। ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। এখনও যেন শরীর থেকে মড়ার ঘরের সে গন্ধটা মিলিয়ে যায় নি। কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে বুক ভরে নিতে চাইছি ঘাসের ঘ্রাণ, নতুন দেবদারু পাতার সৌরভ। আকাশে উজ্জ্বল নীলিমা—প্রশান্ত সূর্য জ্বলছে। পরিপূর্ণ জীবনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অতিক্রম করে যেতে চাইছি মৃত্যুর তুহিন-স্পর্শ শীতলতাকে।···

···তারপরে পাঁচ বছর কেটে গেল সময়। গেল যুদ্ধ, গেল দুর্ভিক্ষ। পাড়ে বাটার চটি করে সাহেবী দোকানের জুতোয় রূপান্তরিত হয়ে গেল তাও ভাল মনে পড়ে না। স্বাধীন ব্যবসা করে খাতে উঠেছি আমরা। পাইস্ হোটেলে আর খাই না, যাই গ্রাণ্ড্ হোটেলে, যাই গ্রেট্ ইষ্টার্নে। সন্ধ্যের সময় আর আসর জমে না গাঙ্গুলীর দোকানের দু পয়সার ঘুগনি আর দু পয়সার চা নিয়ে, এখন আমরা 'বারে' যাতায়াত করি।

বাড়ির জন্যে জমি খুঁজছি দক্ষিণের দিকে, গাড়ির জন্যে রোজ একবার করে ফোন করি চৌরঙ্গীর মোটর কোম্পানীগুলোতে। কবে আসবে নতুন মডেলের রয়্যাল্ ক্রাইস্লার। কোন্ শিপমেণ্টে পদার্পণ করবে উনিশশো সাতচল্লিশের ইণ্ডিয়েকার? আপাতত একটা বড় হোটেলে দুজনে জায়গা নিয়েছি, যথাসময়ে বাড়িঘর হলে গুছিয়ে বসা যাবে তখন।

এই তো মাত্র দশদিন আগে। একটু বেশি মাত্রায় 'ককটেইল' টেনে দুজনে যখন বেরুলাম, তখন দুজনেরই পরস্পরের কাঁধে ভর দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল। বেশ টের পাচ্ছি, রাস্তাটা যেন হঠাৎ সজীব হয়ে উঠে পায়ের তলা থেকে ছিটকে ছিটকে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে, দু পাশের বাড়িগুলো, আলোগুলো সব দুলছে এক সঙ্গে। অগত্যা একটা ট্যাক্সি ডাকলাম।

—কাঁহা জায়েগা হুজুর?

—মাঠে বেড়াব—হাওয়া খাব। চালাও রেড্ রোড্‌মে।

গাড়িটা যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি এসেছে, তখন হঠাৎ শিবশঙ্কর বললে, রোখো।

গাড়ি থামল। আমি বললাম, এখানে কেন?

—কিছু না, মাঠে বসব একটু।

মাঠের মধ্যে থেকে নিয়ে অন্ধকারে বসলাম দুজনে। আমি একটা সিগারেট অফার করলাম, শিবশঙ্কর বললে, নো:, থ্যাঙ্ক ইউ।

—কী হল তোমার?

—কী জানি—অদ্ভুত নৈরাশ্যভরা গলায় শিবশঙ্কর জবাব দিলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা। আজ আর কুয়াশা থাকলেও তারায় ভরা উজ্জ্বল আকাশ। গঙ্গার দিক থেকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, নেশার জড়তাটা যেন কেটে এল একটু একটু করে। নির্জন ভিজে মাঠে বাতাসের একটা ক্ষুব্ধ চাপা হাসির মতো আওয়াজ আসছে, চৌরঙ্গীর দিক থেকে ট্রাফিকের শব্দ আর রেড্ রোডে কোনো দ্রুতগামী মোটরের ক্বচিৎ চলাচল।

হঠাৎ বিচিত্র স্বরে শিবশঙ্কর বললে, কী হবে এতে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিসে?

—এই সব করে?—তারায় ভরা আকাশটার দিকে তাকিয়ে শিবশঙ্কর বললে, আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—আজ সকালে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম।—শিবশঙ্করের গলায় আওয়াজ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল: দেখলাম একটা ফার্ষ্ট ক্লাস সেলুনে রক্তের একেবারে ঢেউ খেলছে। উঃ, হরিব্‌ল্! খুন করে বিশ হাজার টাকার মতো নিয়ে গেছে।

—তাতে তোমার কী?

—না, কিছু না। পার্ক ষ্ট্রীটে দিন সাতেক আগে স্বামী স্ত্রীকে খুন করে, মানে বুকে ছোরা বসিয়ে ত্রিশ হাজার টাকার জুয়েলারী নিয়ে পালিয়েছে।

আমি অস্বস্তিভরে বললাম, কী হয়েছে তাতে? আর তুমিই বা পাগলের মতো বকছ কেন?

—এমনি।—শিবশঙ্কর চুপ করে গেল, হঠাৎ যেন শীতার্ত কাঠের বাতাসে কান খাড়া করে শুনল কাছের চাপা গলায় চক্রান্ত করবার মতো হিস্‌হাস্ শব্দ। দু হাতে আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরল শিবশঙ্কর: আমার ভয় করছে, ভয়ঙ্কর ভয় করছে।

ধমক দিয়ে বললাম, কী মাতলামি হচ্ছে, চলো এখন।

তারপর পরও রাত্রে আর ফ্লাটে ফিরল না শিবশঙ্কর। কালও না। খবরটা দেখলাম অফিসের কাগজে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কাছাকাছি রেড্ রোডের ধারে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। গলায় ধারালো একখানা ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। সনাক্ত করবার মতো পরিচয় পত্র তার কাছে ছিল না। ব্যবচ্ছেদের জন্য শব পাঠানো হয়েছে অমুক হাসপাতালে।...

.....দেবদারু শবুজ পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায় ঘুম এসে গিয়েছিল আমার। উজ্জ্বল আকাশ থেকে সূর্য রাশি রাশি হয়ে ঝরছিল আমার মুখের ওপর। হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে উঠে বসলাম আমি। হাত পা যেন ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে আমার। কেন শিবশঙ্করের মৃতদেহকে আমি সনাক্ত করলাম না, কেন পালিয়ে এলাম তখন চোরের মতো! পাছে আমিও শিবশঙ্করের মতো আত্মহত্যা করতে পারি বলে?

বিজাতীয় ?

শ্রীপরেশচন্দ্র মাইতি

এবার ধরিয়ারে এসে অবাক হয়ে গিয়েছি। এ সময় এর আগে বহুবারই এসেছি ভীষণ শীত, পরার জলও এতদিনে পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু এবার দেখছি বেশ গরম, জলও ঈষৎ—তা ছাড়া চড়া পড়ে সেই তীব্র স্রোতও যেন মন্থর হয়ে এসেছে, জলে নামতে আর ভয় করে না, মনে হয় না যে একবার ডুবলে আর রক্ষা নেই, চোখের পলকে বহুদূরে গিয়ে পড়ব। বহুদূরে চড়া জেগে গেছে, সেখে স্নান করার বড় অসুবিধা নেই। তবে আশা হয় যে ও চড়া কেটে ফেলবে—জলটাও অন্ততঃ জল পাওয়া যাবে খানিকটা। কারণ ইতিমধ্যেই পুণ্যার্থীরা কতকগুলি যন্ত্রে মাটি কাটতে দেখে গিয়েছি।

কিন্তু সব চেয়ে যেটা বিস্ময় ও অস্বস্তিকর—সেটা রূপ তীর্থ।

এই সময় এখানে অজস্র রঙীন্ত্রিত ঠাণ্ডা পড়ে যায়, প্রথম হাড়-কাঁপানো উত্তরে বাতাস বইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী পাখাবীদের ভীড় কমে আসে, সন্ধ্যা সাতটার সময়ে রাস্তাঘাট দেখে মনে হয় অন্ততঃ বিশাল চত্বর খাঁ খাঁ করছে—আটটার সময় খাবারওলারা পর্যন্ত চাটিবাটি গোটাতে শুরু করে। গঙ্গার ধারের বিশাল বাড়ীগুলোর অন্ধকার ঘুমপুরীর মত ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, কোথাও কোথাও রঙীন কৌতূহলের টিম টিম করে জলে এক আধটা আলো। শুধু আসল যাত্রী যারা দু-একজন, পুজোয় দুটিতে (অধিকাংশই রেলের কর্মচারী, পালে বেড়াতে আসে) সারা সন্ধিটা যারা বসে থেকে যায়, তাদের স্থির একদৃষ্টি কি যে খোঁজে তারিখ—কিসের প্রতীক্ষা।। অতিরে একবার ঘাটে আসে, বিরাট দৃষ্টিতে চারিদিক চায়, যেই দেখে পরার স্রোতধারা মধ্যে আছে—তাদের মুখে আবার হিরণ্ময় তেজ ফিরে আসে—সযত্নে মন্ত্র করে, রাস্তার ছোট ছোট কুকুর কুকুর ধর্মান্ধ হয়ে ওঠে।

এবার কিন্তু আসল সবচেয়ে ভাল। ধর্মশালার ভীড়, সরাই খানের যাত্রীতোলা, রাস্তাতে ভীড়—বড় বড় হোটেলগুলোতে পরের তারু ফেলে ডাকবার জায়গা করা হয়েছে। এরা সবাই পশ্চিম পাঞ্জাবের পলাতক, কেউ লুধিয়ানার মায়ার ফেলে, কেউ লেবপুরা—কেউ বা আটক থেকে। কত এসেছে তার হিসাব নেই, খবরের কাগজে দেখি—সাতাত্তর হাজার, স্থানীয় লোকের মত এক লাখের কম নয়—বরং বেশী। পথে ঘাটে বাজারে সিখ সিখ করছে। যারা বড়লোক তারা বুলন্দ খরচ খেয়ে, সিনেমা রেখে, তাস তাল সিক্ক ও সাটিনের সালোয়ার গুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অকারণ হাসি এবং আমাদের দিকে চেয়ে অকারণেই ঔদ্ধত্য, কিছুমাত্র কমে নি। অবস্থিতা ঠিক বিপরীত—তার ও কিছুটা গভীর।

যারা এখানে এসেছে তারা হয়তো কেউ ঠিক তাদের গ্রামে বা পল্লীতে আসল হওয়ার আগেই পালিয়েছে, শুধু মাত্র তফাতে। এরা পালাবার সময় তাদের দরিদ্র গ্রামবাসীদের কথা কেউ ভাবে নি, একথা এখনও মনে করে নি যে পালিয়ে বাইরে না এসে এক-একটা আড়ালে নিজেরা সম্ভবদ্ধ হলে হয় ত কারুরই এমন সর্বনাশ হত না। এরা পালিয়েছে তারাই, যারা ধনী, যাদের কাছে বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি ছিল। ঘুরে শুনে এসেছে এমনি শুনে, হয়ত বা শুনব বলেই এরা পালিয়েছে—যারা পা খেয়ে আসছে, তারা এখানে-সেখানে পৌঁছয় নি-সরহদ্দের দূরে পূর্ব পাঞ্জাবে কিংবা পাঞ্জাব-যুক্তপ্রদেশ সীমান্তে এসে সরকারী আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরে আশ্রয় পেয়েছে। এরা তারা নয়—এরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের পণ্য এনে এখানে কালোবাজার চালিয়েছে—সাবানটা সাবান, ইস্কের ব্লাটারী থেকে শুরু করে বস্ত্র পর্যন্ত নিয়ে এসেছে সঙ্গে, চড়িদর পাঁচগুণ দামে বিক্রী করছে। যারা তত ভাবতে পারে নি—তারা এখানে এসেও ব্যবসায়ে নেমে গিয়েছে। এ জিনিষটা সত্যিই প্রথম প্রথম আশ্চর্য করবার মত—ব্যবসা বুদ্ধি ও অর্থ উপার্জনের বুদ্ধিটা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করে না ওদের। যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই বসে গিয়েছে—তাদা বিস্কুট, গুড় নি, এইটুকু একটা বাক্সতে একসের আন্দাজ বুঝিলাম। (অর্থাৎ তার বেশী বহন) গেঞ্জি, চিনাবাদাম, চানাচুর—রাস্তার দু'ধারে সুদে ব্যবসায়ীর ভিড়।

এদের দেখে আমার খালি মনে পড়ে নোয়াখালি আর ত্রিপুরার আশ্রয়প্রার্থীদের কথা। আমাদের পাড়াতেই ত ছোটো-খিনটে বাড়ী ভোগাই করে রাখা হয়েছিল—যথাশক্তি প্রাণপণে তাদের আহার্য ও বস্ত্রেরও ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেই কোনদিন এক পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে দেখি নি। তারা শুধু এবং ঘুমোত, আর বিষণ্ণ, স্তম্ভিত অবস্থায় চুপ করে বসে থাকত দিনরাত। যা গেছে তাই শোকে [illegible] তাকে অন্তরে ফিরিয়ে আনবার চিন্তা বোধ হয় একবারও করে নি।

[illegible] এরাই সব চেয়ে পয়লা করেছে—ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির [illegible] চোরাগলি সব এদের নখদর্পণে ছিল। সে অভ্যাসটা [illegible] এরা ভুলে যায় নি এবং এখানে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে দামে নি, [illegible] বাজারের সেই কদর চড়া দামে বেচছে। উপযুক্ত ট্যাক্স-পেলে তারাও মোল ফিরে [illegible] ভরে তুলিয়ে দিচ্ছে। অথচ স্থানীয় লোকদের উত্তেজনা এদেরই জন্য—এদেরই মুখ থেকে নাকি বিকৃত অত্যাচারের কাহিনী শুনে। যারা এসে সেই-সব গল্প ক'রে তাতায়—যে সব ভয়ঙ্কর ঘটবার আগেই এরা পালিয়েছে। নইলে এত মাল-পত্র ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসতে পারত না।

এখানে এসে ওই সব গল্প শুনি আর পথে ঘাটে যে দু চার জনের সাক্ষাৎ পাই তাদেরই বলে [illegible] নাল আমেরই মত বিস্তর এনেছে। রক্তকুণ্ড ঘাটের বিশাল জনস্রোতে সার সার কাপড়ওয়ালা বসে গিয়েছে—সব ওরাদের কাটাকাপড়ের কিংবা রঙ-বেরঙের দোকান ছিল। আসবার সময় যতটা পেরেছে [illegible] নিয়ে আসতে পারে নি, একেবারে এক কাপড়ে বেরিয়েছে—এরকম লোকও নাকি বহু এসেছে কিন্তু আমরা আজ [illegible] অবস্থাটাই দেখি নি এখানে। এরা কেউই আসলে ধনী ব্যবসায়ী নয়, অল্প সময়ে না পালিয়ে এলে এদেরও [illegible] অনেককে মরতে হত কিন্তু আমাদের এখনই মনের অবস্থা যে সর্বপ্রকারে না বুঝে সাহায্য করতে আসাদের

হাত গুটানো, সহানুভূতি আদৌ না মেলে—তাই অনেক কথাই এদের কিছু কম করেই বলতে হয়। ও কোন কি? ওরই মধ্যে খুঁজে খুঁজে হঠাৎ একটি হিতৈষীর ভদ্রলোকের মেসে সেদিন যাওয়া।

কনুইয়ের বাজারে টাইফা করেসা ও ভেস্টি দিয়ে বসেছে, চটের উপর বিছিয়ে, একটি ছোকরা—বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে বড়জোর, কাবুলি পাজামার ওপর আদির সিল্কের লাট আর দামী একটা পুল-ওভার, দেখলেই সম্ভ্রান্তবংশের ছেলে বলে মনে হয়।

আলাপ ক্রমে জমিয়ে তুললুম। বাড়ির মেয়ে বাড়ী ফেরার পথে আমার ঘরে এসে বসল। ওর নাম রামশরণ লাল—গতিকই সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের ছেলে, বরং ধনী সন্তানও বলা যায়—ওর সব কাহিনী শুনে, বুঝলুম, এ-ই ঠিক যা-খাওয়া গলাতত্ত্ব, একবস্ত্রে পালিয়ে এসেছে।

রামশরণের বাপ মা নেই, ওর কাকারা খুব বড়লোক, তাঁরাই মানুষ করেছেন ওকে, লাহোর জেলে [illegible] পাসও করেছে। ওদের দেশ বহু পশ্চিমে—সীমান্ত প্রদেশের ধারে, পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমান্তে। সেখানে কাকা-কাকী ছিলেন, তাদের কি ঘটেছে তা সে জানে না। তাদের কথা বলতে বলতে ওর চোখ ছলছলিয়ে এল। বার বার একটা কথাই বলতে লাগল—কেউ জানত না যে আমি তাঁদের ছেলে নই, তাঁরা আমাকেও কখনই জানতে দেন নি।

কাকা-কাকীর খরচ যাথা কেন ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি তাও শুনলুম।

যদিও ওদের অবস্থা ভাল ছিল, তবু কাকার ঘর বসে বসে খাওয়ার লোক ওরা নয়। রামশরণও তাতে রাজী হয় নি। সে লাহোরে এসে দোকান খুলেছিল একটা—ইলেকট্রিক [illegible] আলো-টোভ-তার এইসব দোকান অনেক উঠেছিল নাকি খুব। তিন বছরের মধ্যে ওর নিজের সমস্ত খরচ চালিয়েও মূলধন তিনগুণ করে ফেলেছিল, ব্যাঙ্কেও হাজার কয়েক টাকা নগদ জমা ছিল। অবশ্য সংসারে ওকে কিছু পাঠাতে হয় নি এমনই, ওটা নজর হয়েছিল—তা ছাড়া সে নিজে বিয়ে করে নি, কাকা-কাকীর বহু অনুরোধেও—ওর বিশ্বাস বিবাহিত মানুষের পক্ষে ব্যবসার কোন দিকেই উন্নতি করা সম্ভবপর নয়।

[illegible] সময় [illegible] ছেলে চলে আসতে বলেছে। [illegible] টাকাও কিছু নিয়ে আসতে পারে নি। [illegible] বিশ্বাস করে নি। আরও চিরকালী-একই বয়ে নিলে ছিল রইল—এক স্যাকি, [illegible] তাদের পরস্পরের পর হয়েছিলেন তা সে কিছুতেই সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে নি।

মোটা সহ হয় তখন ভেবেছিল—এ সাধারণ ঘটনা—যেমন এর আগেকার অত সহজ বিশ্বাস হয়ে গেছে, তারপর লোকের মুখের ভাষা। অবশ্য তার এই অতি বিশ্বাসের কারণ একটা ছিল বৈকি! আমার-[illegible]-বানের পাশেই ছিল আন্তোক হোমেনের বইয়ের দোকান। মেও অল্পবয়সী—তারই একবয়সী। দুজনে ছিল সহপাঠী, একই সঙ্গে কলেজ ছেড়ে ব্যবসায়ে নামে। পাশাপাশি দোকান অথচ এক পয়সার ব্যবসায়ী নয় বলে কোন ঈর্ষার সম্বন্ধও ওদের সম্বন্ধকে ম্লান করতে পারে নি। আন্তোকের বাড়ীতে যে যাতায়াত ছিল—ওর বাবা মহীয়সী বৈজ্ঞানিক লোক (আজও সেই ধারণা রামশরণের যায় নি), তাঁর সেই সৌম্য বিদ্বান্ চেহারা,

ইট সাদা দাড়ী আর প্রাণখোলা উদার হাসির মধ্যে এতটুকু মালিন্য কিম্বা শঠতা ছিল না। আল্তাফের মাও ওকে খুব ভালবাসতেন। সে বাসা করে থাকে, চাকরের হাতে ভাল খাওয়া হয় না বলে আল্তাফের বাড়ীতেই ওর মা জোর করে ওকে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়াতেন। ফলে অর্ধেক দিনই তার বাসায় খাবার নষ্ট হত। রোজগার করে ওরা দুজনে হয় সিনেমা নেত্র নয়ত আল্তাফের বাড়ী যেত—আর আল্তাফের বাড়ী গেলেই ওকে খেয়ে আসতে হ'ত। ওরা যে বিধর্মী—ওরা যে ওর আত্মীয় নয়, এমন কথা কোন দিনও রামশরণের মনে আসতে পারে নি।

সুতরাং খাস লাহোরে যখন দাঙ্গা বাধল তখনও ওরা ঠাঁই করে নি—হাত ধরাধরি করে আল্তাফের সঙ্গে বেড়িয়েছে সে প্রকাশ্য রাস্তায়—সমস্ত ভয়কে ও চক্রান্তকে উপেক্ষা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এল, যখন আর আপত্তাটাকে স্বীকার না করে উপায় রইল না। ব্যাপারটা যে সহজে মিটবে না—এই সত্যটা প্রকাশ হয়ে উঠল। ধর্মের সমুদ্রমন্থনে যে সাম্প্রদায়িক বিষের হলাহল উঠেছে তা বোধকরি কোন পক্ষেরই সহ্য করা সম্ভব হবে না—নীলকণ্ঠের মতই একজন অসাধারণ শক্তিশালী কাউকে প্রয়োজন হবে তা পান করতে। এতদিন যারা বলতে ওরা যা ধারণা ছিল তা কোনটার সঙ্গেই যখন এর চেহারা মিলল না—তখন রামশরণের মুখ শুকিয়ে উঠল। ক্রমশ ওর বাসায় যাওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন আল্তাফের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলে। ওর চাকরকে নাকি ভয়ে মেরে ওর বাসায় তালাবন্ধ করে রেখেছে—এই খবরও কানে এসে পৌঁছল। তারপরের দিন ওর দোকান লুঠ হ'ল।

এইবার আল্তাফও ভয় পেয়ে গেল। তাহলে কি ও ব্যাপার থামবে না এখন?

তার সময় একদল হাঙ্গামাকারী আল্তাফের বাড়ী ঘিরে দাঁড়াল, বললে, 'তোমাদের বাড়ীতে একটা [illegible] বের করে দাও।'

আল্তাফ বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বলে, 'কেউ নেই আমাদের বাড়ীতে—বিশ্বাস করো।'

'আমরা বিশ্বাস করি না। তোমাদের বাড়ীর ভেতর খুঁজে দেখব।' তারা বলল।

তখন বেরিয়ে এল মহীউদ্দীন। প্রবীণ বর্ষীয়ান মুসলমান, প্রশান্ত মুখে মিষ্টিকথা বলতে জানেন। বললে, 'তোমরা বিশ্বাস করো। সে চলে গেছে। ঈশ্বরের নামে বলছি।'

ওঁকে তারা কিন্তু কেউই বিশ্বাস করল। মহীউদ্দীন নিশ্চয়ই মিছে কথা বলছেন—এই বলতে বলতে তারা ঢুকে গেল। মহীউদ্দীন সেইখানেই অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরে এসে বললেন আল্তাফকে, আর দেরি করলে বাড়ীটাকে বাঁচানো যাবে না। আজ রাত্রেই যেমন করে হোক ওকে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

সেই রাত্রেই ওর মায়ের মূল্যবান বোরখায় রামশরণকে ঢেকে নিজের টাঙ্গায় করে সহরের প্রান্তে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় এনে ছেড়ে দিয়ে গেল আল্তাফ। বিদায় নেবার সময় হাতের মধ্যে প্রায় পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল মা ছলো চোখে বলে গেল, 'এটাই রাখো ভাই—আবার সময় সুযোগ পেলেই পাঠাবো।'

যদিও সে টাকাও রামশরণ নিয়ে আসতে পারে নি। পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমান্ত অতিক্রম করার সময় ঐ টাকাই ঘুষ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়েছে। তারপর আর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও তার সম্ভব হয় নি। চিঠি দিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি যে কোন দিন সেখানে পৌঁছবে এমন আশা রাখে না। তারা কোথায় আছে, ভাল আছে কিনা তাও জানে না বেচারী।

ওর কাহিনী শেষ করে রামশরণ হাঁটুর মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা আজ আসি তাহলে বাবুজী—রাম রাম!' বলে সেদিনের মত বিদায় নিলে।

এরপর রামশরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার বেড়েই চলল। সকাল বেলা সে বাজারে আসার বেশ্ত—বিকাল-বেলা কাবুলী হোলার ঘুগ্‌নি। অবসর সময়ে অর্থাৎ দুপুরে কিংবা রাত্রে আমার এখানে আড্ডা দিতে আসত। নানা গল্প বলত—ওর ছেলেবেলাকার গল্প—কাকা-কাকীর স্নেহের কথা, কলেজ জীবনের কথা। নানা প্রসঙ্গে ওর স্মৃতির ভাণ্ডার উজার করে দিত। মনে হ'ত সেই সময়গুলো ওর মন বর্তমান দারিদ্র্য ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত হয়ে অতীতের আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে। আমিও ওকে উৎসাহ দিতাম, আমার প্রেরণা ঘুরে ফিরে ওর বাল্য-কৈশোর যৌবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করতাম। ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনাও চলত কখনো কখনো—যদি ওর টাকাকড়ি ব্যাঙ্ক থেকে না পায় ত কী করবে চাকরীর চেষ্টা দেখবে, না এই ভাবেই ছোটখাটো ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আবার উন্নতির চেষ্টা দেখবে প্রশ্ন করলে সে কোন দিন বলত, চাকরী? কখনও না। এই কয়েদা বেচে দিন চালানো তাও ভাল!

হঠাৎ একদিন আবার অত্যন্ত শুষ্কমুখে রামশরণ চুপচাপ এসে আমার খাটিয়ায় বসল। চোখ লাল—জবাফুলের মত। নিদ্রাহীন রোদনে চোখের দু-পাশের শিরা ফুলে উঠেছে।

'কী হ'ল ভাই?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'ব্যাপার কি?'

রামশরণ খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'আজ খবর পেলাম আমার চাচাসাহেব, মহাউদ্দীনসাহেব মারা গেছেন। আত্মীয়টি সত্যই ছিল, সেও বাঁচিয়াছিল—বেঁচে আছে কিনা জানি না।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমিও চুপ করে রইলাম। কী বলব ওকে—কোই হ্যায় কথা।

ও ঐ কটা কথা বলেই আবার চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবার পর বলল—একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করলে না।

আমিও ওর মনের অবস্থা বুঝে তখন কোন কথা কইলাম না কিন্তু পরের দিন সকালে ওকে যখন বাজারেও দেখতে পেলাম না তখন একটু চিন্তিত হয়ে উঠলাম বৈকি। হ'ল কি ছোকরার? অসুখ কোথাও বেধে গেল নাকি? দু একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—তারাও কেউ বলতে পারলে না। ওর বাসায় গিয়ে খোঁজ নিলাম—সেখানেও নেই।

কী হল ওর ভাবছি, এমন সময় এগারোটা নাগাদ আহসান প্রান্তভাবে এসে বসে পড়ল আমার চৌকীতে —একটু জল খাওয়াও বাবুজী।

তাড়াতাড়ি একটু লাড়ু আর জল দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলে সকালে?'

'কুশাবর্ত ঘাটে। তর্পণ করতে।' সংক্ষেপে উত্তর দিলে রামপরশ।

মনে পড়ল এটা পিতৃপক্ষ যাচ্ছে। ওরা আমাদের মত নিত্য তর্পণ করে না। যে তিথিতে যে আত্মীয় মরেছে পিতৃপক্ষের সেই সেই তিথিতে সেই আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করে। আজ বোধ হয় তেমনি কারুর দিন ছিল।

সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন করলুম, 'কার শ্রাদ্ধ করলে? বাবার?'

'না' বলে আহসানও চুপ করে রইল সে।

ওরও যে কথা কইতে চায় না—কান্নাকে বাঁধা বোধ হয় এখনও সামলাতে পারে নি।

একটু পরে কেমন যেন একটা অব্যক্তি-বোধ করার ভঙ্গিতে নড়ে চড়ে বসল। বললে, 'আচ্ছা বাবুজী, একটা কাজ আজ করে বলোনা ত'ন না ত?'

'কী কাজ হে' কৌতূহলী হয়ে উঠি আমি।

চাচাসাহেব মারা যেতেন মত চতুর্দশীতে। আজও চতুর্দশী, হঠাৎ কাল রাত্রে মনে পড়ে গেল। তাই তাই ওঁর শ্রাদ্ধ করে এলাম। পুরী কিনে একটি ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দিয়েছি। চাচাসাহেবের অশুচি [illegible] এক পোয়া অশুচি খাইয়েছি। এখন তার মনে হচ্ছে তাঁর আত্মা কোন অপরাধ [illegible] সেই শ্রাদ্ধ করে এসেছে ও হিন্দুতে?

[illegible] কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সামলে নিলাম।—"দোষ কি? ওঁরা এখন যে লোকে [illegible] জাতির নেই, ধর্মও নেই। ঈশ্বরের কাছে ত সবই সমান। 'ওপা' যদি বলে [illegible] জন্মেছে—লোকাচারে। সেখানে আবার লোকাচার কি?"

[illegible] করে একটা নাড়া দিয়ে বললাম, "কিন্তু বোধহয় নি বছ ওঁর [illegible] ঘরে যেখান থেকে দাঁড়িয়েছিই [illegible] তিনি এখন যেখানে, সেখানে ভাদ্রের দ্বিতীয়া পৌঁছ [illegible] তর তেরোর শ্রাদ্ধ। সেটা তিনি ঠিকই গ্রহণ করবেন—প্রপৌত্রের অজ্ঞাতে এবার ক্ষমা ও করুন না [illegible] বাঁধানো আবছা হয়ে যেন চাঁদ হাসল।

ছাড়াছাড়ি

এমন যন্ত্রণায় আর পারা যায় না! আবার কলহ শুরু হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে না হইতে তর্ক করিয়া একেই মাথাটা গরম হইয়া আছে, তার উপর বাহির-কলহের এই অনধিকার চর্চা। কে কাহার সহায়ক হইবে না, তা বলাই বাহুল্য।

আমি অনেক সময় ভাবিয়া অবাক হই, নিতান্ত নিরীহ অতো বিনয়ী ব্যক্তির পক্ষে এতটা গর্জন করা সম্ভব হয় কি করিয়া। তবে উঁহার গর্জন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া রাজকুমারীনিন্দিত স্বরের যে ধ্বনিটি উহার সহ-বিগর্জন পুরস্কৃত পর্যন্ত উদ্ধার করিয়া চাকে, তার তীক্ষ্ণতা ভেদ এবং বেপথু-হু, অনেক উচ্চগ্রামের তানসেনী বক্তির এবং তার চিক দিকের ইঁটের বাড়িগুলির বাসিন্দাদের কাহারওই কোনও শঙ্কিত থাকার কথা নয়।

নিতান্ত নিরীহ ও তার স্ত্রী কেবীর এই প্রাত্যহিক কলহের দাপটে খুব ঘিও ঘা পাইয়া চেঁচাইয়া ওঠে; খুবক-সভার কলমাটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইকনমিক্স কোর্সের সাড়ে চারটে থেকে আর খুব আসে না এবং অন্যান্যের কর্ণ-পটহ ভরভর নিশ্চয় ভোঁতা হইয়া থাকে।

এ-অবস্থায় পাড়ার মেরুবর্গ যে জাগ্রত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি। তাঁহারা বহির্গত হন (এবং নাকে কাপড় চাপিয়া) বস্তিতে ঢুকিলেন, এবং বাহাতে মেয়েগুলার হাত দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা-কল্পে হস্তক্ষেপ করিলেন।

নিতান্ত স্ত্রী কেবী বলিল, 'মরণ আমার, ভাতারখাকী মাগী! নিজের বাড়িতে বসে' যা মন তাই করবে, তা পর কেন্দোরোগের ওসব কাজে কেন, তাতে তোমার কেন ধুনি? ভেবেছ তারপর আর পরা তোমায় [illegible]

[illegible] বেরা

[illegible] বলে, 'আমা বা, রাতে কি সভিয়ন্ত, ওরা হলেন পাড়ার মাননীয় ভদ্রলোক। একটা বিচার [illegible] করে' যেন তো বিচ্ছি কিছি কাজ-কাণ্ডনেস্তির পরাই ভবে' মরতে হয় না...'

ভদ্রলোকের অপমানের প্রতি কোনোই ভ্রূক্ষেপ করিল না। কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা তুলিয়া কহিল, 'ওদের পাড়ার ভদ্রলোক যে। পর-স্ত্রীর চাল-চলনের ওপর নজর রাখতে যাদের সময় নেই, খালো বাড়ি তাদের ঘুমে। তোর ইচ্ছে যায় তো তুই ভদ্রলোকের পা চাটি গিয়ে, তা বলে রাস্তার লোকের সম্মুখে তুই আমাকে অপমান করবি?'

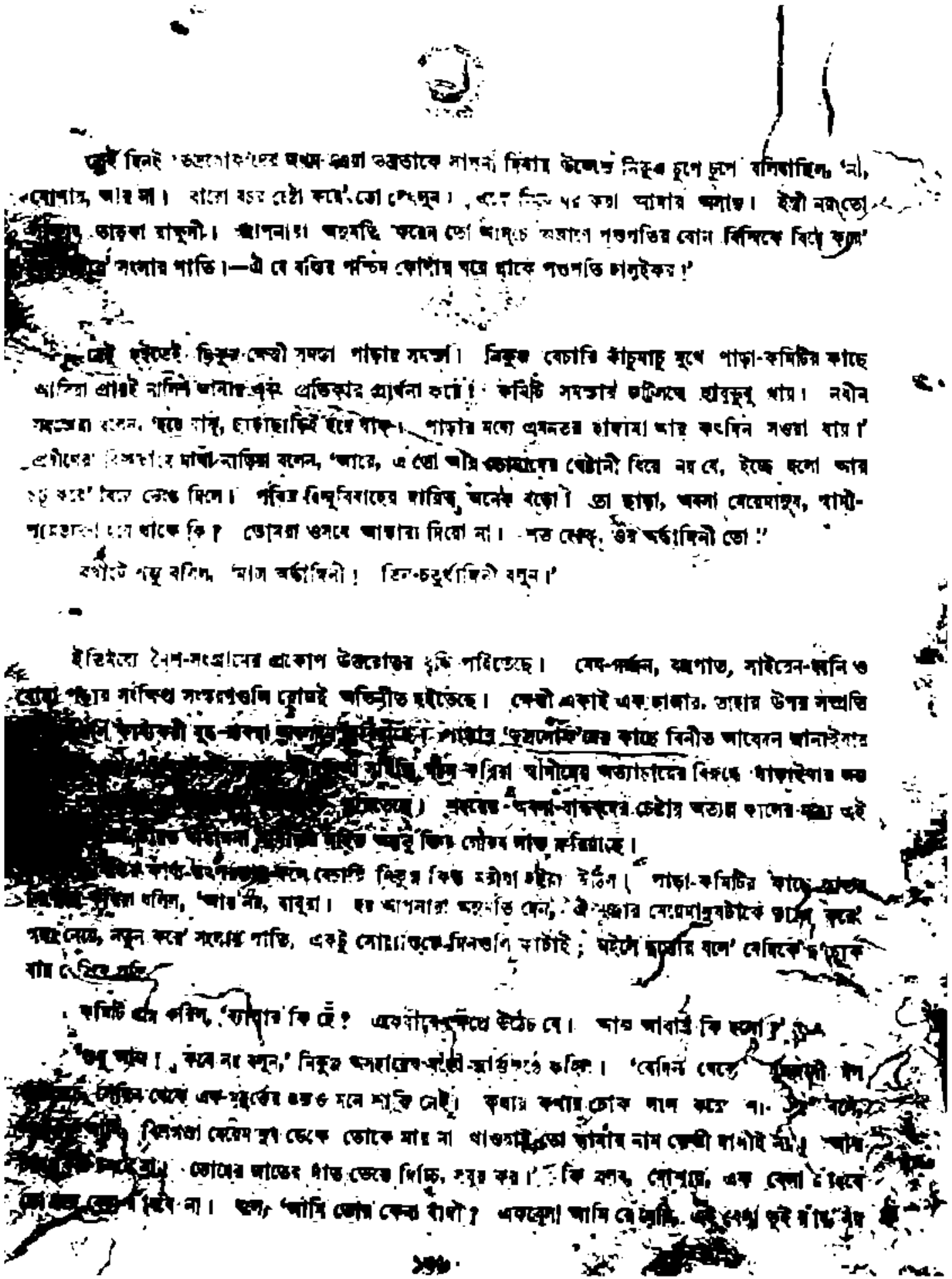

সেই দিনই 'ভদ্রলোকদের অধম-প্রেরা ভদ্রতাকে সাদর বিদায় উদ্দেশে নিষ্ঠুর চুপে চুপে বলিয়াছিল, 'না, মোশায়, আর না। বাপো ঘর ছেটো করে' তো দেখলুম। এবার নিজ ঘর করা আমার আসছে। ইস্ত্রী নয়তো ঠাকুরুণ ভাইরা যাদুমণি। আপনারা অনুমতি করেন তো আমরা পশুপতির বোন বিন্দিকে বিয়ে করে' নিয়ে সংসার পাতি।—ঐ যে বস্তির পশ্চিম কোণার ঘরে থাকে পশুপতি চালুইকর।'

সেই হইতেই ছিনুর দেবী সমতা পাড়ার সমস্যা। নিকুঞ্জ বেচারি কাঁচুমাচু মুখে পাড়া-কমিটির কাছে আসিয়া প্রায়ই নালিশ জানায় এবং প্রতিকার প্রার্থনা করে। কমিটি সমস্যায় জটিলতে হাবুডুবু খায়। নবীন সভ্যেরা বলেন, 'হয়ে যাক্, ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক্। পাড়ার মধ্যে এমনতর হাঙ্গামা আর কতদিন সওয়া যায়!' প্রবীণের বিজ্ঞতায় মাথা-নাড়িয়া বলেন, 'আরে, এ তো আর ভোমাদের ছোটানী বিয়ে নয় যে, ইচ্ছে হলো আর ছুঁড়ে' বিয়ে ভেঙে দিলে। পবিত্র বিন্দুবিবাহের দায়িত্ব অনেক বড়ো। তা ছাড়া, অবলা মেয়েমানুষ, স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে থাকে কি? তোমরা ওসবে আস্কারা দিয়ো না। শত হোক্, ওর অর্দ্ধাঙ্গিনী তো!'

কথাটা শম্ভু বলিল, 'আজ অর্দ্ধাঙ্গিনী! তিন-চতুর্থাঙ্গিনী বলুন।'

ইতিমধ্যে বৈশ-সংগ্রামের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মেঘ-গর্জন, বজ্রপাত, সাইরেন-ধ্বনি ও বোমা পড়ার সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলি প্রায়ই অভিনীত হইতেছে। দেবী একাই এক হাজার, তাহার উপর সম্প্রতি [illegible] পাড়ার 'ভলেন্টিয়ার'দের কাছে বিনীত আবেদন জানাইবার [illegible] পতি, পত্নী-পরিত্যক্ত স্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য [illegible] সভ্যদের-অবলা-বান্ধবদের চেষ্টায় অত্যন্ত কালের জন্য এই [illegible] অবলা [illegible] কিন্তু কিছু গৌরব লাভ করিয়াছে।

[illegible] কাণ্ড-উপলক্ষ্যে বেচারি ছিনুর কিন্তু মরীয়া হইয়া উঠিল। পাড়া-কমিটির কাছে আসিয়া [illegible] বলিল, 'আর নয়, বাবুরা। হয় আপনারা অনুমতি দেন, ঐ মুক্তার মেয়েমানুষটাকে তাড়িয়ে ঘরে নিয়ে নেয়, নতুন করে' সংসার পাতি, একটু সোয়াস্তিতে দিনগুলি কাটাই; নইলে ছাড়ান বলে' বেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে যাই।'

কমিটি প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি হে? একেবারে হুমকি যে। আজ আবার কি হলো?'

'কিছু আজ্ঞে নয়। তবে বলুন,' নিকুঞ্জ অসহায়ের করুণ আর্ত্তস্বরে কহিল। 'যেদিন থেকে মুক্তাদাসী এল, সেদিন থেকে এক-মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি নেই। কথায় কথায় চোখ লাল করে' বা 'ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব' বলে' [illegible] বিলকুল মেয়েমানুষ ভেবে তোকে মার না খাওয়াই তো তাহার নাম দেবী দাসীই নয়। আমি [illegible] তোমার দাতের দাঁত ভেঙে দিচ্ছি, সবুর কর।' কি বলব, মোশায়, এক বেলা টিকে [illegible] হবে না। বলে, 'আমি তোর কেনা বাঁদী? একজোড়া আমি যে খাটি, এই বলে দুই হাঁড়ির [illegible]

উপোস কর্!' শুনলেন, এক্ষুণি ওঁরা শুনলেন আমি সারাদিন মরুভূমি-কলে গতর খাটিয়ে আসি, তার কি? কিন্তু ধমক দেবার তো নেই। মেয়ে-গুণ্ডার ভয় দেখিয়ে চুপ্ করে' রেখেছে। লজ্জা করে' থাকবেন, সত্যি কথা ঝেড়ার তেমন জোরে হাঁকডাক পর্যন্ত করতে পারি নি। অথচ পাড়ার মুরুব্বি-সভার বাবুদের কাছে যখন বলতে গেলুম, 'আসুন মাতব্বরা, পুরুষের হয়ে আপনারাও শাসন,' তখন তাঁরা হেসে গড়িয়ে পড়লেন।'

ইহার পরের রাত্রেই পূর্ব্বঘটিত বিশেষ গণ্ডগোলটি শুনিতে পাইলাম। নিবুজের গর্জ্জনটা ক্রমে আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। একটা ছোয়ান পুরুষমানুষ এমন আর্ত্তস্বরে চেঁচাইতে থাকিলে ব্যাপারটা যে অতীব গুরুতর হইয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। পাড়ার মাতব্বরেরা বিছানা ছাড়িয়া বস্তির দিকে ছুটিল। মেয়ে-গুণ্ডা লাগাইয়া মেরে নাই তো?

নিবুজ কুঁকিতে কুঁকিতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কমিটি-প্রেসিডেন্টের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'বাঁচান কর্ত্তা, আমাকে বাঁচান। কায়দাবাজী ছুরির ঘায়ে আমার গলাটিপে ধরেছিল। বহু বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু একবার চেয়ে দেখুন। কাপড়ে' মাল তুলে দিয়েছে।'

হাতের ক্ষত এবং রক্তে ভিজা নিবুজের কাপড়ের খুঁট দেখা করিয়া কমিটি স্তম্ভিত হইয়া গেল।

নিবুজ বলিল, 'আর না। যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনারা দয়ার দাসীকে ত্যাগ করবার অনুমতি দেন তো ভালো, নইলে আমি নিজ দায়িত্বেই ওকে ত্যাগ করব…'

নিজের আচরণের তীব্রতায় যেন এতক্ষণ কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, এইবার সে-ও কোমরে কাপড় জড়াইয়া আগাইয়া আসিল। তীব্র নিনাদে বলিল, 'ত্যাগ করবেন! ওরে আমার ত্যাগ করনেওলা রে! তোকেই আমি ত্যাগ করলাম। তোর মতো চামার সোয়ামীদের ত্যাগ করার প্রস্তাব আমাদের নিখিল ভারত সমিতি থেকে গ্রাণ হয়েই আছে। তোর মতন ভাতারের সঙ্গে এতদিন ঘর করেছি, এই তোর বাপের ভাগ্যি। 'দূর' বললেই তোর মতো ভাতার আমি দশগণ্ডা জোটাতে পারি!—হুঁ, এইবার ঐ বিধি মতেকখোয়ারীকেই ডিক্রি কর্ দিয়ে। আমার স্বর্গ তোর বৌকরায় সাধি নেই…কিন্তু পাড়ার এই মুরুব্বিরা এইখেনে দাঁড়িয়ে কি দেখছে? ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মিটমাট করে দিতে বলি না বুঝি? ওদের সঙ্গে দেওয়াটা আমিই স্বীকার করছি।'

সেই রাত্রেই নিবুজ আর কেষ্টিতে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। পাড়াটা নিস্তব্ধ হইয়াছে। আমি তো যে যাহার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া দেখি, নিবুজ আনাড়ি হাতে রান্নার যোগাড় করিতেছে; ঘর বাঁট দিয়ে ঝাকাইয়া পরিতেছে। রাত্রে ভাত খাইয়া কাজে চলিয়া যায়। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রান্নার এলাইয়া পড়ে। রাঁধিতে দেখি না। হয় তো বাহির হইতে খাইয়া আসে। উত্তেজনা নাই, গর্জ্জন নাই, লাফালাফি নাই। প্রয়োজন না থাকায় যেন সকল অতিরিক্ত জীবনীশক্তি কেহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

একদিন তাহাকে রাস্তায় দেখিয়া বলিলাম, 'কি নিতুদা, আর বিয়ে টিয়ে করলে না? বিন্দির কি হলো? অত জায়গায় তার বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?'

'আজ্ঞে না, সে আছে,' নিতুদা সঙ্কুচিত ভাবে কহিল। যে কাজ আমি নিজে পারি সে তা সেই এক বছর বিয়ে থাকে...'

'তবে আর আটকাচ্ছে কিসে? তাকে বিয়েই করে' ফেল না।'

'ছেড়ে দেমোশায়!' নিতুদা লজ্জায় বেঁকিয়া উঠিয়া বলে। ওকে কি আমার সঙ্গে মানায়। আমার সঙ্গে মানাতে হলে গিয়ে আপনার—অত জোরু, বাবুমোশায়, যাকে বছর বার ছেড়ে একলা ঘর করেচি তার ওপর মরণ পড়ে' থাকবেই।—খুব মেরাক্ করিয়ে তো বিয়েছিলি! বলে, 'তু' বললেই তোর মত ঘরগণ্ডা ভাতার জোটাতে পারি!' এখন পারলি নে? অথচ ভাতবে-কিন্তু মচকাবে না।—একটা চিঠি লিখেচে। লিখেছে, 'তোর মতো নেমকহারাম মুখপোড়ার কাছে আমি জন্মে ফিরে' যাব না। না খেয়ে শুকিয়ে মরি, সে-ও ভালো।'—তা হলেই বুঝতে পারচেন, বাবুমোশায়, কঁদুনে পড়েচে। বলে, অত ভাতার জোটাব! বারো বচর আমার সঙ্গে ঘর করে' গেচিস্, বলি তাকি সস্তা? আজে আমি যা পারি নে, সে-ই কি তা পারবে!—নে, এবার ভেদের কল ভোগ কর। আজে আমিও তোর মুখ-দর্শন করব না। বলে, অত ভাতার জোটাবে!—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুমোশায়, ভাবচি, এমন করে' আর থাকা যায় না। বিন্দিকেই বিয়ে করে' ফেলব ভাবচি। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সবুর নিইচি পত্তপতির কাছে।'

কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হইল না। আমাদের সাড়া আজ্ঞা সবে জমিয়া উঠিয়াছে; এমন [illegible] একটা হোঁচোপাল পুরের মতোই প্রকট হইয়া উঠিয়া সারাটা পাড়া মুখরিত করিয়া [illegible] একটা মোটা গলার কান্নার সঙ্গে একটা খ্যান্‌খ্যানে গলা [illegible] ছুটিয়া পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে ছুটিয়া গেল।

'ব্যাপার কি হে নিতুদা,' কার্ত্তিক মুখুজ্জে ইঙ্গিত দিয়া প্রশ্ন করিলেন।

নিতুদা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটু সঙ্কুচিত বোধ করিল। চোখে-মুখে এবং গালে হাত মাখিয়া হাই তুলিতে তুলিতে কহিল, আজ্ঞে, কেষ্টি ফিরে এসেচে। আজ সন্ধ্যের মুখেই ফিরে এসেচে। তাই মুজনায় মনের সুখে একটু কেঁদে নিলাম। আজ্ঞে, মনের সুখে একটু বেশি জোরেই কেঁদে নিলাম।

পাড়া-প্রতিবেশীরা মতলবের মতো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। মুচকি হাসি মুখে চোখে আনন্দাশ্রু ঘনাইয়া আসিল। 'হিন্দু-বিবাহ কি ছিন্ন হইতে পারে!' ভাবখানা এই।

শম্ভু বলিল, 'এই যদি পরিণতি, তবে অত ঘটা করে ছাড়াছাড়ি হয়ে লোক হাসালে কেন বাছাধন?'

নিতুদা মাথা চুলকাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, ছাড়াছাড়ি না হলে কি টের পেতাম আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি থাকা অসাধ্য!'

পণ্ডিচারীতে ★

(স্মৃতিকথা)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

গতবারে আমি অঙ্গীকার করেছি যে একজন প্রবীণ ও একজন নবীন সংক্রান্ত স্বদেশী যুগের একটি ঘটনার কথা বলব। এই প্রবীণটি হচ্ছেন উত্তর বঙ্গের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ বামাচরণ তর্করত্ন মহাশয় ও নবীনটি হচ্ছেন তদীয় অগ্রজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। তর্করত্ন মহাশয় তখনো মহামহোপাধ্যায় উপাধিটি পান নি, পণ্ডিতরাজ উপাধিটি পেয়েছিলেন কি না তা সঠিক বলতে পারি নে। তিনি আগে পণ্ডিতরাজ উপাধি পান, পরে পান মহামহোপাধ্যায়। বোধহয় পণ্ডিতরাজ উপাধি তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য পরিষদের কাছ থেকে, মহামহোপাধ্যায় গভর্নমেণ্ট প্রদত্ত।

কিন্তু এই সূত্রে ও সুযোগে আমি এক যুগল প্রফুল্লর সম্বন্ধে এইখানে কিছু লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চাই—ভবিষ্যৎ কোনো ঐতিহাসিকের কিছু সুবিধার জন্য। এই যুগল প্রফুল্লর একজন হচ্ছেন আমার অগ্রজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অন্যজন হচ্ছেন আমার সহপাঠী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চাকী। বলা বাহুল্য প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় আপৈশব আর প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে পরিচয় রংপুর জিলা স্কুলের চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণী (তখনকার কালের) এবং রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে মোটামুটি ১৯০৪।৫ ও ৭ খৃষ্টাব্দে। বাংলা দেশে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলনের অন্তরালে ধীরে ধীরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মন্ত্র-দীক্ষায় ও শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে যেসোদ্ভাবতী বিপ্লবীদের যে গুপ্ত সমিতির আবির্ভাব ঘটে সেই গুপ্ত সমিতির সভ্যরূপে যোগ সম্পর্কে সর্ব প্রথমে যে দু'জনের মৃত্যু ঘটে সে দু'জন হচ্ছেন এই দুই প্রফুল্ল। কিন্তু প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘটে দৈবদুর্ঘটনায় আকস্মিক ভাবে আর প্রফুল্ল চাকী তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় বীরের মতো। চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে সর্ব প্রথম শহীদ্ কে, এই নিয়ে বাংলা দেশে আজ একটা তর্কাতর্কি চলছে। কেউ কেউ ক্ষুদিরাম বসুকেই প্রথম শহীদ্ ব'লে বর্ণনা করছেন—কিন্তু সেটা স্পষ্টতঃ অনৈতিহাসিক। বলাবাহুল্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের বা দল বিশেষের বিশেষ ইচ্ছায় বা আকুল আকাঙ্ক্ষায় ঐতিহাসিক সত্য ঘাঁচাই হয় না। Nepotism অর্থাৎ স্বজন-প্রীতির বা পক্ষপাতের স্থান আর যেখানেই থাক ইতিহাসে নেই। কুরুসভায় দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র যেমন অন্তহীন হ'য়ে উঠেছিল, ইতিহাসও তেমনি মহাকালের এক অন্তহীন ফিল্ম্, যত টানা যায় তত আসে। এই ফিল্ম্ যে-ছবি ফেলে ওঠে তা মুছে ফেলবার কারো সাধ্য নেই, এক্তিয়ারও নেই। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘটে প্রফুল্ল চাকীরও আগে। কিন্তু তাঁর সে মৃত্যু দৈবাৎ দুর্ঘটনায়। সুতরাং তাঁর কথা ছেড়ে দিলে ইতিহাসের অপক্ষপাত হিসেবে স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার প্রথম শহীদের আসন প্রফুল্ল চাকীরই প্রাপ্য।

★ এর আগের অংশ ১৩৬৪ শারদীয়া 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু বাংলার হিন্দু-সমাজের আজ এমনি দুরবস্থা যে সে-সমাজের কারো কারো এই তার বিচারটুকুও করবার বা মেনে নেবার মন নেই। পশ্চিম বঙ্গের কেউ কেউ আজ ক্ষুদিরামকেই প্রথম শহীদ্ ব'লে খাড়া করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন ব'লে মনে হয়। এই সম্পর্কে একজনের এমন একটি যুক্তি সাময়িক একখানি পত্রে দেখেছিলাম যা প'ড়ে একেবারে বাক্‌হীন হ'য়ে পড়তে হয়। যুক্তিটা এখানে আমি বলছি। সেই লেখক—নাম মনে নেই—বলছেন, প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের আগে মৃত্যু বরণ করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মৃত্যু তো ইংরাজের ফাঁসিকাঠে হয়—তিনি নিজের রিভলবারের গুলিতে করেছিলেন আত্মহত্যা। কিন্তু সর্ব প্রথমে ইংরাজের ফাঁসিকাঠে জীবন যায় ক্ষুদিরামের। সুতরাং ক্ষুদিরামই প্রথম শহীদ্। এ যুক্তি যে কেবল অপূর্ব তাই নয়, এ একেবারে বেন ভাগবদ্ বিচার। কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্য রকমের হ'ত অর্থাৎ প্রফুল্ল চাকীরই যদি প্রথমে মৃত্যু ঘটত ইংরাজের ফাঁসিকাঠে আর ক্ষুদিরাম তারপরে করতেন রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা তবে অনুমান করি যুক্তিটাও যেত বদ্‌লে। তখন ইনি নিশ্চয়ই বলতেন—আরে, প্রফুল্ল চাকী তো বোকার মতো ধরা প'ড়ে ইংরাজের ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিল—না ঝুলে তাঁর আর উপায় কি ছিল?—কিন্তু ক্ষুদিরাম কেমন বীরের মতো আপনার নিজের হাতে নিজেকে মুক্তি দিলেন এই রক্তমাংসময় ক্ষুদ্র শরীরের বন্দীশালা থেকে। সুতরাং প্রথম শহীদের স্থান এই ক্ষুদিরামের, প্রফুল্ল চাকীর নয়। অর্থাৎ যে-কোন রকমেই হোক ক্ষুদিরামকেই প্রথম শহীদ্ রূপে দাঁড় করাতে হবে—এইটেই ইচ্ছে প্রধান কথা। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য ও সত্য অন্য রকম—কোনো ধরণের উকিলী-বুদ্ধিই তাকে নস্যাৎ করতে পারে না। সুতরাং এ-কথা অসঙ্কোচে ও সত্যের মর্যাদা রেখে আজ বলা যেতে পারে যে স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার প্রথম শহীদ্ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।

আজ পশ্চিম বঙ্গের কোনো কোনো হিন্দুর কথাবার্তা শুনে ও ভাবভঙ্গি দেখে অনুমান হয় যে, তাঁরা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুদের তাঁদের সঙ্গ থেকে ছেঁটে ফেলতে পারলেই যেন বাঁচেন। বলা বাহুল্য এঁরা অগভীর প্রকৃতির মানুষ। এঁদের বুদ্ধি প্রখর নয়, বুদ্ধি স্বচ্ছ নয়, সমাজ-হিতৈষণা প্রবল নয়—কল্যাণ সম্বন্ধে এঁদের বোধ অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন। একটি সমাজের শক্তি নিহিত থাকে তার জনবল ধনবল ও বুদ্ধিবলের মধ্যে—সমাজ বা জাতির শক্তি আর কোথাও নেই, আর কোথাও নয়। জনবল সমাজ-শক্তির একেবারে প্রথম কথা, একটা প্রধান কথা। এবং জনবলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ধনবল। বুদ্ধিবলটা অবশ্য কতকটা দৈবের দান—এবং এ-কথাও ঠিক যে বুদ্ধিবল না থাকলে জনবলের কোনো মূল্য থাকে না এবং ধনবলেরও সৃষ্টি হয় না। কিন্তু জনবল যে একটা বল এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানব সভ্যতার আদিম কালে পরিবারে জনবল বৃদ্ধির জন্য বহুবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল—বহুবিবাহের এও একটা কারণ এমন মনে করলে বোধ হয় ভুল হয় না। সুতরাং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের থেকে ছেঁটে ফেললে, তাঁদের অবজ্ঞা দিয়ে অনাত্মীয় ক'রে তুললে বাংলার হিন্দু-সমাজকে খর্ব করা হবে, অব্যর্থভাবে তার অনিষ্ট সাধন করা হবে। রাজনৈতিক হিসেবে তো আজ বাংলার হিন্দু-সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছেই, মনের জগতেও যদি আজ আমরা দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যাই তবে সেটা বাঙালী হিন্দু-সমাজের পক্ষে হবে একটা মহা দুর্ঘটনা। এই মহা দুর্ঘটনা যাতে ঘটবার অবসর না পায় তার জন্যে সিবিল বঙ্গের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার—শুচেতা যাঁরা, সংকীর্ণ দৃষ্টি যাঁরা,

সংকীর্ণ স্থানে ও সংকীর্ণ কালে বাস ক'রে থাকেন যাঁরা তাঁদের ইচ্ছাই যেন এক্ষেত্রে অর্থ্যকরী হ'য়ে না পড়ে। এই সাবধান-বাণী যেন অহরহ আমাদের মনে জাগ্রত থাকে—ধীরে ধীরে যেন পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা দুটো আলাদা জাতিতে পরিণত হ'য়ে না যায়। গায়ের জোর যাকে দুই করেছে মনের জোর যেন তাকে এক রাখে—অস্ত্র যাকে কেটেছে আত্মা যেন তাকে জোড়া রাখতে পারে।

যাক্, এই সব তত্ত্বকথা ছেড়ে দিয়ে এখন তথ্যের কথায় আসা যাক্। যুগল প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমি এখানে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ছি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। জন্মস্থান রংপুর। জন্মকাল বঙ্গাব্দ ১২৯৬ সাল ২৪শে কার্তিক শনিবার। পিতা ৺ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী। মাতা ৺চন্দ্রকুমারী দেবী। প্রফুল্লরা ছিলেন চার ভাই এক বোন। তাঁদের মধ্যে বর্তমানে এই লেখক ও কনী চারুবালা মাত্র জীবিত আছেন। চারুবালার বিবাহ হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, তাঁর বৈধব্য ঘটে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে। ইনি পুত্রকন্যাবতী। বরে টাকির ভূতপূর্ব প্রোভিউসার শ্রীমান অমিয় চক্রবর্তী এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। লেখক প্রাচার জীয়দেবের অবস্থা।

স্বদেশীর যুগে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে দেশের কাজে যাঁরা সাংসারিক সুখ সুবিধা বর্জন করেছিলেন এবং ত্যাগ ও দুঃখকে বরণ করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কোনো আন্দোলনের তরঙ্গের মাথায় মাথায় ভেসে যাবার যে একটা সহজসাধ্যতা আছে সেই সহজসাধ্যতাই এঁর জীবনে মূল শক্তিরূপে কাজ করে নি, দেশসেবা এঁর জীবনের মূল সুরই হ'য়ে উঠেছিল, তা একটা আজীবনের ব্রতের রূপ নিয়েছিল। পরাধীন দেশে দেশসেবা বলতে যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম বুঝায় এই মূল বোধগত তত্ত্বটিও তাঁর আলোচনে ছিল না। কিম্বা ঐ তত্ত্বটি কিছু বেশি রকম অসুবিধা-জনক বিবেচনায় তিনি সেদিকে চোখ বুঁজে থাকেন নি। তাই তিনি বৈপ্লবিকও ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সহিংস ও অহিংস এই দুই আন্দোলনেই তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

বৈদ্যকুলেই নাকি প্রহ্লাদের আবির্ভাব ঘটে। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা ছিলেন ইংরাজ গভর্নমেণ্টের চাকুরে। তিনি চাকুরিতে কি হ'য়ে প্রবেশ করেছিলেন তা আমি জানি না। কিন্তু অপোগণ্ড ছাড়িয়ে আমার মধ্যে যখন বহির্জগতের কিছু কিছু আলোক সঞ্চরণ আরম্ভ হয়েছে তখন তাঁকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বেঞ্চ ক্লার্করূপে দেখি। এই পদেই তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর চাকুরির আয়ুতে এক মহা ফাঁড়া উপস্থিত হয়। তখন রংপুর জিলা স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ও ইংরাজ গভর্নমেণ্টের স্থানীয় প্রতিভূর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে সংঘর্ষ বাধে। ছাত্রদের মধ্যে মহা বিক্ষোভ জাগে এবং তারি ফলে রংপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত করবার সিদ্ধান্ত হয়, ও তা ঘোষণা করা হয়। সেই সময়ে আমরা তিন ভাই, আমাদের এক মাসতুত দাদা এবং আর একটি আত্মীয় বন্ধুর পিতৃদেবের অভিভাবকত্বে থেকে পড়াশুনা করি। তাঁর কন্যাটিও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। কিন্তু তখন মেয়েদের, অন্ততঃ সেই মফঃস্বল শহরের মেয়েদের চেতনায় পারিবারিক গণ্ডির বাইরে অন্য কোনো স্বপ্ন তার অস্পষ্টতম ছায়াও ফেলে নি। বালিকা বিদ্যালয়টিও ছিল একটা প্রায় পাঠশালা জাতীয় ব্যাপারে। সেকালে—এখনকার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে

সেটা সেকালেই বলা যায়। সেকালে মেয়েরা এই পাঠশালায় দশ এগারো কি বড়জোর বারো বছর পর্যন্ত প'ড়ে তার পর সেখান থেকে অপসারিত হ'য়ে যেত এবং হিন্দু পরিবারের পারিবারিক দুর্গের নিরাপদ নিভৃতে অপেক্ষমানা থাকত প্রজাপতির নির্বন্ধের জন্যে। তখন হিন্দু ভদ্রঘরের মেয়েদের বারো ভেরো কি বড় জোর চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে না হ'লে একটা মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার হ'য়ে উঠত—চারিদিকে একটা ছি ছি প'ড়ে যেত। এখন অবশ্য আর সে অবস্থা নেই। এখন পনর ষোল বছরের বিবাহিত মেয়েরাও বালিকা শ্রিপার বা হিল-উঁচু জুতো প'রে হিন্দি গ্রামার অ্যাণ্ড রীডার ইত্যাদি বহুবিধ পাঠ্যপুস্তক হাতে নিয়ে অনায়াসে হেঁটে ও ইস্কুলে যাচ্ছে। সেই বালিকা বিদ্যালয়টিও আজ হাই স্কুলে পরিণত হ'য়ে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সনাতন হিন্দু সমাজে মেয়েদের কিলিকে পাকাবার সনাতন প্রথাটা আর নেই। মেয়েদের অন্ত সকল দিক রুদ্ধ করে দিয়ে, অন্ত সকল প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ঠেলে দিয়ে বাহিরে দিয়ে পিষে দিয়ে তাদের মানস-সত্তাকে একটি মাত্র পথে চালিত করবার দুর্বুদ্ধি থেকে হিন্দু-সমাজ আজ অনেকটা মুক্ত হয়েছে। তাই মেয়েদের জীবন আজ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় অন্ত প্রান্তে গিয়ে তা আবার অন্য রকমের অস্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হবে না—মেয়েরা নিজেদের পুরুষ ব'লে ভাববেন না, নিজেদের পুরুষ ব'লে উপলব্ধি করবার বৃথা চেষ্টা করবেন না। ওটা হবে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের একেবারে বিরোধী। এই মূলতত্ত্বকে উল্টে দেবার শক্তি কারোই নেই—থাকলে সেটা আর মূলতত্ত্ব হ'ত না, মূলতত্ত্ব হ'য়ে পড়ত। পৌরুষতত্ত্বই শুধু অপৌরুষের তত্ত্ব নয়, নারীত্বের তত্ত্বও অপৌরুষের তত্ত্ব। স্ত্রীতত্ত্বটা ঠিক ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপার নয় যে, ধর্মঘট করলেই মজুরি বেড়ে যাবার সম্ভাবনা দাঁড়াবে। বিকৃত বস্তুতে "উম্দা চিজ" ছাপ দিয়ে খুব হবার কোনো উপায় নেই।

সে যা হোক্, রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হবার ঘোষণা হ'লে পিতৃদেব আমাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোরা কোন্ স্কুলে পড়বি?"

অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট স্কুলে না সেই নবঘোষিত জাতীয় বিদ্যালয়ে।

আমরা সোল্লাসে ও সমস্বরে উত্তর দিলাম—"জাতীয় বিদ্যালয়ে।"

পিতৃদেব বললেন—"আচ্ছা বেশ।"

নদীপথে একচ্ছত্র ষ্টীমার কোম্পানীর যাত্রী-বহনের কারবার থাকলে ষ্টীমার-ঘাটে যেমন যাত্রীদের মধ্যে টানাটানি চলে আমাদের শহরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর ছাত্রদের নিয়ে সেই রকম টানাটানি আরম্ভ হ'য়ে গেল। মহা মুস্কিলে পিতৃদেবের উপর চাপ এলো। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ইমার্সন সাহেব। বোধ হয় এই ইমার্সন সাহেবই বদলি হ'য়ে পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সময় "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণ নিষিদ্ধ ক'রে এবং সেই সম্পর্কে পুলিস লেলিয়ে দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ক'রে অমান যশঃ অর্জন করেছিলেন। তখনকার কালের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার কিশোর পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা পুলিসের মার খেয়ে খেয়ে যতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে না পড়েছিলেন ততক্ষণ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ত্যাগ করেন নি। এই ইমার্সন সাহেবই বা তাঁর নির্দেশ মতো রংপুর জিলা স্কুলের কর্তৃপক্ষ

যা হোক মাষ্টার মশাইকে ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য কয়েকটি চায়ের পাত টুকরো ক'রে ভরিয়ে রাখা হলো এবং তাতেই গোলমাল সুরু হয়। ইসমাইল সিদ্দিকীকে অনুরোধ করলেন তাঁর ছেলেদের পড়াবেন ব'লে রাখবার জন্যে।

পিতৃদেব বললেন—"ছেলেরা আইনের সিভিলদিকে পড়তে চায়। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না।"

তাতে সাহেব তাঁকে জানালেন যে ভবিষ্যতে তাঁর প্রয়োজন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

এর পূর্বেই দু'দুবার যখন পিতৃদেবের উচ্চতর পদ পাবার সুযোগ তখন তাঁর প্রাপ্য সেই পদ তাঁকে না দিয়ে অন্যকে দেওয়া হয়েছিল। এতে অনুমান করি ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের চাকুরি ব্যাপারে ধর্ম সুকৌশলটা পিতৃদেবের অধিগত ছিল না। তিনি সম্ভবতঃ খাঁটির আপিসের কর্তব্য কর্মেরই এ-ব্যাপারের মূল তত্ত্ব ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। ছুটির দিনে সাহেবের কুঠিতে গিয়ে কেনা বাজার সাহেবের ঘোড়া কুকুরের খাদ্য সম্বন্ধে ইংরেজ প্রকাশ, মোটর এবং ব্রুহাইটির ব'লে নালিশের জন্য সুবোধ্য ছিপ পাঠিয়ে দেওয়া কিংবা সাহেবের নন্দনের অকচি হ'লে দুগ্ধের দ্বারা সুকৌশলে বোঝে পাঠানো—চাকুরির এই সব গুপ্ত আধ্যাত্ম রহস্যগুলি তাঁর অজ্ঞাত ছিল। সে যা হোক, সাহেবের কথা শুনে তিনি বললেন—"প্রমোশান আমার আগে থেকেই এক রকম বন্ধ হয়েছে। এখন থেকে নাকচ করার ইচ্ছা করেই তা ত্যাগ করলাম।"

এর পর সাহেব আর কিছু বলেন নি। সে যাত্রা তাঁর চাকুরিটি বজায় রইলো।

কিন্তু এর দু'তিন বছর পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের গোড়ায় কলিকাতায় বিপ্লবীদের বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হবার পর যে-ধাক্কা এলো তাতে তাঁর চাকুরিও বেসামাল হ'য়ে গেল।

অনেকের ধারণা আছে যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর থেকেই বিপ্লবীদের জন্মলাভ ঘটে কথাটা সত্য নয়। বস্তুতঃ ঘনিষ্ঠ স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকেই অনুশীলন এবং যুগান্তর থেকে ইংরাজকে তাড়াবার একটা প্ল্যান কারো কারো মাথায় এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য বৈপ্লবিকদল গ'ড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনে এই বিপ্লবীরা আপনাদের আইডিয়া প্রচার করবার এবং তা কার্যকরী ক'রে তুলবার জন্যে মোট সংগ্রহ করবার একটা বড় রকমের সুযোগ ও সুবিধা পান। এবং এই সুযোগ ও সুবিধা তাঁরা পুরো আদায় করে নেন। ——অধিক বিস্তারে লেখের বুক বোঝা না বাড়িয়ে, পাঠকদের এটুকু এখন বলা সার। দেশকে আগের না নিয়ে গেলে এই বিপ্লবীদের পক্ষে তাঁদের মত প্রচার করা এবং গোটা সংগ্রহ করা যেমন সহজ হ'ত না—এখন তেমনি অনুমান করা যায়। বিদেশী বা বিলাতি কাপড় পোড়ানো, আগুন দিয়ে সিগারেট, এবং চুরুট বিড়ি টেনে টেনে ফুঁকনালীতে কোস্কা ফেলানো—এ-সব বিপ্লবীদের পক্ষে ছিল স্বদেশী লোকের পক্ষে অনুসরণের তুল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই স্বদেশী মূল চিনি ও বিভিন্ন ধোঁয়ার আড়ালে তাঁরা বিপ্লব ও বোমা তৈরিকারের কারখানা করার প্রচুর ও প্রকৃষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। তেজস্ক্রিয় বোমা তৈরি করে বারীন্দ্রকুমার যখন তা স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাতে নিয়ে যান তখন তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তাঁকে ডেকে বলেন—ওগো দেখো এসে ছেলেরা কি করেছে—যেন বৈজ্ঞানিকের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। সে যা হোক, অনুমান করি স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বছর আগেই মহীয় পিতৃদেব এই বিপ্লবীদের কথা জানতে পেরেছিলেন। কেন অনুমান করি, তা বলছি।

পূর্বে আমার এক বিস্মৃত দাদার কথা উল্লেখ করেছি (বৈশাখ ১৩৪৪ শারদীয়া সংখ্যা "পল্লবাহিনী"তে) যিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়বার কালে আমাকে ছিলা ফুঁড়ে তীর ক'রে দিয়েছিলেন। এঁর নাম শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুড়ীমহাশয়। ইনি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন এবং মাতুল পিতৃদেবের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন। বালাকাল থেকে এঁকে আমরা সংসারের দাদার মতই জান করেছি। ইনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রংপুর জিলা স্কুল থেকে মাট্রিক (তখন এর নাম ছিল এণ্ট্রান্স) পাস করেন। এই সূত্রে সেই স্কুল থেকে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এণ্ট্রান্স পাস করেন। এই বারের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার কথাটা বেশ মনে আছে এই কারণে যে, সেবার ঐ স্কুল থেকে কুড়ি জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং কুড়ি জনই পাস করেছিলেন—দশ জন (কিম্বা নয় জন) দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে। এই নিয়ে শহরে বেশ একটু হৈচৈ প্রকাশ ঘটেছিল এবং স্কুলের পক্ষেও এটা বেশ একটা গৌরবের ব্যাপার হয়েছিল। এণ্ট্রান্স পাস ক'রে সুধীরচন্দ্র কলিকাতায় পড়তে যান এবং বহুবাসী কলেজে ভর্তি হন। আমরা শুনেছিলাম যে ইনি কলিকাতায় গিয়ে এক সাহেব ঠেঙানো দলের সৃষ্টি করেন কিম্বা পূর্বথেকেই সৃষ্ট এমন একটা দলে যোগ দেন। ব্যাপারটা অনেকের কাছে বিসদৃশ লাগতে পারে এবং কারো কারো এর অর্থবোধ না হতে পারে। সুতরাং এর একটা ব্যাখ্যা দরকার।

সেইকালে বাঙালীদের জীবনে একটা অসোয়াস্তি ছিল। একটা হাতের কাছে দাঁড়ালে গলটা বাঙালীর স্বভাবজাত ভদ্রতা ও সদ্ভাবের একযোগে মিগ্ধ হ'য়ে ওঠা—এই ছিল তাদের চরিত্রের রূপ। কাজেই একটা দুর্বল, একটা নিরীহকে সর্বদিক সম্ভাব্য অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য আত্মশক্তির প্রয়োজন হয় এবং আত্মশক্তি সদা জাগ্রত হ'য়ে থাকলে অত্যাচার ঘটবার যারো জানা সম্ভাবনা লোপ পায়—এই সত্য যেন বাঙালীর [illegible] কেবারে মুছে গিয়েছিল। এই সম্পর্কেই বাঙালীকেই লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল লাগিল যে দোল,
দোলায়-দোলা ডালের 'পরে ডাকিছে কোন্ প্রাণ।
বেলা হলেই ছিঁই অতি মুখের ভারি মিঠে অতি
আলস ভরে ছিঁই-পতি পুরের প্রতি টান।
তৈল ঢালা দিব্য হুই বিস্রাবসে ভরা
মাথায় ছোট ঘরে বড়ো বাঙালী-সন্তান।

আবার—

হাস্যমুখে বাহুমুখ, বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ মদে ভোলাও কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি ধন্য মানি আপনা টুটি
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছি কিনি যশ।

এটা প্রত্যেকের নিজের কল্পনা প্রসূত ছিল এমন মনে করা যায় না। তখনকার দিনে ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ানেরা সচরাচর বাঙালীকে অপমান ক'রে তৃপ্তি পেয়ে বেড়াতেন এবং ইউরোপীয়ান মেয়েরা সুযোগ ও সুবিধা

পেলে বাঙালীদের উপর তাঁদের বন্দিং শিকার বন্ধ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না। যাত্রা ঘাটে, ট্রেনে ষ্টীমারে, গড়ের মাঠে ইডেন উদ্যানে সাহেবদের কাছে বাঙালীরা থাকতেন একটা নম্বার ভাঁটার কীর্ত্ত হ'য়ে। কলিকাতায় সাহেব ঠেঙানো দল সৃষ্টি হয়েছিল এই সাহেবদের মধ্যে যাতে কিছু মানবতা উদ্বুদ্ধ হয় তারি সহায়তা করবার জন্যে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মানিকতলার বোমা আবিষ্কৃত হবার পর বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে। কিন্তু তার হলাহলের অপবাদটা আজও ঘোচে নি। Alas!

কলিকাতায় বোমা আবিষ্কারের পর আমাদের সহরের অন্যতম ডাক্তার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখার্জির মুখে একটি গল্প শুনেছিলাম। চারুবাবুকে মাঝে মধ্যে রোগী দেখবার জন্যে বেলেঘাটে সহরের বাহিরে যেতে হ'ত। একবার যেতে তিনি যে কামরায় যাচ্ছিলেন সেই কামরায় এক সাহেবও ছিলেন। ইংরাজরা সাধারণতঃ চাপা প্রকৃতির হ'য়ে থাকেন, থাকে ইংরাজীতে বলে phlegm. সেটা তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মানস-জগতে তাঁরা হুজুগে সহসা নড়েন না—কিম্বা নড়লেও সেটা সহসা প্রকাশ করেন না। বল্ ক'রে ঝ'লে উঠে ফট্ ক'রে নিভে যাওয়া তাঁদের স্বভাব নয়। কিন্তু সেই সময়ে এই সাহেবটির মেজাজ বোধ হয় কোনো কারণে অতিরিক্ত রকমে খোস ছিল কিম্বা হয় তো জলীয় বস্তু-বিশেষ তিনি অতিরিক্ত পরিমাণে উদরস্থ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর খানিক প্রসারণের প্রয়োজন পড়েছিল। সুতরাং তিনি চারুবাবুর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন—Well Babu, are you a Congressite?

চারুবাবু জবাব দিলেন—Certainly I am. Every Bengali is a Congressite.

বোধ হয় রহস্যচ্ছলে সাহেব বললেন—Do you know I can get you arrested?

চারুবাবু বললেন—Perhaps you can, but beware of the bombs.

চারুবাবুর কথা শুনে সাহেব চকিত হ'য়ে উঠলেন। কে জানে দেখতে নিরীহ ভদ্রলোকটি একটি ছোট-খাটো বোমা পকেটে ক'রে ব'সে আছেন কি না! সাহেব বললেন—Babu are you a bomb-maker?

চারুবাবু উত্তর করলেন—Certainly I am not going to tell you that!

এখানেই আলাপে পূর্ণচ্ছেদ প'ড়ে গেল। বৈদেশিকের বোমা বাঙালীদের বুক অনেকখানি চওড়া করেছিল। এই কথোপকথনটুকুর একটা শিক্ষা।

সুধীরচন্দ্র ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলেন না। এণ্ট্রান্স তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেছিলেন। বাল্যকালে তাঁর প্রাইজ পাওয়া বহুকটে বাঁধানো ইংরাজী গ্রন্থ আমি দেখেছি। কিন্তু তিনি এফ, এ (এখনকার আই, এ) পাস করলেন তৃতীয় বিভাগে। তিনি যে কলিকাতার গিয়ে পড়া-শুনায় মনঃসংযোগ করার চাইতে সাহেব ঠেঙানোর মতো ব্যাপারগুলিতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ এটা তারই প্রমাণ। সে যা হোক্, সুধীরচন্দ্র যখন ছুটিতে রংপুরে ফিরলেন তখন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম এবং অন্য একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলাম। লক্ষ্য করলাম যে, তিনি অনেক সময় পিতৃদেবের সঙ্গে ব'সে কি বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন আর সেই আলাপের মধ্যে যেন একটা বিশিষ্ট ঔৎসুক্যের উপাদান আছে। বাল্যকাল থেকে আমি কোনো দিন—কোনোদিন—বাবা ছাড়াতে ব'সে এরকম আলাপ করতে দেখি নি। একটা বিষয়

অসাধারণ রকমের ব্যাপার না হলে এ-রকম ঘটতে পারত না। আমি অনুমান করছি যে, তারিণের সুধীরচন্দ্র কলিকাতা থেকে বিপত্নীক হয়ে নতুন ক'রে এনে মাতুল ঈশানচন্দ্রের ভৈরবি আশ্রমে অনুশোচে পরিবেশন করছিলেন। মনে হয় আমার এই অনুমান ভ্রান্তি নয়।

আর প্রত্যক্ষ কারণ যে-ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এই যে কলিকাতা থেকে ফিরে এসে সুধীরচন্দ্র তার [illegible] একটা মোলনা গাদা বন্দুক সংগ্রহ ক'রে আমার দাদা, এক মামাতো দাদা এবং আমি এই তিনজনকে (আমার ছোট ভাই তখন অত্যন্ত নাবালক, আর এক ভাই শৈশবেই মারা যায়) সঙ্গে নিয়ে শহরের বাহিরে বিলের ধারে ধারে, কে. ডি. ক্যানেলের পাশে পাশে বিহঙ্গকুলের সংহারকার্যে মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। কে. ডি. ক্যানেল অর্থাৎ কিশোরীলাল দাঁ-মহাশয়ের পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের কীর্তি। রংপুর শহর একদা ছিল প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার এক প্রকাণ্ড আড্ডা।—লোকে রংপুরকে বলত যমপুর। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ যখন জেলার সিভিল সার্জন ছিলেন তখন তিনি এই ম্যালেরিয়া দূর করবার জন্যে শহরের উত্তর দিকে মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা এই ক্যানেল খনন করিয়ে ছিলেন। শহরের দক্ষিণাঞ্চলেও আর একটি ক্যানেল ছিল এই ক্যানেলের জন্য কোর্টের পাশ দিয়ে গিয়েছে। ক্যানেলের ধারে জজ কোর্টের কম্পাউণ্ডে ইটের তৈরি একটি স্তম্ভ গাত্রে পাথরের ফলকে এই চার লাইন পদ্য উৎকীর্ণ ছিল—এবং অনুমান করি এখনো আছে—

[illegible]
পথিক আকর তুমি এই রংপুর
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] এই বাড়ি উপাধিটা মৌকিক, সরকারি নয়। ইনি ছিলেন [illegible] মুন্সেফি, যাকে পাকত ভাষায় বলে আমলাহ।

সুধীরচন্দ্র কলিকাতা থেকে ফিরে একটি গাদা বন্দুক নিয়ে আমাদের কয়েকজনকে কাশেম কলোনির [illegible] সঙ্গে ঘুরে পক্ষীকুলের ত্রাস সঞ্চার করতে মহা উৎসাহী হয়ে এই অভিযানে আমরা মাঝে মাঝে পেলে কখনো [illegible] নৌকা রিকুইজিশন (requisition) করবার। কিন্তু সেই অবধি নিরক্ষর লোকদের সিভিক [illegible] জ্ঞান কিছুমাত্র জাগ্রত না হওয়াতে তা জানতে পারলে দাদামশাই ফিরে আসবেন, তখন তাঁর [illegible] হয় অবশ্য তাঁরই! সে যা হোক, এর পূর্বে কোনোদিন—কোনোদিন—সুধীরচন্দ্রের এই রকম [illegible] আক্রোশের অল্প মাত্রার লেশমাত্র হতাশও দেখে নি। বাঙালীর ছেলেরা যেমন [illegible] করে, তুচ্ছ [illegible] নিয়ে হাসে খেলে বা ক্ষুব্ধ হয়ে ছাই-ভস্ম কাটায় [illegible] তাই করেছেন। কলিকাতা থেকে ফিরে [illegible] এই [illegible] আমাদের প্রতি, এই রকম সংযম-শাসন একটা [illegible] প্রয়োজন রাখে। [illegible] তখনই বিপদের আশঙ্কা করেছিল এবং তিনি কলিকাতায় তাঁদের সংশ্লিষ্ট একজনকে [illegible] ও তাঁদের মনে [illegible] করেছিলেন। এবং রংপুরে ফিরে আসা পর্যন্ত তা জানিয়েছিলেন।

তাই বলছিলাম যে স্বদেশী যুগের অনেক আগেই বিদেশী দ্রব্য বয়কট [illegible] পিতৃদেব প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর এই কাগিনয়টি থেকে। এই সিদ্ধান্ত মিলিয়ে নেবার সুযোগ [illegible]।

তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় পিতৃদেব একদিন আমাদের [illegible] সুধীরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে।

বোধ করি যে এর কিছুকাল পরে একদিন পিতৃদেব আমাদের ডেকে বললেন—"আমি বন্দুক কিনবো, তোরা বন্ধ ক'রে রাখতে পারবি?"

আমরা অবশ্য সহর্ষে সোল্লাসে সমস্বরে উত্তর দিলাম—"নিশ্চয় পারবো।"

পিতৃদেব একটা টোটাদার বন্দুক কিনলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। [illegible] প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে ওই রকম বন্দুক-প্রীতি; এর কোনো ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নেই। এই বন্দুক তাঁকে কবে তিনি কোনোদিন বিলাতফেরতের পিছনে পিছনেও ঘোরবার [illegible]। সিদ্ধান্ত—এই বন্দুকের অবিলম্বে অন্য কোনো সম্ভাব্য কাজে লাগাবার হিসেবই তাঁর মনে ছিল। এ থেকে সিদ্ধান্ত—অন্তরালে ইংরাজকে দেশ থেকে তাড়াবার পরিকল্পনা যে কোথাও ঘুরছে এ-সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু ব্রিটিশ জাতির সতর্কতার সীমা ছিল না। পাছে এই বন্দুক তাড়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তির একখানি পাথরও খসাবার সহায়তা হয় তাই এর পাশে স্পষ্ট ক'রে লেখা থাকত যে, বছরে তিন শ' টোটার বেশি এর রসদ মিলবে না—অর্থাৎ দৈনিক একটা ক'রেও হিসেবে পড়ে না। কিন্তু হায় এই নজর রাখার! হায় এই সেলাম দিয়ে! হায় চকলা লঙ্কা! সকল সতর্কতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতিকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতাড়ি গুটাতে হল অনিচ্ছায় ও আচমকিতে। একেই বোধ করি শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—মুহূরস্য পরং পন্থাঃ।

কথা বাহুল্য এই বন্দুক নিয়ে আমরা আগে দাদা, মাঝখানে যাদু ও আমি এই তিন জন মিলে খানাকুলে গিয়ে বিদেশী জাতির বিরুদ্ধে কার্যে মাঝে মাঝে মহা উৎসাহ প্রকাশ করেছি। কিন্তু বন্দুক দুটোর পর বেশি ভার কেন্দ্রেই পক্ষীরা আমাদের [illegible] কি রকম যেন একটা ঢেউ-খেলানো ভোলা ভিত্তে উঠে-যেত। আমরা পক্ষীদের ভাষা [illegible] ব্যবহার ও সংস্কৃতি বুঝতেও আমাদের কোনো ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু মনে হত [illegible] পুচ্ছের দোলায় যেন প্রকাশ পেত একটা [illegible] অবজ্ঞার ভঙ্গিমা।

[illegible]যার মাসতুত দাদার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। ঘটনাটা বিবৃত করবার উপযোগী। শুনতে পাওয়া [illegible] আসন নেবে পুলিস বাহিনী যেমন কর্তব্য-পরায়ণ তেমনি ভদ্র সৎ ও অমায়িক—যারা পুলিসীতে [illegible] বাহিনীর তুলনা নেই। কিন্তু সেই ইংরাজেরই শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে পুলিস যেই [illegible] দুর্বিনীত ও হঠকারী এবং যেমন লোকের পাল্লায় পড়লে সে এদের কি রকম অবস্থা দাঁড়ায় তার পরিচয় এই ঘটনায় পাওয়া যাবে।

আমার মাসতুত দাদার নাম শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বৈষ্ণব। সুধীরচন্দ্রের মতো ইনিও বাল্যে পিতা মাতাকে হারিয়েছিলেন। এক মামার পিতৃস্নেহের অভিভাবকত্বে আমাদের সঙ্গেই মানুষ হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে মেজদা দাদার মতোই দেখতাম। ইনি আমার চাইতে ছয় সাত বছরের বড়। তখন স্বদেশী আন্দোলনের সময়। আমরা

ঘইখন বেঞ্চ ছেড়ে দিয়ে সবাই তখন হৈচৈ কুস্তি পাটিখেলা ছোরা ও তরবারির প্যাচ ইত্যাদিতে মহা উৎসাহের সঙ্গে মেতে উঠেছি। ছুরেন্দ্র বাহাদুর শরীর তখন হৈচৈ কুস্তি ইত্যাদি ক্রমে বেশ বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল—ফুটবলেও তিনি ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। এই সময় একদা রেলযোগে আমরা যেন চৌথা থেকে ফিরছিলাম। রংপুর ষ্টেশনে যখন আমরা এসে নামলাম তখন দেখা গেল সেই ট্রেন থেকে নামল এক বিরাট যাত্রীর জনতা। রংপুর ষ্টেশন থেকে [illegible] প্রায় দেড় মাইল দূরে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বেয়ারা। সুতরাং ভাবলাম আগে একখানি গাড়ি ধরতে না পারলে মহা-মুস্কিলে পড়বে। কিন্তু সেই জনতার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর নির্গমন পথে বাইরে আসতে হলে অন্তত কিছু সময় [illegible] সে হবে না এটা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে সব গাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে। এই ভেবে মহিলাদের জন্য ওয়েটিং রুম ছিল ষ্টেশনের মূল ইমারত থেকে কিছু দূরে। আমরা ঠিক করলাম যে মহিলাদের সেই ওয়েটিং রুমে গেলে সেই পথেই আমরা বাইরে যাবো এবং গাড়ি ঠিক করব। মহিলাদের সেই কক্ষে রেখে আমরা বেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি দেখি সম্মুখেই একজন রেলওয়ে পুলিসের সজ্জা দাঁড়িয়ে। সে বোধ হয় আমাদের টিকেটহীন যাত্রী বলেই মনে করেছিল কিম্বা হয়তো এই পথে যাওয়ার নিষেধ আইনতঃ নিষিদ্ধ। পুলিসটি কিন্তু টিকেটের সম্বন্ধে কিছু উচ্চবাচ্য করল না। সে বললে যে এদিক দিয়ে নরনারীদের নিকলাধার কোনো নিয়ম নেই। সুতরাং আমাদের টিসনমে যাবে হোগা। আমাদের অবশ্য টিসনমে যেতে আপত্তি ছিল না—অবশ্য যেতে না হলেই যে খুশি হতাম সেটা বলাই বাহুল্য। আমরা পুলিসটির সঙ্গে ষ্টেশনে যেতে সম্মত হলাম। অদূরে এই বাহিনীর আর একটি সজ্জা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বোধ হয় মনে করলেন যে, পুলিসী কর্তব্যটা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কিম্বা যথোচিত প্রতাপ প্রকাশপূর্বক করা হয় নি অথবা তিনি হয়তো মনে করেছিলেন যে পুলিসের বেশে লোকে জলপানির জন্যে টাকা কড়ি ক'রে থাকে, [illegible] সর্বসমক্ষে ছিনি। কিন্তু এই কি রকম বেরসিক লোক যে এক কথায় সরাসরি উচ্চতর [illegible] ইনি এগিয়ে এসে ছুরেন্দ্রবাহাদুরের [illegible] ষ্টেশনেই যাচ্ছিলেন। সুতরাং [illegible] আবার এই পাশে [illegible] সম্ভবতঃ ছুরেন্দ্রবাহাদুরের ডাকনাম ছুরেন্দ্র একটা [illegible] ছিল। সুতরাং সেই গাড়ি-[illegible] মুখ থেকে বেরোনি ঐ [illegible] বলেছে কখন কি [illegible] কাটটা বার ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বলিয়েছিলেন এক ঘুঁসি। সম্ভবতঃ ব্রিটিশদের ভারত সাম্রাজ্যের [illegible] ছাপন্ন ক্ষত্রিয়বীর ছিল রাজপুত বা মোগলপুত। তাদের এ রকম অভিজাত ঐকেবারেই নূতন হয়তো তিনি আত্মিক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে পড়লেন এবং কর্তব্যনিষ্ঠার বাধনে কিছু সময়প্রহর প্র [illegible] বেওয়ালেন। তখন বলা বাহুল্য অন্য গাড়ি-রক্ষকটি ছুরেন্দ্রবাহাদুরকে আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে [illegible] কর্মচারীটিও কিছুটা সামলে নিয়েছেন। এঁদের আগে ছুটি ভদ্রলোক কোথা থেকে যোগে [illegible] তাঁদের পরণে পুলিসের পোষাক ছিল না। বেশ একটা মারামারি বেধে গেল। একটা ছোটখাট জনতা [illegible] বেশ একটা ক্রীড়ার অপূর্ব প্রতিযোগিতার টিকেট-কাটা ভদ্রলোক এই সাহেবকেও এই সুত্র [illegible] সিমাকে প্রণয়বদ্ধ-মুষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মনে হয় এই সময়ে ইনিও [illegible] কার্তিকচন্দ্র কাঞ্জিলাল (এবং সম্ভবতঃ উকিল শ্রীযুক্ত নীলমণি [illegible])। কি ভাবে ষ্টেশনে

এসেছিলেন। কিম্বা হয়তো এই ট্রেন থেকেই তাঁরা নেমেছিলেন— তাঁরা এই ব্যাপার দেখে ছুটে এসে এই সশস্ত্র গুণ্ডাদলটিকে ধরে ফেলেন। তারপর মিনিটের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু যে-দৃশ্য পুলিসের চোখের পরিষ্কার আলোর প্রহরী দুটির নাসারন্ধ্র থেকে শোণিত নির্গমন করছে। অন্য দুটিরও দেহ বেয়ে অনেকখানি নিম্নগত হ'য়ে পড়েছে। সুরেন্দ্রমোহন অক্ষতই আছেন। কেবল শেষের দিকে তাঁর পায়ের কাপড় কিছু রক্ত হ'য়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। কারিক ভট্টাচার্য মহাশয় এসে সেটুকু বাঁচিয়েছেন। যা হোক, সুরেন্দ্রমোহনকে অবশ্য হেপনে যেতে হ'ল। সেখানে তাঁর নাম ধাম লিখে নিয়ে এবং সম্ভবতঃ ৫ টি ভট্টাচার্য মহাশয়ের জামিনে ছাড়ান ছেড়ে দেওয়া হ'ল। যথাকালে মোকদ্দমা দায়ের করা হ'ল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। বিচারে সুরেন্দ্রমোহনের জরিমানা হ'ল কুড়ি টাকা। কিন্তু অনুমান করি তাহাতে ব্রিটিশ রাজিয়ত্বার সেই ব্যাকরণের মর্মবোধহীন ছাপরা বা মতিহারীর কিম্বা গাজীপুরী বা গোরকপুরী অফিসিয়ল মনে রাজা জীবনে আর কোন দিন বাঙালী পরিবারের আমাতা হবার কামনা উদয় হয় নি।

সুরেন্দ্রমোহন জীবিত আছেন। বয়স তাঁর হয়েছে ষাটের উপর। ১৯৪১ বা ২২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মহীন পিতৃদেবের সঙ্গে তিনিও কারাবরণ ভোগ করেছিলেন।

যাক্ এখন পূর্বকথায় আসা যাক্। যখন আন্দোলন আরম্ভ হবার পর যতীন্দ্রকুমার দু' তিন জন সঙ্গীসহ রংপুরে এসেছিলেন এবং পিতৃদেবের সঙ্গে যোগ স্থাপনা করেছিলেন। তাঁদের এক দিন পিতৃদেবের সঙ্গে ব'সে আলাপ করতে দেখেছিলাম। অনেক সময় তাঁরা ইংরাজীতে কথা বলছিলেন। একটা ইঁট বাতাবী লেবুর আকারের বোমার মুখ খুলে কিছু ইটের গুঁড়োর মতো চূর্ণ বের ক'রে তাই মালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চূর্ণটা ঠিক বারুদের মতো দ'মে গিয়েছিল। অনুমান করি যতীন্দ্রকুমারের সঙ্গীদের মধ্যে একে আলিপুরের বোমার মামলার রাজসাক্ষী ও জেলের হাসপাতালে কানাইলাল ও সত্যেন বসুর বিষলবারের অভিনেতা নরেন গোসাইও ছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অল্পদিনের মধ্যে পর পর বাঙালীদের পক্ষে অভাবনীয় কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমা মেরে হত্যা করা হ'ল। কিন্তু আসল ব্যক্তি বেঁচে গিয়ে তাঁর পরিবর্তে দুজন মহিলার জীবন গেল। প্রফুল্ল চাকী নামে পরার মুখে বিষলবারের অভিনয় আত্মহনন করলেন। ক্ষুদিরাম হাসিমুখে ইংরাজের ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। পুলিস মানিকতলায় মুরারিপুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার করল এবং বেছে বেছে যতীন্দ্রকুমারের বৈপ্লবিক দলের প্রায় সকল সভ্যকে গ্রেপ্তার করল, অরবিন্দও বাদ গেলেন না। পরে অনুমান করি এই বিপ্লবীদের মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোসাইয়ের স্বীকারোক্তির বলে আলিপুর সাহিত্যে দ্বিতীয় বার ধানাতল্লাসী হয় এবং এইবার পিতৃদেব গ্রেপ্তার হন। সেই সময় পুলিস শনাক্ত করে যে ক'জনকে গ্রেপ্তার করে। এঁদের একজনের নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত যতেন্দ্রনাথ লাহিড়ি ওরফে যদি লাহিড়ি ইনি শহরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত সূর্যকান্ত লাহিড়ির কনিষ্ঠ পুত্র, নবীন যুবক। আর একজনের নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার (উকীল আশুতোষ মজুমদার নয়), ইনি বোধ হয় কোনো জমিদারের এস্টেটে চাকুরি

হয়তো। এই ঝিনঝিনুক আদায়ে ব্যর্থ হয়ে পুলিস একটা মামলা রুজু করে—অপরাধ হচ্ছে যাত্রায় বিঘ্নের সৃষ্টি (waging war) ও নৈতিক ভাবাতির ঘটানো।

যাহোক যাত্রাওয়ালা ও ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রেপ্তার হন এক শনিবারে। রোববার ছুটির দিনে জামিনের আবেদন গ্রাহ্য হতে পারে এই হিসেবটা পুলিসের মনে ছিল। তিন দিন হাজত বাসের পর সোমবার বিকেলের দিকে তিনি জামিনে খালাস পেয়ে ফিরে এলেন। তাঁর এই সময়কার চেহারার ছাপ আমার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে এবং পরে আর কোনোদিন এমন উজ্জ্বল মূর্তি তাঁর দেখি নি। সেই সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মহা হাসি খুশির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। সেই সময়ে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে যেন তাঁর মুক্তিলাভ ঘটেছে।

তখন কেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিস্টার ভান্স (Vans) নামে এক ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক। এঁর এজলাসে প্রথমে তিন আসামীকে অভিযুক্ত করে মামলা সুরু হ'ল। এই মামলা কিছুদিন অন্তর অন্তর দিন কেলে কয়েক মাস চলেছিল। কিন্তু শুরুতেই গোড়াতেই প্রধান সাক্ষী নরেন গোঁসাই কলিকাতায় নিহত হওয়ায় পুলিশ বড় খুঁটি হারাতে বাধ্য হল। এবং শেষাশেষি সরকারপক্ষ এই মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই ধাক্কায় পিস্তলের চাবুকটা খতম হয়ে যায়।

এই সূত্রে তখন একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটি কতদূর সত্য তা বলতে পারি নে। কিন্তু গল্পে অনেক সময় তার নিজস্ব ধর্মই শ্রোতব্য। সুতরাং গল্পটি আমি বলছি।

আমাদের বাড়িতে দ্বিতীয় বার যাত্রাওয়ালা হবে এই সংবাদ পিস্তলের পূর্বেই পেয়েছিলেন। পুলিস মহলেও [illegible] ছিল না। এই সময় [illegible] দুটো ছাড়া পিস্তলের কাছে আরো দুটি অস্ত্র ছিল, [illegible] একটি হচ্ছে একটি রাইফেল জাতীয় বন্দুক। এই দুটিই আমি দেখেছিলাম [illegible] দোকানের দেওয়ার তলোয়ার দুখণ্ড লাঠি, যাদের ইংরাজী এল্-এর আকার। কিন্তু [illegible] একটা ছিদ্র একটা ছিদ্রের স্থানে চাপ-দিয়ে বাঁট ধরে আকর্ষণ করলেই তাঁপা লাঠি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বাটের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় খাপখোলা একখানি হাত-দুই [illegible] তরোয়াল। এর ভয়োদ্দীপক কিছু নেই। রাইফেলটি দেখতে সাধারণ সৌটাদার বন্দুকের মতো। তবে সৌষ্ঠব [illegible] অত ভারী নয়। আর নলের ভিতরে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায় যে তা সাধারণ বন্দুকের মতো [illegible] ঘুরানো বা পাঁচানো ধাঁজ কাটা (Spirally grooved)। সেই জন্যে এর বুলেট সোজা ছোটে না, একটু পাক খেতে খেতে ছোটে, তাতে নাকি লক্ষ্য ভেদটা আরো সুচারু রূপে হবার সম্ভাবনা বাড়ায়—সাধারণ বন্দুকের গুলি বা সোজা ছোটে তার নাকি লক্ষ্য ভেদের বাধ্যার সম্ভাবনা থাকে—এই হচ্ছে নাসিকাস্ত্র বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য। এই দুটি অস্ত্রেরই লাইসেন্স ছিল না। বলাবাহুল্য লাইসেন্স পাবার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না।

যাহোক যাত্রাওয়ালা হবে শুনে পিস্তলের এই দুটি অস্ত্রকে কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলবার মতলব করলেন। এবং ভেবে ভেবে নিরাপদতর স্থান আবিষ্কার করলেন তাঁর আপিস। এবং সেইখানেই এই অস্ত্র দুটিকে লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় বার যাত্রা যাত্রাওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করবার ওয়ারেণ্টও

বেড়িয়েছে এ-খবর তিনি পান নি। তিনি মনে করেছিলেন প্রথম বারের মতো বাড়ি খানাতল্লাসীতেই হয় শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর আবার তিনি অস্ত্রগুলি আনিয়ে নিতে আসবেন। [illegible] তিন দিন হাজত বাসের ফলে এই হিসেব ভেস্তে গেল।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ছিলেন পিতৃদেবের পরের কর্মচারী। তাঁর আবাস ছিল আমাদের পাড়াতেই। তিনিই পিতৃদেবের কাছে খবর আনেন। যখন তিনি আসিয়ে অস্ত্র দুটি আবিষ্কার করেছিলেন তখন পুলিস সাহেবের চক্ষুদুটি যে কেমন বিস্ফারিত হ'য়ে কি রকম গোলাকৃতি ধারণ করেছিল তা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। তাঁর গল্পটা যদি সত্য হয় তবে অনুমান করতে হয় যে মৈত্র মহাশয় অস্ত্র দুটির একটা বিলি ব্যবস্থা গোপনে করেছিলেন। কেননা ও নিয়ে আর কোন গোলযোগ হয় নি। পাশুক বন্দুকটি আবিষ্কার করে পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে কি রকম বিমর্ষ কাঠখোট্টা ভাব হয়েছিল যে এটির পাশ আছে তা মনে পড়ছে।

উত্তর বঙ্গের বিপ্লবীদের সঙ্গে পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তা ছাড়া সেই সময় গুলছিলাম তাঁকে আচার্য, ক'রে বরিশালের মধ্যেও একটি বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি বা সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। পিতৃদেব ছাড়া এই সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যেরা বৈপ্লবিকব্রতে কে কি করেছিলেন তাই আমি জানি, কিন্তু তাঁদের সেই ব্রতেরও একটা মূল্য ছিল—আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা ইচ্ছা, এই যে মনে পেছোর কথা, এরই মধ্যে উক্ত হয় বীজ, যা একদিন-না-একদিন পরিণত হয় মহীরুহে, তারপর ফুল ফোটে এবং ফলের আবির্ভাব অবিসম্বাদিত হয়ে ওঠে।

এর পর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। তাঁরই নেতৃত্বে দেশের মুক্তির জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে মহীন্দ্র পিতৃদেব সর্বস্ব প্রাণে মেতে যান। [illegible] তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ব'লে মনে হয়। তিনি স্বভাবতই ছিলেন সাদাসিধা প্রকৃতির, মহাত্মা গান্ধীর সহজ ও সরল অনাড়ম্বর জীবন-বেদও তাঁকে আকর্ষণ করবার কথা। যা হোক, স্বদেশী আন্দোলনের যোগ থেকেই আমাদের বাড়িতে বিলিতি কাপড় ঢোকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন থেকে [illegible] ব্যাপারে তিনি খদ্দর ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করতেন না। শীতকালেও তাঁকে গরম কাপড়ের কাপড় [illegible] দেখি নি। উত্তর বঙ্গের শীতও তিনি মোটা খদ্দরের চাদরে কাটিয়ে দিতেন। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তিনি একাধিক বার জেলখাটাও [illegible]।

তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল [illegible] উনসত্তর বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়।

এই পিতৃদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী।

মহীন্দ্র অগ্রজ সম্পর্কে বাল্যকালের [illegible] যা আমার স্মরণে রয়েছে তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ ধৈর্য বা পুরুষকারের কথা, সেটা কারুরই নয়—তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কিছু [illegible]। এই সময় বাংলা একটি দোহা ছিল। দোহায় [illegible] যে সকল বালক-বিদ্রোহী, শ্যামল তুরু, নীরদ বনবীথি, মধুর মধুরী, সুকুমার কেকাকলাপ ইত্যাদির কথা মনে উদয় হয়—কিন্তু

মুখী-পরিমল আশিতে সকল মধুপে
ডাকিছে যাহারা তমাল তুরু তিমিরে

জাগো সহচরী, আজিকার দিনি ফুলে-ফা
নীপশাখে বাঁধো দুলনা।
ফুল্ল পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে বিদল অলকে অলকে
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে নবী ফুল ডোরে বাঁধো দুলনা।

এই হরিষের যে একটা জলজোকের আলেখ্য চিত্তে জেগে ওঠে তেমন কিছু নয়। নিতান্ত গভবয় ব্যাপার। চওড়ি বংশোদ্ভূত দীর্ঘ দড় একটি প্রকাণ্ড আম গাছের ডালির সঙ্গে সমান্তরাল একটা ভালে বাঁধা, তারই নিম্ন প্রান্তরে একখানি একহাত পরিমিত বংশখণ্ড প্রদিবদ্ধ। এই একহাতাধিপতিত্ব নিয়ে বাধত সমর। প্রফুল্লচন্দ্র আমার চাইতে ছিলেন দু'বছরের বড়। সুতরাং দৈহিক শক্তিতে তাঁকে এঁটে ওঠা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু আমার একটা বিশেষ কৌশল ছিল। এই কৌশলটা কি, তা প্রকাশ করলে এখন অস্ত্র-সমাজে অপদস্ত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকলাম।

কিন্তু এই সময় সংক্রান্ত ব্যাপার ঘটত ব'লে যে অগ্রজের সঙ্গে আমার সদা সম্পর্কিত কোনো যোগ ছিল না, তা নয়। যেমন, ধরা যাক, যাত্রাগান শুনে এলে—

হাঁ, ভালো কথা, এইখানে একটা বিষয় স্পষ্ট ক'রে রাখা যাক। ঘটনাচক্রে আমি লেখক ব'লে গিয়েছি। [illegible] বিখ্যাতও হ'য়ে থেকে পারি। তখন বাল্যকালে আমার নানা গুণপনার গল্প রচিত হ'তে [illegible] এইখানে স্পষ্ট ক'রে দু'টি প্রতিবাদ জানো আমার মতে কোনো রকমের কিছু অসাধারণত্ব [illegible] আমার [illegible] ছিলাম যা সত্যকথা বেশোম যে বেশোম না তাহিতে [illegible] ভক্তমাত্রেই ধীর ধরার যোগ্য ব'লে মনে করা যেতে পারে।

আমার বাল্যে আমাদের পাড়ার বাস করতেন কলকাতার [illegible] শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ [illegible]। [illegible] নাতির বর্তমান। এই বরদাবাবুর প্রতাপে এঁর আমলার ম্যানেজার পর্যন্ত কম্পান্বিত-কলেবর হ'তেন। এই প্রতাপের কথা স্মরণ করেই বড়দের মধ্যে এমন দু'একজন এঁকে অভিহিত করতেন বড়দা দুর্গাবাবু ব'লে। এঁর দুর্গে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হ'ত। প্রতি বছর যাত্রাগান হ'ত। তখনকার দিনে বিখ্যাত যাত্রা ছিল মতিলালের যাত্রা। এই মতিবাবু ছিলেন স্বর্গত্রয়োদশীর ধর্মপুত্র। সেই সময় বোধ হয় বছর বছরই পূজার সময় তিনি তাঁর যাত্রাপার্টির দল নিয়ে আপনার ধর্ম-মার পুরে আসতেন। মতিলালের বিখ্যাত পালা ছিল রাবণ বধ। এই পালার জন্যে তৈরি অভিনব রীতিমত রথ আসরে নিয়ে আসা হ'ত মনে পড়ে—রথ যানে দুই করবার রথ নয়। অর্থাৎ যে-রকম রথে সার্থিসারথি সারথ্য করেছিলেন, সেরকম রথে সুতরাং অন্য নয়। নিয়ে [illegible] আপনার তাবী গন্তব্যস্থলে গিয়ে উঠেছিলেন। তখন যাত্রাগান সম্পূর্ণ মুখরোচক হতো করে যা দিয়ে আসর [illegible]—এমন কি মোটামুটি মুখরোচক মতোও নয়। যাত্রাগানের অন্তরে [illegible] ও মুখ এইরকমই ছিল তখন

আমার পক্ষে প্রধান উপভোগের ব্যাপার। যা হোক্, এই ধারণার যাত্রাপথ শুনবার পর, একদিন যাত্রা করা খেলা করবার উদ্দেশ্যে ওপ্রকে আহ্বান করে বলেছিলাম—"লাল যে ঘোড়া দুই ঘোড়ায়, আমি হই যদি।"

বাক্যটিকে ফেরোম্ কি ফেরেন্স্ কি ওড্ হাউস্ প্রসেসার্ড ফিডিং দিতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যে যে-টুকু ধাতব আছে তা প্রতিভা-প্রসূত নয়, তা শিশু-মনের মাতৃভাষার জ্ঞানের অভাব-প্রসূত।

সে যা হোক্, তাই বলছিলাম, আমার ওপ্রকের মনে সত্য সম্পর্কিত যে কোনো বোধ ছিল না, তা নয়।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে কি-রকম আজগুবী গল্প রচনা ক'রে থাকে লোকে, তার পরিচয় সম্প্রতি কিছু দিন আগে পেয়েছি। এই স্মৃতিকথার পাঠক পাঠিকাদের তা উপহার দিচ্ছি।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩র ১৬ই ভাদ্রের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় নিম্নের গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্প হলেও সত্যি

বাংলা দেশের একটি দুরন্ত ছেলে। বয়স তার সাত, কিন্তু দুষ্টামিতে সে সতেরোকেও হার মানায়। আত্মীয়েরা অতিষ্ঠ হ'য়ে ঠিক করলেন, অতএব, ওকে বিলেত পাঠিয়ে দাও।

তাই করা হ'ল। বিলেতে বইয়ের মধ্যে আটকে রেখে হ'ল ছেলেটিকে। কিন্তু হ'লে হবে কি, তার মধ্যেও সে দুরন্ত। সহপাঠী বন্ধুবান্ধব সবাই ব্যতিব্যস্ত। তারা বলে ওর এই বাড়বাড়ন্ত আমরা সহ্য করতে পারছি না। এগজামিনে ফার্স্ট হওয়া প্রায় সব কটা ভাষায়, এই বয়সে পণ্ডিত হওয়া, প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের ছেলে এসে আমাদেরকে পরাজিত করা আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। যে-কোনো বিষয়ে ওকে না হারাতে পারলে আমাদের আর শান্তি নেই।

একজন বললে—"কিন্তু কিসে হারাবে ওকে? ওতো সব বিষয়েই পণ্ডিত।"

সবাই চিন্তিত হ'য়ে বললো—"তাই তো।"

একজন হঠাৎ বললে—"আচ্ছা খুকি বন্দুক ছুঁড়তে পারে?"

সকলে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সত্যি তো, এক তীরুই তো হল সাধারণতঃ ভারতবাসীরা—বিদেশে গিয়ে বাঙালীরা—"ঠিক আছে তাহলে ওকে।"

ছেলেটি এলো। সহাস্যে বললে—"কি ব্যাপার?"

একজন এগিয়ে এসে বন্দুকটি তার হাতে দিয়ে বললে—"ওই যে দেখছো পাখিটি ওটাকে গুলি ছুঁড়ে মারতে হবে তোমাকে। মারো।"

তাই নাকি? গুড্‌ম্।

ছেলেটির একটি গুলিতেই পাখিটি মাটিতে প'ড়ে গেল।

যে-কয়জন বৃদ্ধ একজন এই অপরাধের ছেলেটিকে অন্ততঃ একটা বিষয়ে পরাজিত করতে পারবে—এই আনন্দে অধীর হয়েছিল তারা সবাই আবার মুষড়ে পড়লো।

ছেলেটি হেসে উঠল—হা হা হা।

কে জানে এই সন্ন্যাসীর ছেলেটি ? ইনি হচ্ছেন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান—ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

এই গল্পে তিন তিনটি বিদ্যা স্থান পেয়েছে।

প্রথম বিদ্যা—অরবিন্দ বালো দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন, এমন কথা কোথাও শোনা যায় নি এবং এর কোনো প্রমাণও নেই।

দ্বিতীয় বিদ্যা—দুরন্তপনার জন্যই অরবিন্দকে বিলেত পাঠান হয়েছিল, এটা ইতিহাস নয়, এটা উপন্যাস বোঝাচ্ছে। কিন্তু দুরন্তপনা ব্যাপারটা লেখকের প্রমাণ করবার কথা যে ওটাকে তিনি প্রাণ খোলার রঙের গোলাপ ক'রে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী জীবনে যিনি বিপ্লবীদের দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন, বালক হলে তাকে কিশোর ক্লাইভ বা বালক সুরেন বিশ্বাস কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে "ট্রিলবি"র ইঞ্জনাথের অনুরূপ মূর্তিতে খাড়া করতে না পারলে নিতান্ত আদুনে আদুনে লাগে। তাই এই রোমান্টিসিজম্। কিন্তু বোধ্যাক ইতিহাস নয়।

তৃতীয় বিদ্যা—কিশোরে বাস করে অরবিন্দের জীবনে ঐ রকম পাখী মারার মতো কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

বিদ্যার ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই রকমের বাড়াবাড়ি করার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এই [illegible] যাতে ব্যক্তিদের প্রতিভা [illegible]

[illegible] বিদ্যা হোক, তা থেকে আমরা একটা বিষয় জানতে পারি। আমরা জানতে পারি [illegible] পড়িয়ে অত্যন্ত অস্বাভাবিক পড়ানোর এবং বিশেষ ক'রে পরোপকার-প্রবণ। সেখানে কোন পাখির পালো বন্ধুকে সন্তোষ করবার প্রয়োজন হলে এই পাখিরা দুরকমে বা তেড়ে ফুঁড়ে বা স্টার্ভেশন্ দিয়ে হাজির হয় এবং একটা সুবিধা মতো স্থানে বুক পেতে দিয়ে বসে। 'কী obliging!'

তা ছাড়া এই পালানো গল্পের লেখক উপরন্তুকে স্পষ্টই করবার অর্থাৎ ওপরওয়ালাকে জব্দ করবার যে পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছেন সেটাও অপূর্ব। এই পদ্ধতি অবলম্বনে রামমূর্তি পালোয়ান গিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে বলতে পারতেন —তুমি আমার মতো বুকে হাতি নিতে পারো? কিম্বা ব্যানটাম সুইট স্যাটেলকে আহ্বান ক'রে বলতে পারেন—এসো দেখি, ধরতে তোমায় কেমন কেরামতি।

পথা হোক এ-প্রসঙ্গ-এইখানেই ছেড়ে দেওয়া যাক্।

এরবিন্দের সম্পর্কে বাল্যের আর একটি চিত্র আমার মনে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই ঘটা ভূমিকম্প হয়েছিল। তারো পূর্বেকার কথা। আমরা তখন [illegible]

যে বাড়িতে বস্তুত সেটা তার নিজস্ব গৃহ ছিল। এই গৃহে সম্ভবতঃ কাদিনীর মৃতি ধরা হ'ত। এই জেলায় কাদিনীর হাতেই স্থাপিত ছিল এই স্কুল। এই স্কুলে তখন প্রফুল্লচন্দ্র পড়তেন। অঘোর পিসেমশাই আর সম্ভবতঃ আমার মাসতুতো দাদাও তখন এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে এই স্কুল-গৃহটি ছিল প্রায় দেড় মাইলের কাছাকাছি। একবার সরস্বতী পূজার সময় বিকেলের দিকে এই স্কুলে আমি গিয়েছিলাম—অর্থাৎ নীত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিলাম—এই কথাটেই বলতে পারা যায়—আমার তখন বয়েসটা কি। এই বিদ্যালয়ের ইমারতের কোনো চেহারাই আজ আমার মনে নেই শুধু মনে আছে পিসেমশাই দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের পরিবেশনে রত ছিলেন। সেই অবস্থাতেই পরিবেশনের পাত্র হাতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এসম্পর্কে আর কিছুই মনে নেই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে সম্ভবতঃ এই স্কুল গৃহের ধ্বংস হয়। এর পর যখন এই স্কুলে আমি ভর্তি হই তখন এর নামাবলী অন্যরূপ। যে বছর আড়াইয়ের মতো আমি এই স্কুলে ছিলাম সে আড়াই বছরে তুবার স্থান পরিবর্তন ক'রে তিনটি বিভিন্ন গৃহে এর জায়গা হয়েছিল। এর শেষের গৃহটি ছিল পাকা। এই গৃহেরই কাছে ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির, যার কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি (১৩৫৯ শ্রাবণের সংখ্যা "প্রবাসী"তে)। পরে মাইনার স্কুলটি এখান থেকেও উঠে অন্যত্র যায়। এবং ১৯০৫ কি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই গৃহটিই নিয়ে এর দক্ষিণ দিকে এক আঙিনা রেখে তার তিন দিকে দালান তুলে চকমিলানো এক বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা হয় জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য। জাতীয় বিদ্যালয় প্রথমে স্থানীয় এক সভা গৃহে এবং তার সন্নিকটে আর একটি পাকা বাড়িতে বসেছিল। চকমিলানো পরিকল্পিত বাড়ির পুরাতন গৃহটির পক্ষে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিককার ঘরগুলি নির্মিত হ'য়ে গেলেই জাতীয় বিদ্যালয় উঠে আসে। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কেমিক্যাল স্টোরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাদিনীকান্ত কর মহাশয় দুজনও এর এক অংশে এসে বাস করতে থাকেন। পূর্বে এঁরা উভয়ে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের গৃহটির পরিবেশ ছিল অপূর্ব। এর একদিকে কাছে প্রায় গা ঘেঁষে মাত্র একটা গলির ব্যবধানে ছিল পণ্ডিত রাধেশচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ি। একদিকে (দক্ষিণে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির। একদিকে (উত্তরে) একটি নির্মীয়মান এবং সদ্যে যে দুটি তিন ঘর বাঙালী ক্রিশ্চান্ ছিলেন তাঁদের বাসগৃহ— এঁদের অন্যতমার এক ছেলের মজুমদারের নাম শুনেছি, এঁদের ইন্দু নামে এক যুবক ছিলেন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। পরম চাউনি ছাড়া রাজসাহী গিয়ে কাপ্ জয় ক'রে আনে এখন সেই একাদশের মধ্যে বোধ হয় ইন্দুও ছিলেন একজন খেলোয়াড়। মনে হয় তিনি খেলতেন হাফব্যাকে আটটে—বোধ হয় লেফ্ট আউট্। যা হোক্, বলছিলাম জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থানটির পরিবেশের কথা। ওর কাছেই আবার ব্রিজনন্দনের এক আড়ত্। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরটির দক্ষিণে একটা গলির ওপারে একটি মসজিদ্ যদিও পুরাতন ভাঙা এবং অব্যবহার্য। কাছেই সদর রাস্তার উপরে একটি দরগাহ্। অর্থাৎ স্থানটি ছিল যেন একেবারে ভবিষ্যৎ জাতীয় ভারতের প্রতীক স্বরূপ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যেমে ফিরে যেমি জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেছে এবং সেই কৈলাসরঞ্জন মাইনার স্কুল হাই স্কুলে পরিণত হয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ের গৃহ অধিকার ক'রে রয়েছে। সরস্বতী পূজার দিন এখানে গেলে প্রাঙ্গণে কৈলাসরঞ্জন স্কুলের শিক্ষক (যাঁর কাছে

আমি পড়েছিলাম) শ্রীযুক্ত ললিত সেন মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। যার এই সেই প্রাঙ্গণ যেখানে একদা দেশমাতার অকৃত্রিম পূজারী ৺মনমথনাথ চক্রবর্তীর কণ্ঠ থেকে উদ্দীপনাময়ী বাণী উৎসারিত হয়েছিল, যেখানে একদিন মনীষী নিবেদিতার উদার কণ্ঠের গভীর বাণীতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ললিত সেন মহাশয় আমাকে অভ্যর্থনা করে বসালেন—"এসো-এসো, এ তো তোমারেরই ঘর।" কথাটা হয় তো তিনি ভ'রসে ই বলেছিলেন কিন্তু এই সেই স্কটিশ বিদ্যালয় যেখানে আমি পড়েছিলাম—আর এক, এ সেই কৈলাসরঞ্জন ঘুণ যার হাত একদা আমি ধরেছিলাম। পরিবর্তনশীল সংসার! আচার্য নন্দলাল বসুকে আমরা যথার্থই বলে বর্ণনা করেছেন। কারা যখন ছায়া ফুটি করে তখন আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি, ছায়া যখন মিলিয়ে যায় তখন তা আমাদের চিত্তাকুল ক'রে তোলে, তারপর যোলআনা হতাশ হই যখন মায়া মিলিয়ে যায় মরীচিকাতে। All-clover cosmic rose আমাদের ভাষায় মহামায়ার লীলা।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্র যখন বৈদ্যনাথরঞ্জন স্কুলে পড়তেন তখন একদিন ছুটির পর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তিনি নিচে বাঁধানো পাথরের উপর প'ড়ে যান। প'ড়ে যান মানে অন্যভাবে যে উল্লেখ করা না, উপস্থিত ঐ পথাত বয়স্কদের অন্যতম কারণায়। সম্ভবতঃ তিনি সর্বসাধারণের মতো রেলিংটা ধরে না নেমে balus trade-এর উপর দিয়ে balance করতে করতে নামছিলেন। কিন্তু যে ভাবেই নামুন নিচে প'ড়ে গিয়ে তাঁর মাথা কেটে যায়। এই অবস্থায় তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। প্রতিদিন ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ খুলে তাঁর ক্ষত ধুয়ে আবার ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে যেতেন। একদিন এই সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। ব্যাণ্ডেজ খুলতে দেখলাম ঠিক তাঁর কপালের মাঝখানে প্রায় ইঞ্চি দুই দীর্ঘ ও ইঞ্চি [illegible] একটি লাল রঙ্গরঙ্গে গভীর ক্ষত। তাঁর এই ক্ষতটি আমার মনে বিশেষভাবে মুদ্রিত হ'য়ে আছে [illegible] তাঁর [illegible]। কিন্তু তাঁর ললাটের ঠিক মধ্যখানে বিধিলিপির মতো একটি [illegible] ক'রে [illegible] প্রফুল্লর কপালে রাজটিকা লাভ করেছে। পরিহাস-[illegible] আসলেই ঘটি।

[illegible] কাল প্রফুল্লর সম্পর্কে কোনো স্মৃতিই আমার মনে নেই—কোথাও তাঁকে পাই নে। তারপরে আমি পাঠশালা অতিক্রম ক'রে মাইনার স্কুলে বছর আড়াই কাটিয়ে যখন জিলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম তখন প্রফুল্লচন্দ্র ওরফে পাই সেই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। অভিভাবকদের পোষন হিসেব যোগটা এখন প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রজীবন ছিল একটা অবিমিশ্র বরযাত্রা। বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন—ঐ স্থানটি তিনি পুরোপুরি কায়েমী করে নিয়েছিলেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী। নরেন্দ্রনাথের ছিল তাঁদের ক্লাসের দ্বিতীয় স্থান। প্রফুল্লচন্দ্র যেমন বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান কায়েমী ক'রে নিয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথ তেমনি নিয়েছিলেন দ্বিতীয় স্থান।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সত্যকার মেধাবী ছাত্র। তিনি প্রথম হতেন পরিশ্রমের ফলে নয়, মেধার জোরে—যে মেধার গতি সুস্থ ও অব্যর্থ। তাঁর পড়াশুনার মধ্যে আতিশয্য ছিল না। বীর চুঁচুড়ার সময় উঠে "পড়িয়াও বি সেকেণ্ড", "পড়িয়াও বি সেকেণ্ড" ব'লে আকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে পরিবারস্থ লোকদের অর্থাৎ

ক'রে তোলা কিম্বা রাত এগারোটা পর্যন্ত রাত জাগিয়ে বৈয়াশিক অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গীতের মতো নীরস সংস্কৃত অথবা ছুটির দিনে বিপ্রহরে জ্যামিতির এক্সট্রা কোলে নিয়ে পেন্সিল কামড়ে ঘরে ভয়ে ভয়ে গোপাল ভাঁড় প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রজীবনে কখনো ঘোর নি। বালক বয়সের অসংখ্য রাশী লওয়া-নিটিয়ে ছাড়া ছাত্র জীবনের কঠিনতর অধিকাংশ হতেন। প্রতি বছর জিলা স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় কবিতা আবৃত্তি ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের একটি কায়েমী ব্যাপার। তাঁর আবৃত্তির তিনটি-চারটার কথা আমার মনে পড়ে। এক—অরবিন্দের মনোহরার মেঘে —প্রলয় পয়োধি জলে ইত্যাদি বেদম্ ইত্যাদি, দুই—কাবিনী রায়ের প্রথম—নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ, এ-ধরা কি শুধু বিষময়, তিন—প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর—আমি বিব না ছাড়ি আমা আমি বিব না ছাড়ি ইত্যাদি —এই কবিতাটির প্রতি কারণে (reasons) আকৃষ্ট ছিল ঐ লাইনটি। বিনয় নামে এক তেলুড়ির ছেলে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী। এর ছোট ভাই সনৎ ছিলেন আমাদের ক্লাসের ছাত্র। এই বিনয় প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর "আমাকে" নামক কাব্য গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। মফস্বলের তরুণদের কাছে মোটা ও মসৃণ কাগজে ছাপা, গাঢ় নীল রেশমী কাপড়ে বাঁধাই, সোনালী অক্ষরে বাঁধানো মলাটের উপরে গ্রন্থকার ও গ্রন্থনামের নাম লেখা। এর প্রথম কবিতাটির নাম ছিল "আমাকে"। তাই থেকে গ্রন্থের নামকরণ। এই গ্রন্থেই ছিল "আমি বিব না ছাড়ি" কবিতাটি। এসব অবশ্য যুগের আগেকার কথা—খুব বেশী আগেকার নয়। তবু তখনও ভারতে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের টনক নড়ে নি। সুতরাং এসব সম্বন্ধে কোনও সতর্কতার কথাও ইংরেজদের মনে উদয় হয় নি। ভারতবাসীর সম্বন্ধে হয় তো তখনো "আবেদন আর নিবেদনের যাত্রা ব'য়ে ব'য়ে নত শিরে" এই ছাবটাই ইংরেজের মনে স্পষ্ট হ'য়ে বিরাজ করছিল। তলে তলে যে কী বিরাট বিস্ফোরক বস্তুর স্তূপ জমা হ'য়ে উঠেছিল, তা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পান নি।

এই সময়ে এক বছর এক অভাব বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে। পূরব ঘ-বিতরণী সভায় সঙ্গীতের আমদানি করা হয়। এটাকে অভাবনীয় ব্যাপার বলছি ব'লে এখনকার সবাই অভাবনীয় বোধ করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সময় সভায় বিষ্ণুটির কি রকম একটা আবছা আবছা ভাবের ছুনমি ছিল—অন্তঃ আমাদের সেই ঘুঘুর বয়সকাল পর্যন্ত ছিল। নুহা ও গীত ও-দুটো বিদ্যা যেন গণিকালয়ের, বক্তৃতার বেশ্যালয়ের ব্যবহারের। কিম্বা দু'এক খানি ভজন গান অথবা সংস্কৃতের মুদ্রণ ও কবিতার প্রস্তাবিত স্থানের সঙ্গে 'হরি হরি ব'লে করে যাবো চ'লে ছাড়ি' এই জন্য ভাবি ব'লে আমার গান গাওয়া যেতে পারে কিন্তু সাধারণ ভাবে সঙ্গীতটা ভদ্রলোকের কোঠাতেই পড়ে—এই ছিল যেন মনোভাব। বকে যাওয়া ছেলেরাই গান গায় যেমন ক'রে ব. ছেলেরাই সিগারেট খায় ঠিক এই। একটা এ-বছরে নৃত্যগীত ইত্যাদি চৌষট্টি কলার অধিকারিণী হবার প্রস্তাব করলেন, আর সেই নৃত্যগীত এই সময় হ'তে উদ্ভাবিত হলো ভদ্রলোকের আজ্ঞাধীন লক্ষণ।

এই সূত্রে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। গান ব্যাপারটা যে এই সময় বাঙালী হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানে কোন্ স্থান অধিকার করেছিল এই ঘটনায় তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

আমি যিলা স্কুলে ভর্তি হবার বোধ হয় দু' এক বছরের মধ্যে যোগেশ মাষ্টার মহাশয় মারা যান এবং একজন নতুন হেডমাষ্টার আসেন। যিনি এলেন তাঁর নাম ছিল বিনয় বসু। এঁদের মধ্যে যোগেশ স্বরূপ

ছিল "চন্দ্র" কিংবা "কুমার" কিংবা আর কিছু তা মনে নেই। আর যিনি এলেন তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ওপরে বিশ্বাস যে ইনি গ্র্যাজুয়েট ছিলেন না। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, স্কুল মাস্টারির কৃতিত্বেই ইনি গভর্নমেণ্ট নাম ফুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর ছিলেন খুব বিবেকসম্পন্ন এবং ছাত্রদের সুপ্রচুর যত্ন নিয়ে পড়াতেন। কিন্তু এঁকে ছেলেরা বেশি ভয় করত। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে ইনি চোখরাঙা ছিলেন যমদূতের মতো, বা এঁর গলার আওয়াজটা ছিল বাঘের মতো, বা এঁর চলন ছিল হিংস্র পশুর। বরং এঁর চোখায় একটা মানসিকতার আভাসই ছিল এবং এঁর গলার স্বর ছিল এমন নিচু পর্দার যে ছেলেরা এঁর কানাকেচার করবার সময় (যদিও সবাই জানেন যে কোনো শিক্ষকের এ সৌভাগ্যটা ঘটে) এঁর গলার স্বরে নোট করতেন অনুনাসিকত্ব, আর এঁর চলনটাও নিতান্ত নিরীহ ও নিরুপদ্রবী ধরনের। কিন্তু ছেলেদের শিষ্টোচারবর্জিতা অর্থাৎ discipline সম্বন্ধে এঁর ছিল অত্যন্ত দৃঢ় মুষ্টি। এই ছিল ছেলেদের ভয়ের কারণ। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীটি বসত স্কুল গৃহের বাইরের বড় ঘরটাতে। এই ক্লাসে মাস্টার মহাশয়ের চেয়ার ও টেবিল ছিল উঁচুতে একটা ছোট খাট তক্তপোষের উপর। এই স্কুলের ইমারতটি এমন ভাবে নির্মিত হয়েছিল যে এই ঘরে ঢ'কে ডাইনে ও বামের দুই দরজা দিয়ে স্কুলগৃহের দক্ষিণ ও পশ্চিমের দুই প্রান্ত পর্যন্ত বারান্দার দুই চলত। এইখান থেকে সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয় যদি দেখতে পেতেন যে, কোনো ক্লাস থেকে কোনো ছাত্র বাথরুমে যেতে যেতে অমনি তিনি তাঁর উচ্চাসন থেকে ছুটে গিয়ে সেই ছাত্রটিকে আবিষ্কার ক'রে তার কৈফিয়ৎ তলব করতেন যে ক্লাসে যখন পড়ানো হচ্ছে তখন সে কেন বাইরে গিয়েছিল। এসব হচ্ছে আমার শোনা কথা। নিজের চোখে আমি এ-রকম কিছু কোনোদিন দেখি নি। তবে ঠিক যে ঐ সম্পর্কে দুর্ঘটনা তাঁর কিছু ঘটেছিল। তবে তিনি সহিদে ছিলেন না, ছিলেন [illegible] তাঁর কোনো ভাবনা ছিল না।

[illegible] ছাত্র। এই সময়ে নিচের দিকের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে এগারোটার [illegible] ঘণ্টা বাজানোর ভারটা ছিল। এই দলে কিছুদিন আমিও ছিলাম। আমাদের যারা মাথার [illegible] একটু সকাল সকাল ক'রেই স্কুলে গিয়ে হাজির হতাম। একদিন আমি স্কুলে এত সকালে গিয়েছি যে স্কুলে আর কেউ আসে নি—না-কোনো ছাত্র, না-কোনো শিক্ষক। সে দৃশ্য এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত প্রায় চারশ ছাত্রে এবং জন কুড়ি শিক্ষকে গম্ গম্ করতে থাকে সে-দৃশ্য একেবারে শূন্য—কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। বহুকাল পরে ইংরাজী কবিতার ঐ লাইনটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে—I am the monarch of all I survey—এই রকমের একটা আবছা আবছা অনুভূতি জাগে, কিছুটা আরাম কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে।

এই বয়সে ছেলেরা সাধারণতঃ চিন্তাশীলও হয় না ভাবালুতায় ধারাও আক্রান্ত থাকে না। সুতরাং সময় কাটাবার জন্যে একটা কিছু করা চাই। সেই শূন্য একচল্লিশখানি বেঞ্চের মধ্যে ক্লাসের ঘরে ব'সে আমি মনের আনন্দে গলা ছেড়ে দিয়ে গান করে দিলাম। কিছুদিন আগে হানার সঙ্গে নাট্যসমাজ (যার সভ্য ছিলেন [illegible] মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিরা) একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন—নাটকটি বোধ হয় "হরিশ্চন্দ্র"। তাতে একটি গান ছিল তার প্রথম লাইন হচ্ছে এই--

"আমাদের ছোট নদী চলে বালু
চোখার করবে পুণ্যবতী দিও না খরকে টান—

তখন অবশ্য ঐ লাইন দুটির আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই ছিল না। বাংলা আমার মনের ভাব এবং বিদ্যের পতাকা ও সংস্কৃতি রূপ ও রূপকের সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল না হ'লে কবিতার মধ্যে যে-রস সঞ্চিত আছে তা বুঝবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কেউ আর কাউকে বাপ মারতে পারেন না। কথাটা অতি সহজ ও সমীচীন। বরং ভালো মানুষ বাপ বললে মনে প্রশ্ন জাগার সম্ভাবনা থাকত যে ব্যাপারটা কি? সে যা হোক্ ঐ দুটি লাইন আমি মহা উৎসাহ সহকারে গলা ছেড়ে হ'রে দিলাম। এবং এই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল ডেস্ক চাপড়ানি। এই সঙ্গীত ও নৃত্যের পিছনে যে বিশেষ কোনো কলাবিজ্ঞান ছিল তা অবশ্য নয়। কিন্তু আনন্দের তাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। অবিমিশ্র আনন্দ। আনন্দ তো কোনো বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না—ওটা উপনিষদিক্ তত্ত্ব। ঋষিরা তাই বলেছেন, ওটা একটা পরম বস্তু, আত্মিক ব্যাপার। সুতরাং সেই সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি একটা অবিমিশ্র আনন্দের উপলব্ধি করছিলাম তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে ক্লাস ঘরের প্রবেশ বা নির্গমনের যে-দুটি দ্বার আছে তারই একটায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়।

এক ঠোঙা গলিত সীসা যেন এক চাবড়া বরফের উপর পড়ল। সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় বলেন না। সুতরাং ওঁর এই সকালে স্কুলে আসা কল্পনাও করতে পারি নি। এক নিমেষে আমি যেন প্রস্তরীভূত হ'য়ে গেলাম—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অন্তঃকরণে। অপরাধটা এমন অবিসম্বাদিত যে সে সম্বন্ধে কারো কোনো প্রশ্নই নেই সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় তাই আমাকে আর কিছুই জানেন না, শুধু মানাকে আহ্বান ক'রে বললেন—আমার সঙ্গে এসো। আমি কোনো ক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ ক'রে লাইব্রেরীর ঘরে এবং শিক্ষকদের কমন ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি সেই ঘরে আমাকে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবার নির্দেশ দিয়ে বললেন—হেডমাষ্টার মহাশয় আসুন, তারপর তোমার বিচার হবে। তখন আর কোনো শিক্ষক ঘরে আসেন নি সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় একখানি চেয়ারে ব'সে কি কাগজপত্র মনোনিবেশ করলেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন আমার প্রস্তরীভূত অবস্থাটা—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অন্তঃকরণে—ধীরে ধীরে কাটতে আরম্ভ করল তখন সর্ব প্রথমে একটি শব্দ আমার অন্তরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—রাস্টিকেট্। এই শব্দটির ইংরাজী রূপ ও ধাতুগত অর্থ তখন জানা ছিল না কিন্তু এর বাংলা চেহারা ও বাস্তব তাৎপর্য কোনো ছাত্রেরই অজ্ঞাত ছিল না। শিক্ষা-বিভাগে শাস্তি-প্রকরণের মধ্যে যে ওটা ফাঁসি বা দ্বীপান্তরেরই সমতুল্য একটা সকল ছাত্রেরই জানা ছিল। তখন ষট্চক্রের কথা জানতাম না। তা জানলে স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত ষট্চক্র ভেদ ক'রে ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে নামছে—রাস্টিকেট্, রাস্টিকেট্, রাস্টিকেট্! সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শিরা উপশিরায়, শোণিতের স্রোতে, নাড়ীর স্পন্দনে কেবল জানতে চাচ্ছে ঐ শব্দটি—রাস্টিকেট্, রাস্টিকেট্, রাস্টিকেট্! ঘরের ঘড়িটা আবহমান কাল ঠিক্ ঠিক্ ক'রেই এসেছে কিন্তু সেদিন স্পষ্ট শুনলাম তা থেকে শব্দ হচ্ছে—রাস্—টিকেট্, রাস্—টিকেট্, রাস্—টিকেট্। মনে হ'ল জীবনের যা কিছু ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ আনন্দ সব আজ

নির্মূল হ'য়ে গেল। লোক-সমাজে অপমানিত জীবনে অভিশাপস্বরূপ তংসনা, পাড়া-প্রতিবেশীদের ধিক্কার, অন্ত বাল-কলের আত্মহত্যার পরিবার ইতাদির ছবিগুলি স্পষ্ট চোখের আগে ভেসে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু জীবন-সমরে আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির একটা অসাধারণ স্থান আছে। [illegible] কতকটা সাহিত্য দিয়ে চোখে অন্ধ হ'য়ে যে ছেলে মাষ্টার মহাশয় আসবার আগে যদি এখান থেকে কোনো রকমে ছাড়া পাই তাহলেই রক্ষা। নইলে হেড মাষ্টার মহাশয় একবার এসে পড়লে ইজ্জত আর কোনো পথই থাকবে না। তখন একমুহূর্তে কিছু অস্ত্র আহ্বান করলাম। কিন্তু হায় রে হায়! আসল প্রয়োজনের সময় সবাই বিমুখ বা উদাসীন। যা হোক, মনে মনে কঠিনভাবে [illegible] করণ ও অন্তরাত্মাকে [illegible] ক'রে বললাম—আর করব না সার। [illegible] মাষ্টার মহাশয় একবার চোখ তুলে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মাষ্টার [illegible] তাঁর সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করলেন। হেড মাষ্টার মহাশয় এগারোটার আগে স্কুলে আসেন না, তাঁর সহকারী বাসস্থান এই স্কুল কম্পাউণ্ডেরই উত্তর সীমানা ঘেঁসে। ঘড়ির কাঁটা দুটি পর পর কম্পিতভাবে [illegible] চলেছে। ক্রমে দুটো বেজে গেল। হে মা কালি! হে মা দুর্গে! হে মঙ্গলদায়িনী জগদ্ধাত্রি জগদম্বে আজ এই বালকের ইজ্জতটিকে কিছু লঘুপাক সালসে সকার কর মা! অবশেষে অতি ক্ষীণ অতি দীন অতি অস্ফুটস্বরে ক্ষমা চেয়ে ফেললাম—সার, আর করব না সার। সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের বোধ হয় কিছু করুণার উদ্রেক হল কিম্বা হয়তো আমার কোষ্ঠীপত্রে সেই মুহূর্তটা ছিল একটা অনিবার্যভাবে অপরাহ্নের শুভ মুহূর্ত—তিনি মুখ তুলে বললেন—যাও, ক্লাসে এমন কাজ আর কোরো না। বলাবাহুল্য মাত্র, আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে তৎক্ষণাৎ সে-স্থান ত্যাগ করলাম। আমাদের পাড়ার নন্দলালের অন্তরঙ্গ ভাষায় বলতে গেলে [illegible] পুলে উত্তীর্ণ হয়েছি। তাঁর পুকুরে আমরা যাকে মাঝে হিসেব ক'রে দুটি দিনে স্নান করতে [illegible] আমরা সেই পুকুরে একবার এক দুপুরবেলা স্নান করতে গিয়ে আমি ডুবে গিয়েছিলাম [illegible] তাঁর পিতৃদত্ত নাম। আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আশ্চর্যের কথা [illegible] আমার ছিল আজন্ম সাহিত্যিক। [illegible] মহাশয়ের সূত্রে এক বিবাহের বিরাট ভোজের [illegible] নিমন্ত্রণের সুপ্রচুর বাড়ি ভক্ষণের পর কোর্মা ভক্ষণের আর আমার অবসর হইল না। তা ছাড়া সেদিন [illegible] অভিজ্ঞতায়, যে Sportsmanship-এর কি রকম অভাব তার পরিচয় পেয়েছিলাম। বন্ধুরা যখন [illegible] কে ধরে নিয়ে যেতে পারলেন না তখন আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন (বোধ হয় parting kick হিসেবে) এক পাঁচ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) জ্বর।

Scandalous! বন্ধুরা যে সেদিন শিক্ষকদের কাছে কি একটা মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে [illegible] নেই। যা হোক, মনে হ'ল সেই কলে ডোবার চাইতেও বড় জীবনের একটা ফাঁড়া সেদিন আমার [illegible] গেল।

[illegible] এই সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাপার এর আগে আর কারো কাছেই প্রকাশ করি নি। সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় [illegible] পড়েছেন বলে মনে হয়। সুতরাং সম্ভবতঃ এ ব্যাপার আর কারো কাছে তিনিও প্রকাশ করেন নি। [illegible] মনে হয় এই গল্পটা আমার নয়, সেটা সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের-সমাজের।

সেই সুদূর মফঃস্বল শহরে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম যখন এই রকম রেনেসাঁস তখন জিলা স্কুলে এক শিক্ষক আসেন থার্ড মাষ্টার হ'য়ে। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশগুপ্ত। আমি এই স্কুলে যখন ভর্তি হই তখন এর প্রধান শিক্ষকের নামও ছিল বসন্তকুমার দাশগুপ্ত। ইনি বদলি হ'য়ে প্রধান শিক্ষকরূপে এসেছিলেন শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষ। এই নূতন থার্ড মাষ্টার বসন্তবাবু বোধহয় অল্পদিন হ'ল শিক্ষকতা কার্যে প্রবেশ করেছিলেন। তখনো তাঁর চেহারায় হাবভাবে চালচলনে স্কুল মাষ্টারের ছাপ বা ছায়া পড়ে নি। তার উপর তিনি ছিলেন ব্লেডাহুরত—Blythe! ছিল মাষ্টার যারা অন্যান্য হিন্দু শিক্ষকরা যখন স্কুলে ধুতি না প'রে আসতেন তখন তাঁরা প্যাণ্টলুন ও চাপকান পরতেন। কিন্তু থার্ড মাষ্টার বসন্তবাবু স্কুলে আসতেন একেবারে পুরোপুরি সাহেবী পোষাকে—ট্রাউজার্স কোট ওয়েস্ট কোট টাই জুতো মোজা ইত্যাদিতে একেবারে ফিটফাট হিমছাম্। তাঁকে দেখাতো এক নবীন ব্যারিস্টারের মতো। কেবল সাহেবদের হ্যাটটিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি মাথায় দিতেন একটি গোল ক্যাপের মতো টুপি—যা সব জড়িয়ে কি রকম একটু দেশী দেশী লাগত। ক্লাসে তিনি বেতেন খালি মাথায়। কোনোদিন তাঁকে ধুতি প'রে স্কুলে আসতে দেখি নি। হয় তো ইনি ছাত্র-জীবনে কলিকাতায় ব্রৈলোক্যিক আবহাওয়ায়ও যথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তাই গান সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। ইনিই এসে স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী সভায় চারটি ছাত্রকে হারমোনিয়াম সহযোগে তালিম দিয়ে তিনটি গান গাইয়েছিলেন। ইস্কুলে হারমোনিয়াম, ভাবলেই রোমহর্ষণ হয়! এই ছাত্র চারটির মধ্যে দুজন ছিলেন শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীগিরীশচন্দ্র রায়, আর একজনের চেহারা মনে আছে কিন্তু নাম মনে নেই, অন্য জনের চেহারাও মনে নেই, নামও মনে নেই। আমাদের সেই সুদূর মফঃস্বল শহরের পক্ষে ছিল সেটা একটা অভাবনীয় কাণ্ড। অনাটগান সংস্কারের আলোড়নে যেন একখানি পাথর-খসা ব্যাপার। এর চল্লিশ পঁচিশ বছর পরে সেই শহরেই ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরে পুত্রবধূর হারমোনিয়াম বাজিয়ে শ্বশুরকে গান শোনাতে দেখেছি। সম্ভবতঃ জিলা স্কুলের থার্ড মাষ্টার বসন্তবাবু যেদিন এর সূচনা ক'রে রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজের এই মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আসবার জন্য যে কৃতজ্ঞতা তা রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। পূজা ও প্রেম—শ্রেষ্ঠ দুটি চারণশিল্পকে তিনি আস্তাকুড় থেকে উদ্ধার ক'রে হিন্দু সমাজের জীবনীশক্তি বাড়িয়েছিলেন। কেননা জীবনীশক্তি যেমন শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি করে, তেমনি শিল্প ও সাহিত্যও আবার সমাজের জীবনীশক্তিকে জাগ্রত ও অব্যাহত রাখবার সাহায্য করে। যেদিন যে তিনটি গান গাওয়া হয়েছিল (একটি আরম্ভে, একটি সভা সমাপ্তিতে আর একটি মাঝামাঝি সময়ে) সে তিনটি হচ্ছে—

১। অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণী গাহো আজি হিন্দুস্থান—সরলা দেবী।

২। একবার তোমা বা বলিয়ে ডাক—রবীন্দ্রনাথ।

৩। তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা—স্বরলী সেন।

তিনটি গানই স্বদেশ-প্রেম মূলক। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তখনো টনক নড়ে নি। সুতরাং তখন এমন গানও গভর্ণমেণ্ট স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় চ'লে যেত নির্বিবাদে। সম্ভবতঃ

সভাপতি যেভাবে স্যাডিস্ট্রিট ব্রাডস্ট্রীটকে দিয়েন গানের পরে। অর্থাৎ বিপদের সম্ভাবনাটা যখন কোথাও দেখা যাচ্ছে না তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলিমানা ক'রে বলছেন—তোমরা দেশভক্ত হও, জাতির ঐক্যবদ্ধ হও এই তো আমরা চাই। কিন্তু দেশের লোক দেশভক্ত যখন সত্যি সত্যিই হ'ল এবং বেশি কিছু ঈ দেখলেন তার কবি ঢের উদ্ধার করল এই বলে—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই॥

তখন উচ্চত হ'ল পুলিশের ব্যাটন, শোনা গেল শাসনকর্তাদের হুমকি, জন্ বুলের কুলজঙ্গের গল্প শুনতে হবে।

এখন পূর্বকথায় ফেরা যাক্।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল তখন প্রফুল্লচন্দ্র জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় বিদ্যালয়ে চ'লে আসেন এবং সেখান থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকিউলেশান (জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভাষায় পঞ্চম মান বা fifth standard) পাশ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বছর এই বিদ্যালয় থেকে হরেন্দ্রনাথ সেনও ম্যাট্রিক পাস করেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পণ্ডিত রাসবেহারি তর্করত্নের মহাশয় সম্পর্কিত যে ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করেছি তা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনা এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাস, এই কালের মধ্যে কোনো সময়ে ঘটেছিল। তর্করত্ন মহাশয় রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতেন এবং বক্তৃতাদিও করতেন। তাঁর একটি বক্তৃতার প্রথম বাক্যটি আমার আজও মনে আছে, তিনি সভাপতির আসন থেকে উঠে এই বলে বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন—"হিমালয় যার কিরীট, গঙ্গা [illegible] যার বক্ষে সেই ভারতের আমরা ছাত্রবৃন্দ।" তখন রংপুর জিলা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় চার [illegible] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে ছাত্র সংখ্যা দুই স্কুলের মধ্যে প্রায় আধাআধি ভাবে ভাগ হ'য়ে যায়। [illegible] স্বাধীনতার আর কি! এই ১৯০৫—৫০-এর আইডিয়া যে দেশের কি ক্ষতি করেছে সে সম্বন্ধে [illegible] কোনো ধারণা নেই। এই ধরণের আইডিয়াকে আশ্রয় ক'রে দেশের বুকে দুই আভিজাত্য আজো সুদৃঢ় ভাবে বসবার স্থান পেয়েছে—যার ফলভোগ আমরা এখনো করছি এবং ভগবানই জানেন আরো কতদিন করতে হবে। সে যা হোক্, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অর্থাৎ গোলামখানার ধারা দু'য়ে যান তাঁদের মধ্যে তর্করত্ন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণধন ছিলেন অন্যতম। তখন এমন কথাও রাষ্ট্র হয়েছিল যে কুলার সাহেব তাঁর নব রাজ্য পরিদর্শনে রংপুরে এলে পণ্ডিত মহাশয় সার্কিট হাউসে গিয়ে মূল বিষয়বস্তু নিয়ে রাজপ্রতিনিধিকে আশীর্বাদ ক'রে এসেছিলেন। অনুমান করি, এ-সবের পিছনে কোনো অভিসন্ধি ছিল না, ছিল একটা সহেতুকী ভক্তি। এই পণ্ডিত মহাশয়ের ছেলের গভর্ণমেণ্ট প্রবল সাহায্য বন্ধ হ'য়ে যায়।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে রংপুর সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়। তাতে দুটি পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।

এই প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লচন্দ্র একক পাঠান। এবং তাঁর লেখা প্রবন্ধটি সর্বসম্মতি বিবেচিত হ'য়ে এবার পুরস্কার পাবার যোগ্য ব'লে বার্ষিকীয়ন রংপুর সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ সভায় অধিবেশনে এই পুরস্কার দেওয়া ঠিক হয়।

এই সভা বসে স্থানীয় থিয়েটারের গৃহে (এইটে টাউন হলও বটে), এবং এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত রাধাবল্লভ তর্করত্ন মহাশয়। রঙ্গমঞ্চের উপর সভাপতির আসন, তাঁর আশে পাশে সাহিত্য পরিষদের কর্তা ব্যক্তিরা কোনো কোনো গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকও। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ। সভা আরম্ভ হ'ল। সভার যথারীতি উপক্রমণিকা খতিয়ান নান্দীপাঠ ইত্যাদি হ'য়ে গেলে যথাকালে পুরস্কার গ্রহণের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাক পড়ল। তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর নেপথ্যে অর্থাৎ উইংসের আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। স্বভাবতঃই সবাই মনে করেছিলেন যে, একটি তরুণ আসবে এগিয়ে বীর সলজ্জ পাদক্ষেপে, অর্ধস্ফুট স্মিতহাস্যে, এবং স্নিগ্ধ-নম্র মাথা অবনত ক'রে সভাপতি মহাশয়ের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে এবং মস্তকের প্রণতি জানিয়ে আবার ধীর সলজ্জ পাদক্ষেপে চলে যাবে। কিন্তু এই সব শান্ত রসাপ্লুত ব্যাপারের কিছুই ঘটল না। নাটকে যে-পাঠ লিখিত ছিল, যে নির্দেশ দেওয়া ছিল প্রফুল্লচন্দ্র তার কিছুই আবৃত্তি করলেন না বা অভিনয়ে প্রকাশ করলেন না। তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ঝড়ের মতো এবং সভাপতির দিকে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে দৃপ্ত এক ভঙ্গিতে প্রেক্ষাগৃহের দিকে তাকিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—এই রকমের একটা কথা—যিনি স্বদেশী-সভায় গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেন কিন্তু আসল কাজের বেলায় নিজের ছেলেকে গোলামখানায় পাঠাতে দ্বিধা বোধ করেন না তাঁর হাত থেকে আমি পুরস্কার নিতে অক্ষম।

সভার ঠিক মধ্যখানে যেন আচম্বিতে একটা বোমা প'ড়ে ফাটল—নৈতিক বোমা। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল, বেটাকে মুহূর্তে কোনোমতেই থামা গেল না। কেউ বললেন—বাঃ বেশ। কেউ বললেন—কি দুর্বিনীত ছেলে রে বাবা! কেউ বললেন—ছেলের মতো ছেলে! কেউ বললেন—বোঝাদার। কেউ বললেন—তেজী ছেলে। কেউ বললেন—বেয়াদব। সেই চটখোলের মতো, মহুল ইটখোলা ছাপরার কে একজন উচ্চ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"প্রফুল্ল ঠিক করেছে, প্রফুল্ল ঠিক করেছে।" পরে জানা গিয়েছিল ইনি তখনকার গভর্নমেন্ট প্লীডার-বার বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেছেন। এক মুহূর্তের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে সভার কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন—যাকে বলে ভ্যাবাগঙ্গারাম খাওয়া। রঙ্গমঞ্চে কোনো অভিনেতা আপন ভূমিকা অনুসরণ না ক'রে হঠাৎ কিছু বানিয়ে বললে—যাকে ইংরাজীতে বলে gag—অন্য অভিনেতারাও যেমন অবস্থা দাঁড়ায় এঁরাও সেই রকম অবস্থা দাঁড়াল। কিছুক্ষণ কানাকানি করবার পর তাঁরা ঘোষণা করলেন যে এই দুর্বিনীত বালককে পুরস্কার দেওয়া হবে না। প্রফুল্লচন্দ্রের বোমার পর মনে হ'ল যেন এবার গান।

এই ঘটনা বর্ণনার পর বলা বাহুল্য হবে যে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে সুরু থেকে প্রাণে যোগ দিয়েছিলেন। বয়কট, স্বদেশী প্রচার, বিলিতি বস্ত্রের বহ্নুৎসব, স্কুলের পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে ছুটে গিয়ে দেশী কাপড় প্রদান তিনি বিক্রি ও বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল অম্লান ও আশ্চর্যজনক।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তখন কলিকাতার ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার রংপুরে এসেছিলেন। এই সম্পর্কে একটা ছোটখাট ব্যাপার মনে পড়েছে। সতীশ বাবু এসে একদিন জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডেকে এক সভা বসান্। এই সভা জাতীয় বিদ্যালয়ের বড় ঘরটায় কিম্বা প্রাঙ্গণেই হয়েছিল। এই সভায় সতীশবাবু ছাত্রদের প্রশ্ন করতে বললেন—প্রত্যেকের প্রশ্ন শুনে, তারপর এক-এক ক'রে তার উত্তর দেবেন। অনেক ছাত্র অনেক রকমারি সব প্রশ্ন করেছিলেন। সর্বশেষে [illegible] নামে একটি ছাত্র (ইনি "শিবুর পত্রের" লেখক গোষ্ঠীর লেখক [illegible] ভগ্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) প্রশ্ন করলেন—এখন আমরা কোনো armed rebellion করতে পারি কি না? সতীশবাবু অন্য সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ প্রশ্নটির সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। এতে আমরা কিছুটা মনক্ষুণ্ণ এবং কিছুটা কৌতূকবোধ করেছিলাম।

অনুমান করি এই সময়ে সতীশবাবুর সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় হয়েছিল। এবং আরো অনুমান করি এই পরিচয়ে সতীশবাবু প্রফুল্লচন্দ্রের মেধা বুঝতে পেরেছিলেন, ফলে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। সতীশবাবু কলিকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁর মাসিক পত্র ডন্ ম্যাগাজিন প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ম মতো পাঠাতেন। প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা চ'লে যাবার পর এই পত্রিকা বোধ হয় তাঁর অনুজ হিসেবে আমার নামে আসতে থাকে। এই পত্রিকাখানি ছিল কিছুটা ইংরাজীতে আর কিছুটা বাংলায়। প্রথমে বাংলা অংশে বাংলা হরফেই ছাপা হ'ত। পরে তা ছাপা হ'ত দেবনাগরীতে—সম্ভবতঃ অবাঙালী পাঠকদের কিছু সুবিধার জন্য।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ম্যাট্রিক পাশের পর প্রফুল্লচন্দ্র [illegible] যান। এবং সেখানে [illegible] বিপ্লবীদলে যোগ দেন। অনুমান করি এতে পিতৃদেবের [illegible] ছিল। [illegible] উপরন্তু পিতৃদেবের সম্মতি নিয়েই গিয়েছিলেন। কলিকাতা [illegible] হাতে দশটি টাকা দিয়ে বলেছিলেন—"যেদিন আর কাজ পাবিনে মনে করিস, সে-কাজে [illegible]। প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে কলিকাতায় গিয়ে ঐ সমিতিতে যোগ দেওয়া একেবারে আনকোরা নতুন কিছু নয়। কেননা রংপুরে আমাদের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে উঠেছিল। তাতে প্রবেশের অনুষ্ঠান ছিল বুক কেটে তার রক্ত দিয়ে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা। চল্লিশখানা খাকব, মাদকদ্রব্য স্পর্শ করব না, এই রকমের সাত আটটি কি নয় দফা ছিল প্রতিজ্ঞার দফা। ছোট বড় মিলে চল্লিশ পঁচিশ জনের বোধ হয় পঞ্চাশ জনেরও বেশি তরুণ ও যুবক এই প্রতিজ্ঞাপত্রে বুকের রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রও ছিলেন। একটি প্রতিজ্ঞা ছিল, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব। এই প্রতিজ্ঞাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন দু'জন—এক প্রফুল্ল চক্রবর্তী আর এক প্রফুল্ল চাকী। কলিকাতায় যাবার পর প্রফুল্ল চক্রবর্তী একবার বাড়ি রংপুরে ফিরেছিলেন। সেই সময়ে বিপ্লবীদের সাপ্তাহিক কাগজ "যুগান্তর" একেবারে [illegible], যার বৈপ্লবিক তত্ত্ব আমরা প্রতি সপ্তাহে আকণ্ঠ পুরে পান করতাম। এই "যুগান্তর"এ "বর্তমান রণনীতি" নাম দিয়ে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ পরে পুস্তিকাকারে ছাপা হয়। এই

প্যাকিং বেশ বোঝাই ক'রে এই গ্রন্থের প্রায় চার পাঁচ শ' কপি নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র রংপুরে এসেছিলেন। এবং এই বইগুলি কি বিধি ব্যবস্থা ক'রে আবার তিনি কলিকাতায় নিয়ে যান। এই আমাদের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতবর্ষের বিটিশ যুগের ইতিহাসে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। অরবিন্দের সেদিন মজঃফরপুরের একটি বোমা পড়ল, তার পর দিন মোকামা ঘেটে একটি বাঙালী তরুণ রিভলবারের গুলিতে আত্মহনন করলেন এবং তারপর দিন বিহারেই খুলনা আর এক বাঙালী তরুণ রিভলবার সহ গ্রেপ্তার হলেন এবং তার কয়েকদিন পরে কলিকাতার বানিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুর টাউনে পুলিস বিপ্লবীদের আস্তানার হানা দিল, বোমা রিভলবার সেখানে আবিষ্কার করল। বিপ্লবীদের বারীন্দ্র উপেন্দ্র উল্লাসকর প্রেমদাস প্রভৃতি প্রায় সবাই গ্রেপ্তার হলেন। শুনেছিলাম যে বিপ্লবীদের কারো কারো মত ছিল যে, সিঁড়িঘরে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে যে অস্ত্রাগার ছিল তাই দিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে যুঝেই মরা। কিন্তু এই মত গৃহীত হয় নি। গ্রে স্ট্রীটের বাসা থেকে পুলিস অরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করল। বিপ্লবীদের এই গ্রেপ্তারীতালিকার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রেরও থাকবার কথা। কিন্তু তাঁর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। অথচ পুলিস তাঁর নাম পেয়েছিল এবং তাঁর পরিচয়ও জানতে পেরেছিল কিন্তু মানুষটিকে ধরতে পারে নি। পুলিস তাঁর খোঁজ রংপুরেও করে, শহর থেকে দশ মাইল দূরে গ্রামের বাড়িতেও তাঁর অনুসন্ধান করে। সুতরাং স্বভাবতই আমাদের মনে হয়েছিল যে তিনি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছেন। এমন কি হয় তো কোনো সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে একেবারে ভারতের বাইরে কোনো দেশে গিয়ে থাকতেও পারেন।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে কানাঘুষায় উড়ো উড়ো ভাবে একটা খবরের প্রকাশ হতে লাগল যে প্রফুল্লচন্দ্র আর বেঁচে নেই। প্রফুল্লচন্দ্রের এই অকাল অপমৃত্যুর গুজব শুনে বাবলেশ্বর তরফদার মহাশয় এই ভবিষ্যৎ বাদলের প্রকাশ্য সভায় তাঁর প্রতি কঠোর ব্যবহারের কথা বিবৃত করেন। আগেই বলেছি যে পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ি ছিল আমার বিদ্যালয়ের প্রায় পাশেই। তখন আমি সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন স্কুলে যাবার পথে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা। তিনি আমাকে ডেকে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—এতদিন বাদে নাকি মৃত্যু হয়েছে? অবশ্য কথাটা তিনি যেমন উড়ো উড়ো ভাবে শুনেছেন আমরাও তেমনি উড়ো উড়ো ভাবেই শুনেছিলাম। সুতরাং তাঁকে বললাম যে আমি ঐ রকমের একটা কথা উড়ো উড়ো ভাবে শুনেছি বটে তবে নিশ্চিত কিছু আমি জানি না। যাঁরা ঐ-সময়ে সঠিক খবর জানতেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে এ-খবর দেবার জন্যে উৎসাহ না বোধ করারই কথা। এই সম্পর্কে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের স্কুলের বিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। ইনি ছিলেন অঙ্কের মাষ্টার। ইনি ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মেশামিশি করতে পারতেন। এঁর শিক্ষকতার মধ্যে সহানুভূতির প্রাধান্য ছিল। এই জন্য ইনি ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। একবার আমরা তিন চারটি বন্ধুতে মিলে এই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে গিতালদহ হুডবিহার হয়ে ঘুটাদহ সীমান্তে অবস্থিত পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন ধরলিপাড়া লাইন হয় নি। জলঢাকা কেটে রেলপাইন বসানো হয়েছে। তরাইয়ের জঙ্গল, বৈশাখে ফলকাটায় গাছের জঙ্গলীর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু হিমালয়ের তরাইয়ের এই অরণ্যানী দেখলে "গহন অরণ্য" কি বস্তু তার কোন

ধারণা করা যায় না। মাইলের পর মাইল চলেছে গাছের পর গাছ, মাঝে মাঝে কোথে কাছে একটা অর্ধ-জঙ্গলাকীর্ণ মতো উঠিয়ের ঢাঙা। এর অভ্যন্তরে কবে তার সেখানে বেশী এলাকা না এলাকা "গাছ হারা মাঝারিদিন মধ্যাহ্ন তপস্বীন"। মাতা ধরিত্রীর যে উর্বরতা-শক্তি কি, কি যে অফুরন্ত অজস্র উচ্ছ্বসন প্রাণের তার উদাহরণ, সে পরিচয় পাওয়া এই অঞ্চলে। তবু কেউ কেউ কাগজে কলমে আঁক ক'ষে গণিত হ'য়ে উঠেছেন এই মন্বন্তর'রে যে আগামী দুই মানবজাতির খাদ্যাভাব ঘটতে বাধ্য। যা হোক, তিন চার দিন পরে আমরা বেড়িয়ে ফিরেছিলাম। কিন্তু আমরা ট্রেনটি রংপুর স্টেশনে পৌঁছত বেশকিছু রাত্রিতে। এত রাত্রিতে যে যার বাসা বাড়িতে যাবার পরিবর্তে আমাদের বাড়িতে গিয়ে সবাই শুয়ে পড়লাম। ট্রেন ভ্রমণের পর নিদ্রাদেবীর কৃপা সহজে লাভ করা যায় না। সুতরাং আমার ঘুম আসবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কেবল নিশ্চল ও নীরব হ'য়ে পড়ে ছিলাম। পরে বোঝা গেল অন্যেরও আমারই মতোই অবস্থা। কেননা প্রায় আধঘণ্টা কি তিন পোয়া ঘণ্টা পরে যতীশ মাষ্টার মহাশয়কে ডেকে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—সার, এখনো খবর কি? যতীশ প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। ভূতোদনী মাষ্টার মহাশয় আমি যে ঘুমিয়েছি এটা অবিসম্বাদিত ব'লে ধ'রে নেন নি, যেমন যতীশ ধরে নিয়েছিলেন। তিনি চাপা গলায় ভর্ৎসনা ও বিরক্তির সুরে উত্তর করলেন—তুমি কি আর বায়না পেলে না ঐ কথা জিজ্ঞাসা করবার! বলা-বাহুল্য কথোপকথনে ঐখানেই দাঁড়ি পড়ে গেল। আর কোনো আলো পাওয়া গেল না ও বিষয়ে, কেবল খানিকটা সন্দেহ মাত্র আরও জমাট বাঁধল। মাষ্টার মহাশয় পরে রংপুরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করেন ঐ জেলার নন্দি গোষ্ঠি কুড়গিয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফেরে ফিরে যশোহরে গিয়ে তাঁকে ওকালতি করতেই দেখি। যতীশ রংপুরের অন্যতম প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত কুলদা রায় মহাশয়ের পাঁচ পুত্রের (সতীশ, ফিতীশ, যতীশ, গিরীশ ও মনীশ) সর্ব কনিষ্ঠ। যতীশ যৌবনের প্রারম্ভে মারা [illegible] চারজন জীবিত আছেন। আমি ফিরা স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় গান সম্পর্কে যে [illegible] ফিতীশ রায়। ফিতীশ রায় মহাশয় আমাদের তৃতীয় বিভাগের [illegible] পরে কলিকাতায় চলে যান। মনীশ এখন রায় সাহেব মনীশচন্দ্র রায়, [illegible] নিকট ভুবনে মাঝের তাঁহারি টি এষ্টেটের ম্যানেজার।

[illegible] না মৃত, এই প্রশ্নে আত্মীয় স্বজনরা না না ক'রেও কতকটা অনিশ্চয়তাই হ'য়ে থাকেন। এ ছাড়া আর একটি গল্প আমাদের কর্ণগোচর হয়েছিল। এই জেলার ট্যাপার জমিদার শ্রীযুক্ত অঘোরমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ধেমের ছিলেন বিদ্যা স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠি। তিনিই এই গল্পটি প্রকাশ করেন। ঘানিকতলায় পুলিস কর্তৃক বোমা আবিষ্কার ও বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের পরের ঘটনা। একদিন কলিকাতার [illegible] অঞ্চলে ধেমের কোথায় যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রফুল্লচন্দ্রকে—অবশ্য যাকে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র বলে জানতেন—তিনি দেখতে পান। প্রফুল্লর পরণে ছিল ব্রহ্মদেশীয় পোষাক—কটিদেশে লুঙ্গি, মাথায় রুমাল, [illegible] কোট—একেবারে খাস সোরেজ্যাখন প্যাগোডার ধেমের বাসিন্দা। এক হাতে ঝুলানো কয়েকটি [illegible] যায়। ধেমের প্রফুল্লকে উচ্চ স্বরে ডাকেন—প্রফুল্ল, এই প্রফুল্ল! এই ডাক শুনে সেই ব্রহ্মদেশীয় [illegible] ফিরে তাকান এবং পর মুহূর্তে নিকটস্থ গলির মধ্যে ঝড় পায়ে [illegible] হ'য়ে যান। এই ঘটনা

গল্পটি। কিন্তু পরে আমরা শুনতে পাই যে কলিকাতায় বিপ্লবীদের [redacted] কাজে লেগেছে কিনা কি ফল ফলেছে তাই পরীক্ষা করবার জন্যে জন তিনি চারজন [redacted] প্রফুল্লচন্দ্রও ছিলেন। সেওঘর ছাড়িয়ে একটি পাহাড়ের উপর উঠে বোমা [redacted] এবং প্রফুল্লচন্দ্রের উপর এই কার্যের ভার পড়ে। প্রফুল্লচন্দ্র জায়গায় গিয়ে বোমা ছুঁড়ে দিয়ে মোনা কাটবার আগেই সরে আসা নেবার কথা। কিন্তু অসাবধানতার জন্যেই হোক্ বা কৌতূহল জনিত অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক্ প্রফুল্লচন্দ্র যথা সময়ে সরে আসতে পারেন নি। ফলে বোমা ফেটে তাঁর এক টুকরো তাঁর একদিকের রগে এসে লাগে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পড়ে যান এবং অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। এই হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস—আমরা যেমন শুনেছিলাম।

কিন্তু আশা মায়াবিনী, বিশেষতঃ স্বাধীনতার স্বপ্নদের কাছে। এই ঘটনার কথা জানবার পর আশা-প্রদীপের আর একটি শিখার উদয় হয়। শুনেছিলাম এই রকমের একটা কথা যে প্রফুল্লচন্দ্র অজ্ঞান হ'য়ে পড়লে সঙ্গীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েন এবং প্রফুল্লকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে কলিকাতায় চ'লে আসেন। কিন্তু পরের দিন দু'তিন জন আবার ঘটনা স্থলে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের শরীরের কোনো চিহ্ন দেখতে পান না। যদি রক্তপাতের উপরন্তু হ'লে তার কিছু অবশিষ্ট অন্ততঃ ঘাসের ডগায় জমা হওয়া ইত্যাদি থাকবার কথা। কিন্তু সে সবের লেশমাত্র চিহ্নও এঁরা দেখতে পান নি। সিদ্ধান্ত—প্রফুল্ল জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন কিম্বা কোনো সন্ন্যাসী বা অন্য কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন যেতে লাগল এবং প্রফুল্লচন্দ্রের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না তখন ঐ আশা-প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটুকু ম্লান হ'য়ে উঠতে লাগল। এবং অবশেষে ইংরেজদের প্রথম মহাসমরের পর যখন বাঘাযতীনরা আত্মপ্রকাশ করলেন কিন্তু তবুও প্রফুল্লচন্দ্রের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে আশা-প্রদীপের ঐ ক্ষীণ শিখাটুকু আলেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

পরে অবশ্য জানতে পারি যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প্রফুল্ল চন্দ্রের সঙ্গীরা কলিকাতায় চ'লে আসেন বটে এবং পরের দিন কয়েকজন ঘটনাস্থলে যানও বটে কিন্তু সেটা যাতে মৃতদেহ কেউ সনাক্ত না করতে পারে তার জন্যে— মৃতদেহ না পাওয়ার কথাটা বানানো। তবে নাস্তিক। (সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পিতৃদেবকে জানানো হয়েছিল।)

এই ঘটনা ঘটেছিল প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর মজঃফরপুরের কিংসফোর্ড-কে অভিযানের পূর্বে—১৯০৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শিক্ষা পরিষৎ গৃহীত ন্যাশনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়া ও ১৯০৮ সালের প্রফুল্ল চাকীর মোকামা ঘাটের রিজার্ভারের তলিতে আত্মগোপনের মাঝে কোন একসময়ে—আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যায় "বর্তমান রণনীতি" পুস্তকাকারে ছাপা হবার পর ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মগোপনের তারিখ ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে। সুতরাং সেই বৈপ্লবিক যুগে বোমা সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ব প্রথমে যাঁর মৃত্যু ঘটে তিনি হচ্ছেন এই প্রফুল্লচন্দ্র চাকীরই। তবে তাঁর মৃত্যু ঘটে দুর্ঘটনায়, দৈবাৎ।

কিন্তু হায়, দুর্ঘটনায় মৃত্যু আর রোগে ভুগে ভুগে আসন্ন মৃত্যুর মধ্যে কোনোই তারতম্য নেই, দৈবাৎ মৃত্যু ও স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মধ্যে কিছুমাত্র উর্ধ্বে বিশ নেই—ও দুই-ই এক মৃত্যু, অবিলম্বান্বিত ভাবে বোঝ আনার মৃত্যু। প্রফুল্লচন্দ্রের মা তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কিছুমাত্র উপায় নেই মনে করবার যে তিনি কিছু কম মরেছেন।

প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু রহস্য যাদের জন্য রইল।

ইংলণ্ডের

অশোক চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইংরেজ বিশ্বের সামনে আত্মগরিমা হইয়া কর্তব্যবোধ, কর্মকৌশল ও আত্মসংযম তুলিয়া কিভূতকিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পরিচয় এইবার বিলাত যাত্রা করিয়া ভাল করিয়াই পাইতেছি। যুদ্ধ বেশ হেঁয়া দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখনও সর্বত্র সামুদ্রিক আবহাওয়া পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। সৈনিক-শ্রেষ্ঠ চিলিপার হইতে নকল মহারথির ছদ্মবেশে সারা দুনিয়ার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা বিবরণ করিয়া নিজের সুবিধার জন্যে খুঁজিতেছে। কিন্তু বলিবার তো নাই; অমনি, ভারত অথবা ডিফেন্স রুল আইনের উনপঞ্চাশ 'গ' ধারার অধীনে হইয়া অযোধ্যা খাজনা-আইন লেনেওয়ালাকে তাং করিয়া দিবে। কলিকাতা হইতে আমরা বিশেষ মার্কা বোম্বাই মেল অর্থাৎ বোট মেলে চড়িয়া বোম্বাই চলিলাম। রেলগাড়ীর কামরাটি যুদ্ধপূর্বের অর্ধেক, আকারে। কারণ যুদ্ধ। কামরাটিতে শতাধিক আরশুলা বাস করে। কারণ, সম্ভব বিপক্ষের অংশীদার ঠৈনিক মহাশক্তিকে খুশী রাখা। পথে অনেকবার রেল কর্মচারীদের বলিলাম কীটনাশক "ফ্লীট" প্রভৃতি যোগাড় করিয়া দিতে। ইন্সিয়ান-কি, এন, আর, রেলপথে সে সকলের ব্যবস্থা নাই। কারণ, যুদ্ধে জাপানী, জার্মান ও ইতালীয়ান [illegible] করা হইয়াছিল, সেখানে আরশুলার জন্য কেহ মাথা ঘামায় নাই। এমন কি [illegible] বিরাট পলিয়াই রেলকর্মচারীদিগের বিশ্বাস। আরশুলাগুলিও [illegible] বাস করিয়া নিরীহ রেলের কামরায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। এইপ্রকার [illegible] যে আমার দেহ আশ্রয় করিতে পারে তাহা তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই। সেই বহু যখন আমার বিলাতবাসী পত্নী তাহাদের সেই খেলার আসরে চটিজুতা হস্তে চটিকরং অবতীর্ণ হইয়া নিমেষের মধ্যে তাহাদের সেনাবাহিনীর কয়েকটি যুবককে আরশুলাকে নমন সমনে প্রেরণ করিলেন তখন তাহারা ক্ষুব্ধ চিত্তে তীব্র গতিতে গদি ও আসবাবের আড়ালে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। এরূপ বেআইনী যুদ্ধে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না। তাহারা জানিত যুদ্ধ মানে শুধু পরের খরচায় খাইয়া আরাম করিয়া "খা'র শিল যা'র নোড়া" নিম্ন আসনারে সংসারে বিচরণ করা। এরূপ নির্মম ভাবে যে কেহ আক্রমণ করিবে ইহা তাহারা কদাপি কল্পনাও করে নাই।

রেল কোম্পানী ইংরেজের যুদ্ধজয় উৎসবে পূর্ণ আনন্দে যোগদান করিয়া সহচর বন্ধনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বোম্বাইয়ের পথে গাড়ী সজোরে চালনা করিয়া চলিলেন। একটা ছোট ষ্টেশনে চা অথবা কোথায় ঠিক ভোজন তাহাও মনে ভাল করিয়া লিখিয়া সকলকে দেওয়া হইল। এটা যে শুধু ছলনা মাত্র আমরা তাহা বুঝি নাই। তবুও যখন, খানার মূল্য অগ্রিম লইয়া টিকিট কাটিয়া দিয়া রেল তখন তাহাদের ব্যাপার সোটাগুটি

বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলাম ইহার মধ্যেও "ওয়ার এফর্ট" ঘটিত মারপ্যাচ আছে। যে ট্রেনে চা খাইবার কথা সেখানে গাড়ীটা রাত্রি ৮ টায় পৌঁছিবে দেখা গেল এবং নৈশ ভোজনটার রাত ১১টায় ঘটিবে বলিয়া হিসাব করিলাম। সেই জন্যে একটা মাঝের ষ্টেশনে চা খাইবার চেষ্টা করিয়া শুনিলাম গাড়ীটা পাঁচ মিনিটে ছাড়িয়া যাইবে, এবং ষ্টেশনের রেস্তোরাঁয় যাইয়া চা খাইতে হইবে। সুতরাং চায়ের আশা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু গাড়ীটা আধঘণ্টা দাঁড়াইবার পরে দেখিলাম অনেক ইংরেজ ও অর্দ্ধ ইংরেজ বেশ চা আনাইয়া লইতেছে। তখন আমিও আমার অক্সফোর্ডীয় মুখোসটা পরিয়া লইয়া রেস্তোরাঁর গোয়া নিবাসী ম্যানেজারের সম্মুখীন হইলাম। সে বেচারা মানুষ যে এত অল্প সময়ে এতটা অক্সফোর্ড হইতে পারে জানিত না; সুতরাং আমাদের চা গাড়ীতে শীঘ্রই আসিয়া গেল।

রাত্রের খানাটা ছুটির রাত একটার সময়। পূর্ব্বে হইতেই ধাম দিয়া রেখিয়াছিলাম; সুতরাং নিছক প্রতিহিংসার খাতিরেই সকলে গিয়া খাই না খাই খাবারের অপব্যয় করিয়া আসিলাম। বি, এন, আর-এর বোর্ড যে এইরূপ অপব্যয় ব্যবস্থার চলে তাহা জানিতাম না। আমার পত্নীর অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে শুধু তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্যেই আমি রেল কোম্পানীর সহিত চক্রান্ত করিয়া এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছি। তাঁহাকে বলিলাম যে এ সকল যুদ্ধের ফল কিন্তু সে কথা শোনে কে? যত পাপ, বঞ্চনা, চুরী ও অকর্ম্মা যুদ্ধের নামে পার পাইয়া গেল, কিন্তু আরম্ভনা-পূর্ণ রেল কামরা ও চার ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া গাড়ী চালান যে ইচ্ছা থাকিলে প্রতিকার সাপেক্ষ নহে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আমি আজীবনের অভ্যাসমত অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপন দ্বারা তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তিনিও চিরকালের অভ্যাসমত কিছুতেই ভুলিলেন না।

বোম্বাই-এর নিকটে আসিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেল চলিবার সময় অনেক নূতন প্রচেষ্টার নিদর্শন দেখিলাম। বোম্বাই বাসীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা হইতে অগ্রগামী। এই অর্থনৈতিক প্রগতির আর একটি দিক হইল শ্রমিক আন্দোলন। বোম্বাই-এ প্রায়ই শ্রমিক গণ্ডগোল চলিতে থাকে। আমাদের ট্রেন বোম্বাই পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমরা সব জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম কেননা কি একটি শ্রমিক সংক্রান্ত গোলযোগে তাহার পূর্ব্বদিনে শ্রমিকেরা সব রেলগাড়ী ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা অবশ্য ইষ্টক চর্চ্চিত হওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম। ট্রেন অবলীলাক্রমে চার পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বে "ব্যালার্ড পিয়র" জাহাজ ঘাটে পৌঁছিল। রেল কোম্পানী গাড়ী সকালে পৌঁছিবে বলিয়া সপ্তাহ ভোজনের ব্যবস্থা করেন নাই। "ব্যালার্ড পিয়রে" মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং আমার "পাওা" টমাস কুক কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অদৃশ্য থাকিয়া নিজ কোম্পানীর প্রকেশদিগের হাত এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। টমাস কুকের এ অবনতিও সম্ভব যুদ্ধ প্রচেষ্টার একটা দিক। একটা আধ কর্সা ফিরিঙ্গী যুবক একবার টমাস কুকের চিহ্ন অঙ্কিত টুপী পরিয়া ঘুরিয়া গেল। পূরব, ভারতবাসী ও মধ্য বয়সী মীরেদের দেখিবার তাহার অবসর ছিল না। সে শীঘ্র নিজের পছন্দ মত কোন যেতাঙ্গীকে খুঁজিয়া লইল ও আমি একটা কুলীর সর্দ্দারের সাহায্যে মাল পত্র উদ্ধার করিয়া জাহাজে চড়িতে গেলাম।

দেখিলাম জাহাজে চড়া আর পূর্ব্বেকার মত সহজ নাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় উদ্ভিষ্ট আবহাওয়ায় যাত্রার প্রত্যেকটি সহজ পথই দুর্গম ও কণ্টকময় হইয়া উঠিয়াছে। নানা প্রকার নিয়ম, কর্দ্দ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যাহাদের হস্তে সেই সকল বিষয় ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহারা যুদ্ধময় জগতের প্রতীক রূপে পরম নিরেট ও চরম নিষ্কর্ম্মা।

একটা জায়গায় ডাক্তারী হয় অর্থাৎ যাহাতে কোন রুগ্নব্যক্তি জাহাজে না উঠিতে পারে সেই জন্য প্রত্যেক হনু যাত্রীকে ডাক্তারে পরীক্ষা করে। আসলে যাহা হয় তাহা এই যে সকলের নিকট একটা টিকা লইবার প্রমাণ পত্র চাওয়া হয় ও সেইটা দেখিয়া জাহাজের টিকেটে একটা ছাপ মারা হয়। এই কঠিন কার্য্যের জন্য নিযুক্ত যে ডাক্তার, তাহার চাল চলন খুবই আভিজাত্য গৌরবে রঙ্গীন ও উজ্জ্বল। খাইতে গেলে তিনি তিন চার ঘণ্টার পূর্ব্বে আর ফিরেন না এবং তাঁহার দরবারের দ্বার পথে অসংখ্য লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছয় আনার একটা "রবার ষ্ট্যাম্প" যে এতটা ক্ষমতা ও রাজশক্তির সৃষ্টি করিতে পারে দেখিয়া "রবার" জিনিসটার উপর ভক্তি না হইয়া যায় না। ভারতবর্ষের উচিত দেবদেবীর মূর্ত্তি অতঃপর "রবারে" গঠন করান। ওজনে কম, পড়িলে ভাঙ্গে না, টানিলে বাড়ে ও ছাড়িলে ছোট হয়—এমন জিনিস আর নাই। ডাক্তারের জন্য আমাদের জাহাজে উঠিতে তিন চার ঘণ্টা দেরী হইল, তা ছাড়া বৃষ্টির ত কথাই নাই। কুলিও তিনবার বদলাইতে হয়। ট্রেন হইতে "কাষ্টমস" ঘর, সেখান হইতে জাহাজের সিঁড়ি ও সিঁড়ি হইতে জাহাজ; কোন স্থানের কুলি অপর স্থানে যাইতে পারে না। ক চিহ্নিত স্থান হইতে খ চিহ্নিত স্থান অবধি মালপত্র একদল কুলি লইয়া গিয়া নামাইবে। খ হইতে গ অবধি দ্বিতীয় দল ও গ হইতে ঘ অবধি তৃতীয় দল। শুনিলাম ইহাতে চুরী প্রভৃতি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সামরিক বিভাগের হুকুম অনুযায়ী সকল ব্যক্তি এই নিয়ম অনুসারে চলিতে বাধ্য ও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এটা একটা অতিরিক্ত আবিষ্কার। ঘ চিহ্নিত স্থানে গিয়া দেখিলাম "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" পরিকল্পনার চরম অভিব্যক্তি! সুটকেস, ট্রাঙ্ক, খোকার বুড়ি ও খুকীর তোরঙ্গের উত্তাল তরঙ্গময় "ডেকে" হোঁচট খাইয়া খাইয়া ক্রমশঃ নিজের মালগুলি সংগ্রহ করিতে সে যে কি প্রচেষ্টা! পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া নিষ্কাম ভাবে নিজের সুটকেস আহরণ করা সত্য সত্যই উপভোগ্য। কুলকায়া ইহুদী ও আর্ম্মানী মহিলারা দ্রুতগতি ও ক্ষিপ্রহস্তে সকলের জিনিসপত্র ছড়াইয়া ফেলিয়া অপরূপ রসের সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সকল নারী ধন্য! ইহাদের গতির সাথে জাহাজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। একটী কোন যাত্রী খুঁজিয়া পাইলেই ইহারা অবোধ্যাসে ইন্দি_স ও আর্ম্মানীতে সিংহনাদ করিয়া উঠিয়া নিজ নিজ অনুচর স্বামীদের সে কথা জ্ঞাত করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গী রমণীরাও সকল লিঙ্গ বিভেদ ভুলিয়া পরস্পরকে "হ্যালো, হয়ারীজ দাট শিপ টোকরী হ্যাজ?" প্রভৃতি বলিয়া আবহাওয়া আনন্দমুখর করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইঁহারা সব "হোম" যাইতেছেন।

এই "হোম" ব্যাপারটা বুঝিতে কিছু সময় লাগে। অভিধান অনুসারে "হোম" মানে স্বগৃহ অথবা স্বদেশ। ফিরিঙ্গী অভিধান অনুসারে হোমের অর্থ আদর্শ-গৃহ বা আদর্শ-দেশ অর্থাৎ ইংলণ্ড। ফিরিঙ্গীরা অনেকেই জাতিস্মর এবং পূর্ব্বজন্মের কথা তাহাদের পরিষ্কার স্মরণ থাকে। যাহারা তিন চার অথবা কোন পুরুষেই ইংল্যাণ্ড দেখে নাই তাহারাও "হোমের" কথা বলিতে বলিতে আনন্দ বিহ্বল হইয়া পড়ে। অনেকের আবার কষ্ট-কল্পিত জাতি কুটুম্ব

প্রভৃতি ইংলণ্ড জনসহল করিয়া রাখিয়াছে। "আবুল্ জন" ও "কাজিন ম্যাজ" ইত্যাদির বর্ণনা স্মিত বদনে শুনিয়া চুপ করিয়া থাকাই রীতি। যত কম প্রশ্ন করা যায় ততই কম মিথ্যা শুনিবার সম্ভাবনা। প্রায় দেড়শত বৎসর ভারত শাসন করিয়া এখন ফিরিঙ্গীরা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি লণ্ডনে কোথায় থাক?" উত্তর হইল, "ও, আমাদের বাড়ী লণ্ডনের "পিকাডিলি সার্কাসে।" আমি অগত্যা বলিলাম, "আমি একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছি, লণ্ডনের বড়বাজারে অঞ্চলে।" ইহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ইংলণ্ডে পৌছাইলেই তাহাদের কাজ জুটিয়া যাইবে ও তৎপরে বিবাহাদি করিয়া তাহারা সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। এই স্বপ্ন অবসানে যে রূঢ় জাগরণ তাহা বড়ই কঠোর হইবে।

"আলকান্তারা" জাহাজটি ২০০০ টনের অধিক বড় ও পূর্বকালে ইহা ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকা পথে ডাক জাহাজ হিসাবে চলিত। যুদ্ধের সময় "আলকান্তারা" এশিয়ার জলে আসিয়া পড়িয়া এখনও সামরিক বিভাগের কবলে পড়িয়া আছে। জাহাজটা ভালই, শুধু কোথাও পাখার ব্যবস্থা নাই। অন্তত ভারতবাসী কাহারও ক্যাবিনে পাখা নাই। এক একটা ক্যাবিনে ১২ হইতে ৩০ পর্যন্ত "বার্থ" আছে এবং স্ত্রী পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাবিনে থাকে। জাহাজে উঠিবার পূর্বে আমাদের বলা হইয়াছিল যে এক একটা ক্যাবিনে ৬টা বার্থ আছে ও সকল ব্যবস্থা ভালই। এখন সামরিক বিভাগের স্বরূপ প্রকাশ পাইলে পর দেখা গেল যে জাহাজটি অসামরিক যাত্রীর খরচায় সামরিক লোকেদের সুবিধার জন্য চালান হয়। ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগ অনেক চিন্তা করিয়া এই অভিনব উপায়ে বিনা বা অল্প খরচায় নিজেদের লোকজন পারাপার করিতেছেন। জাহাজে প্রায় ১০০০৲ টাকা দিলে একজন অসামরিক যাত্রী যে সুখ সুবিধা উপভোগ করেন তাহার যথার্থ মূল্য সম্ভব ৫০০৲। অর্থাৎ এক হাজার যাত্রী পাইলে সমর বিভাগের এক যাত্রায় পাঁচলক্ষ টাকা লাভ হয়। সেই টাকায় অন্তত ১৫০০ সৈনিক পারাপার করা চলে। এই অভিনব কল্পনা আমার নীতি যে কতটা অন্যায় তাহা জাহাজে কিছুদিন থাকিলে বুঝা যায়। সমর বিভাগের কর্মচারীদের সুবিধার জন্য এমনকি মহিলাদিগকেও এ ক্যাবিন হইতে বিতাড়িত করিয়া অপর ও নিকৃষ্ট ক্যাবিনে পাঠান হয়। সকলকে একটা কাগজে সই করাইয়া তবে জাহাজে উঠিতে দেওয়া হয়। কাগজটিতে লেখা থাকে যে যাত্রী সকল নিয়ম কানুন মানিয়া সকল অসুবিধা সহ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। ইহা অবশ্য লেখা নাই যে জাহাজটি সৈনিকদের সুবিধার জন্য অপর সকলে শুধু তিনগুণ অর্থব্যয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূজা করিতে অধিকারী। সমর বিভাগের সত্যকার প্রয়োজন ও নিছক স্বার্থপরতায় বিভেদ বিচার কে করিবে? আমার মনে হয় যে ভারত গভর্ণমেণ্ট, অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব গভর্ণমেণ্টের উচিৎ অবিলম্বে ভারতীয় যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত জাহাজের ব্যবস্থা করা। কারণ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিমাসে সহস্র সহস্র যাত্রী ইয়োরোপ-আমেরিকায় যাইতেছেন ও তাঁহারা অশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া ও বহু অর্থব্যয় করিয়া যাইতে পারিতেছেন। এই অর্থে অনায়াসেই প্রতি মাসে দুই তিন খানা জাহাজ ভারত হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যাইতে পারে।

জাহাজে প্রধানত দলবদ্ধভাবে তিন জাতীয় যাত্রী আছে। বয় স্কাউট, সৈনিক ও ফিরিঙ্গী। বয় স্কাউট দল ভারতবর্ষের তরফ হইতে ফ্রান্সে "বয় স্কাউট জাম্বোরী"-তে যাইতেছে। বাংলা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ,

যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি সকল প্রদেশের বয় স্কাউটই আছে। আমাদের যৌবনকালে বয় স্কাউটরা কিছুটা অন্য রকম ছিল। পাঞ্জাবী স্কাউটরা অধিকাংশেই শুধু নামে "বয়"। অনেকেই "বয়" অপেক্ষা বয়ের পিতৃস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। ইহা পাঞ্জাবের জল হাওয়ার গুণ অথবা পাঞ্জাব বয় স্কাউটদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দোষ তাহা বলিতে পারি না।

সৈনিক বেশীর ভাগই ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের সময় তাহাদের যে শক্তি ও স্বাস্থ্যের নমুনা দেখা গিয়াছিল বর্ত্তমানে তাহা বিশেষ দেখা যায় না। অনেকেই দেহে কিছু চর্ব্বি জমাইয়াছেন। পরের খরচায় খাইয়া আরাম করিতে পারিলে ইহা স্বাভাবিক। সাধারণ চাল চলন ও ব্যবহারে সৈনিকগণ বন্য বলিয়াই মনে হইল। জাহাজে তাহাদের কাজ, খাওয়া, বসিয়া থাকা ও সারা জাহাজে লাগান লাউড স্পিকার নিঃসৃত হুকুম অনুযায়ী ইতস্তত ছোটাছুটি করা। এই লাউড স্পিকারগুলির নিউসেন্স ভ্যালু বা বিরক্তকারিতা অসীম। প্রতি ক্যাবিনে, লাউঞ্জে, ডেকে, ভোজনকক্ষে স্নানঘর হইতে ইঞ্জিন ঘর অবধি সর্ব্বত্রই এই লাউড স্পিকারের ঘটা। ফলে ফলে, "অ্যাটেনশন অল প্যাসেঞ্জারস" কিম্বা "অ্যাটেনশন অল বি, ও, আরস" শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক লাউড স্পিকারের হুঙ্কারের বিরাম নাই। মনে হয় যে ব্যক্তি লাউড স্পিকারের বক্তা তাহার সম্ভব গৃহে কথা বলিবার সুবিধা মিলে না তাই সে নিরীহ জাহাজ যাত্রীর উপরে প্রতিশোধ লইতেছে। বি, ও, আর, অর্থাৎ বৃটিশ সাধারণ সেনাদারা কখন খাইবে, কখন আসিবে, কখন কাঁদিবে তাহার নির্দ্দেশের আলোড়নে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ওয়ার এফর্ট যে জাগ্রত দেবতা তাহা যেন কেহ না ভুলে সেই জন্য এই চিরসুখর বন্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ফিরিঙ্গীরা তাহারা ফিরিঙ্গী নহে এই কথাটা প্রমাণ করিতে সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত ও ব্যাকুল। পাছে কেহ মনে করে যে সে ইংরেজ নহে এই উদ্বেগে তাহার মন সতত আকুল ও অবথা গায়ে পড়িয়া তাহার ইংরেজত্ব জানাইয়া সে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের দেখিয়া মনে হয়—

নহ মাতা, নহ কান্তা, নহ তুমি কোন আত্মীয়
অন্তরে উৎসুক সতত—
যে ফিরিঙ্গী অন্ধ তমি
বচন বিন্যাসে
"কুহু কুহু" "কহু কহু"
অর্দ্ধ অবধানে
হইলে দণ্ডধারী হায়, শার্দ্দূলের মাসী
ব্যাঘ্রের নখর অভিলাষে।

সকলের জিনিষপত্র হারাইয়া দিলাইয়া, যাত্রীদিগকে যথেচ্ছা ও যত্র তত্র থুথু দিয়া জাহাজ ছাড়িল। বোম্বাইয়ের বলপথ চক্ষের আড়ালে যাইবার পূর্ব্বেই আরব্য সাগরের চেউয়ের দাপায় জাহাজ দুলিতে আরম্ভ করিল। যাত্রীদের মুখের হাসি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎস্থানে একটা কাতর

নিষ্পেষিত পিতৃগত প্রাণ পথহারা ভয়ত্রস্ত ক্রন্দনের ভাব মুখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। সৈনিক তাহার বীরত্ব ভুলিল। রূপসী তাহার রূপ ভুলিল। একজন মাড়োয়ারী "ভাও" তুলিয়া " ভেউ ভেউ 'করিয়া উঠিল। ইহাকে বলে সমুদ্রাতঙ্ক রোগ বা সি-সিকনেস। দ্বিপ্রহরের খানার সতেরো পঞ্চাশ জন অনুপস্থিত; চারে সতেরো পাঁচান্তর ও নৈশ ভোজন কালে সতেরো নব্বই। যাহারা এই জলকাতর স্থলবিহঙ্গ হইতে বঞ্চিত তাহারা বিস্কুট ও কমলা লেবু বহিয়া কক্ষে কক্ষে প্রিয়জনের সেবা করিতে লাগিল ইহাতেও আবার সেই ওয়ার একট ও সময় বিভাগের মোড়লি জাগিয়া উঠিল। "কেহ ক্যাবিনে খাইতে পারিবে না বলিয়া হুকুম জারি হইল। কেননা সি-সিকনেস সাময়িক আইনে গ্রাহ্য নহে। ক্যাবিনের ভৃত্যেরা দু'পয়সা কামাইয়া লইতে আরম্ভ করিল, কেননা সাময়িক নিয়ম কানুন ও ব্ল্যাক মার্কেট মামুলি-সিসতত ভাই। বক্ষিশের আশা ও নগদ বিদায়, উত্তম প্রেরণাতেই খাদ্য সরবরাহ চলিতে লাগিল। অবশ্য অনেকে সত্য সত্যই খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্রের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে লাগিলেন।

জাহাজে সমরশক্তির অতিব্যক্তি হিসাবে স্নান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন সুবিধার কোন আয়োজন নাই বলিলেই চলে। সি-সিকনেস আক্রান্ত যাত্রীদের এই জন্য বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার সম্ভব নহে, কেননা যাহা নাই তাহা নাই। এক একটা স্নানাগার বা সিংহাসন কক্ষে পঞ্চাশ জনের অংশীদারী। প্রায় সাচ্চা কম্যুনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছি। বাঘার দলের ভীম যেমন অভিনয়ান্তেও পেটে বালিস বাঁধিয়া ঘুরিতে চায়, বৃটিশ সমর বিভাগও তেমনি যুদ্ধ শেষ হইয়া পুরান হইয়া যাইলেও বাক্যে বেশে ও ব্যবহারে কুচ-কাওয়াজ থামাইতে পারেন নাই। ইহার ধাক্কা সামলাইতে হইতেছে নিরপরাধী অসামরিক যাত্রীদের। কিছু বলিলে বলে, "দিস ইজ এ ট্রুপ শিপ" অর্থাৎ কিনা এটা একটা সেনাবহনকারী জাহাজ। কিন্তু হায়, আমরা ত সেনা নই। সেনা সুলভ সেই স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা ও কর্ম বর্জিত জীবন যাত্রা ব্যক্তিস্বাধী অসামরিক মানবে সম্ভব নয়।

আরব সাগরে জাহাজ দোল খাইতেছে। তাহার ইস্পাতের পঞ্জরাস্থির গোপানি ও বহু যাত্রীর সমুদ্র পীড়ার হা হুতাশ মনসুন তাড়িত জলরাশির ভয়ঙ্কর নিনাদকে ঘাবাইয়া রাখিয়াছে। সকলে ঘিন ওনিতেছেন কবে এডেনে জাহাজ পৌছিবে।

এক দুই করিয়া পাঁচ দিন কাটিয়া গেল ও আমরা এডেনে আসিয়া পৌছাইলাম। এডেন প্রায় চেনা যায় না। যুদ্ধের সময় এ বন্দরটির চেহারা অনেক বদলাইয়াছে মনে হয়। বেতারের মাস্তুল, তেলের ঘরাই ও কাঁচা পাকা অসংখ্য ইমারতে চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছে। আমরা অনেকে জাহাজ হইতে নামিয়া এডেনে চিঠি ছাড়িতে ও বেড়াইতে গেলাম। এখানে প্রায় ছয় বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। ইহা অবশ্য এডেনের পক্ষে নূতন কিছু নহে। বালি, পাথর ও পয়সা এই তিন উপকরণে এডেন গঠিত। দোকান বাজার ভালই আছে ও সস্তা। ভিখারীর সংখ্যা অনেক, কেননা একটা জাহাজ থামিলেই বহু লোক অপর কাজ স্থগিত রাখিয়া কিছুক্ষণ ভিক্ষা করিয়া লয়। একজন হিন্দুস্থানী ছোকরা জুটিয়া গেল। তাহার সাহায্যে সস্তায় একটা ট্যাক্সি ঠিক করিয়া কিছু ঘুরিয়া ও সওদা করিয়া জাহাজে ফিরিলাম। জাহাজ ৯।১০ ঘণ্টা এডেনে থামিয়া পুনরায় লোহিত সাগরের পথে যাত্রা করিল। বোতলের গলার মতো সরু পথে অনেক চলিয়া লোহিত সাগরে প্রবেশ করে। এই স্থানটি এত গরম

যে সভ্য সত্যই ব্রহ্মতালুপথে মস্তিষ্ক রাজ্যে পরিণত হইয়া বহির্গমন চেষ্টা করে। আরবেরা সূর্য্য বংশীয় নিশ্চয় নতুবা বহুকাল নির্মূল হইয়া শেষ হইয়া যাইত। এই জাহাজটি আসলে বেশ ভাল; শুধু সমর বিভাগের বেতালা হস্তক্ষেপের জন্য সভ্য মানুষের পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক। খানা কামরায় টেবিলে "অয়েল ক্লথ" পাতা এবং ছুরি, কাঁটা, চামচ, প্রভৃতি অসম্পূর্ণ ও সংখ্যায় কম। চায়ের সময় একটা চামচ পকেট হইতে বাহির করিয়া ইবার্ট বলে "ইহাতেই সকলে কাজ সারিয়া লউন, আমাদের আর চামচ দেয় নাই।" অথচ অপর সময় চামচের বন্যা বহিয়া যায়। আইস ক্রীম খাইবার জন্য দানবীয় আকৃতির চামচ লাগাইয়া দেয় ও মাছ খাইবার জন্য বন্দুকের সঙ্গীনের মত বড় বড় ধারাল ছুরি সরবরাহ করে। খাওয়ার জিনিষ প্রচুর কিন্তু রন্ধন পারিপাট্যে অখাদ্য। মেষ শাবক নামে হরত উষ্ট্র মাংস আসিয়া পড়ে এবং মাছের নামে হাঙ্গর, তিমি প্রভৃতির সদ্গতি হইয়া যায়। রুটি, মাখন, চিনির কোন অপ্রাচুর্য্য নাই। চা, কফি ইত্যাদিও মুক্ত হস্তে দিয়া যায়। শুধু সমর বিভাগ ওয়ার্ড একটু হেতু চর্ম্মকার সাহায্যে রন্ধন ব্যবস্থা করিয়া জাহাজের গৌরব করিয়াছেন। আমার প্রায়ই সন্দেহ হয় যে ঘোড়ার মাংস খাওয়াইতেছে। আমার ক্যাবিনে নৃত্যশিল্পী রামগোপাল রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "না, ঘোড়া নয়, গাধা।" যাহাই হউক সন্দেহটা থাকিয়া যাইবে।

লোহিত সাগরের লোহিত রংটা জলে প্রায় লক্ষিত হয় না। কোথাও কোথাও এক প্রকার শেওলার আবির্ভাবে জলটা লাল দেখায়; কিন্তু লোহিত সাগরের জল ঘন নীল। আবহাওয়াটা বিশেষ গরম। সমুদ্রের এক পারে আরব ও অপর পারে আফ্রিকার মরুতট। দুই পাশের বালুর ঝড় আকাশ রাঙাইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া বহিয়া যায়। অতি সূক্ষ্ম বালুকণায় জাহাজ ছাইয়া যায়। এই বালুর ঝড় ও পৃথিবীর গ্রীষ্ম প্রধান দুই মহাদেশের অন্তরীক্ষে কোলাকুলির ফলে লোহিত সাগরের আবহাওয়া সতত লোহিত-উষ্ণ বা "রেড-হট"। যে গরীব এই আবহাওয়ার সমর বিভাগের মুক্ত প্রচেষ্টার ঋণ শোধ করিতে আলকাতারায় যাত্রীরূপে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে তাহার কুতিপাক বাস সম্পূর্ণ হইয়া পূর্ব্বজন্মের "একাউন্ট" পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।

চার দিন লোহিত সাগরে ভাসিয়া অবশেষে সুয়েজ বন্দরে জাহাজ থামিল। এখানেই যুদ্ধের ফলে একটা বিরাট সমর গড়িয়া উঠিয়াছে। দূর হইতেই দৃষ্ট অট্টালিকার সারি দেখিয়া মনে হয় বুঝি আমেরিকায় আসিলাম। সুয়েজ পূর্ব্বে ছোট খাট বন্দর ছিল। এখন এখান হইতে কাইরো পর্য্যন্ত রাস্তা, আর সামরিক ঘাঁটিতে ভর্ত্তি। সুয়েজ খালের ধারে ধারে অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি। ইংরেজের কোমল হস্তের স্পর্শে মিসর দেশের মাটি কম্পিত, সচকিত। বহু ফাউটের অনেকে এবং যাত্রীদের কেহ কেহ সুয়েজ হইতে মোটরে কাইরো ও পিরামিড দেখিতে চলিলেন। পাণ্ডা আমাদের সেই চির পরিচিত টমাস কুক কোম্পানী। জাহাজ যতক্ষণে সুয়েজ খাল বাহিয়া পোর্ট সৈয়দ পৌঁছিবে, ইঁহারা ততক্ষণে কাইরো-পিরামিড দেখিয়া পোর্ট সৈয়দে আসিয়া পুনরায় জাহাজ ধরিবেন। আমরা ধীর মন্থর গতিতে খালের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খালটা মধ্যে মধ্যে এক একটা হ্রদে গিয়া বিলিত হয়। সেই সকল স্থানে বন্দরের মত অনেক জাহাজ জমিয়া থাকে। খাল দিয়া এক সময় মাত্র একটা বড় জাহাজ চলে। হ্রদে আসিয়া অপরাপর জাহাজকে যাইবার পথ দেয়।

প্রায় ষোল ঘণ্টা খালের পথে চলিয়া পোর্ট সৈয়দ পৌঁছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ সমর বিভাগের নির্দেশ অনুসারে কাহাকেও ডাঙ্গায় নামিতে দিল না। জাহাজের ডেকেই সহরের বড় বড় দোকানদারেরা আসিয়া হৈ হৈ খুলিয়া বসিল। তৎসঙ্গে একজন যাদুকর ও দুই তিনটি পকেটমারও আসিল। যাদুকরটি খুবই ভাল। সে অবলীলা-ক্রমে যেখান হইতে অসংখ্য মুরগীর ডিম বাহির করিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিল। এই প্রকার লোক থাকিতেও যে সমর বিভাগ জাহাজে স্ত্রীপুরুষ-যাত্রীদের হস্তি উষ্ট্র ইত্যাদির চপ কাটলেট খাওয়াইয়া থাকেন, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। জাহাজের সুপকার মহাশয় করাসী কেতামতে মাথায় একটা সাদা কাপড়ের শেকের টুপী পরিয়া ঘুরা-ফেরা করে। আমি বলি যে ওটা ওর ছদ্মবেশ; কারণ উহার রান্না খাইলে মনে হয় যে লোকটা যুদ্ধকালে মিউনিশন কারখানায় গোলাগুলি তৈয়ার করিত। এমন কি ভাত রাঁধিয়াও বরফ ঘরে রাখিয়া দিয়াছে ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বাহির করিয়া গরম করিয়া টেবিলে পাঠাইয়া দেয়। কারি অর্থে বুঝিতে হয় যে একটিন সিদ্ধ সিমের বিচি ও এক টিন সিদ্ধ কড়াইশুঁটি, এক বোতল টোম্যাটো সসে বাটিয়া তাহাতে লঙ্কার গুঁড়া ছিটাইয়া ভদ্রলোকের জীবন বিপন্ন করিতে হইবে। বেগুনের ঘণ্টের ঘণ্ট ভাবটা প্রবল হইলেও বেগুনগুলি কাঁচা ও পোকাধরা থাকে। লোকটা কিন্তু আলু সিদ্ধ করিতে বিশেষজ্ঞ। খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া পাতে দিলে কদাপি গর্দ্দভ মাংস বলিয়া ভ্রম হয় না। এই ব্যক্তি জাহাজের রন্ধনশালায় "মাঠে" মারা যাইতেছে বলিলেই হয়। এত আড়ম্বরের সহিত এত অখাদ্য যে পরিবেশন করিতে পারে তাহার স্থান ইংরেজের রাজনীতি ক্ষেত্রে খুবই উচ্চে হইতে পারিত সন্দেহ নাই।

পোর্ট সৈয়দ ছাড়িয়া আমরা সেইদিন সন্ধ্যাকালেই ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিলাম। সুয়েজ খালের মুখের খালের নির্ম্মাতা ফার্ডিনাণ্ড লেসেপের একটা বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। লেসেপ হাত বাড়াইয়া ইয়োরোপীয়-দিগকে এশিয়ার পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। মনে হইল মূর্ত্তিটা ঘুরাইয়া বসাইয়া দিলেই এশিয়াবাসীর ইয়োরোপ লুণ্ঠন সহজ হইয়া যায়।

পোর্ট সৈয়দে আরও ১২০০ সৈনিক জাহাজে উঠিল। তাহাদের কাপ্তান প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত স্থানাভাবে কয়েকজন ভারতীয় মহিলাকে উপরের ডেকের একটা ক্যাবিন হইতে নিচের ডেকের ক্যাবিনে পাঠান হইল। তাঁহারা আপত্তি করায় বহু মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদের বুঝান হইল যে ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে সকলকে সহি করাইয়া লইয়া ছিল যে জাহাজের কর্ম্মচারীদের সকল হুকুম মানিয়া চলিতে আপত্তি করিবে না। সুতরাং মহিলাদিগকে মহাপরাক্রমশালী বৃটিশ সমর শক্তির ইজ্জত রক্ষার্থে ক্যাবিন ছাড়িতে হইল। তাঁহাদের বুঝান হইয়াছিল যে তাঁহাদের নিচের ক্যাবিনে না পাঠাইলে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের ক্যাবিন সকল পাশাপাশি পড়িয়া যাইবে। নিচে নাকি শুধু স্ত্রীলোকদিগের ক্যাবিন আছে। অন্ততঃ তাঁহাদের গলিটায়। তাঁহারা নিচে গিয়া দেখিলেন সেই গলি বা করিডরে একটা ক্যাবিনে বহু পুরুষ বাস করিতেছে। দুই একজন ভদ্র ইংরেজ বলিল, "স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ সম্মান দেখাইবার যুগ গত হইয়াছে। আমরা এখন আধুনিক প্রগতির পথের পথিক। অর্থাৎ সুবিধাবাদের অন্ধ ও নির্লজ্জ অনুসরণে পূর্ণ বয়স্কা।" আমার পত্নী বলিলেন, "হ্যাঁ, কেননা, ডাকাত হ'লেও তোমাদের আদব কায়দাটা আগে জানাই ছিল।" কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট।

ইংরেজী সভ্যতার আদব ও ঐশ্বর্য্য এই সূত্রে গ্রথিত ছিল। আজ ঐশ্বর্য্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভব্যতা অদৃশ্য হইতে চলিয়াছে। যাহার হুঁশজ্ঞান নাই, সে নির্ব্বোধ ও অশিক্ষিত। যাহার ভাষার সৌষ্ঠব নাই, সে গাঁওয়ার। যাহার বস্ত্রের অভাব, সে নগ্নগাত্র বর্ব্বর। কিন্তু যে লেখাপড়া করিয়া, এবং কাপড় জুতা থাকিতেও, নগ্নদেহে অশ্লীল বুলি বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সে অতি-আধুনিক।

ভূমধ্য সাগরের পথ বাহিয়া জাহাজ মল্টার পথে অগ্রসর হইল। সমুদ্র প্রায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ। এইখানে সমুদ্রের রং রূপালী নীল, যেন ঘন নীলের সহিত কে রৌপ্য গালাইয়া মিলাইয়া দিয়াছে। এ জাহাজে যাত্রীদিগের চিত্ত বিনোদনের কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। মদ্যপান, তাস খেলা ও ডেকে ঘুরিয়া বেড়ানই রুচি অনুযায়ী, সময় কাটাইবার উপায়। জাহাজে অসম্ভব ভীড়। ডেকে হাঁটিয়া বেড়ান কষ্টকর তাই অনেকে শুধু হাঁ করিয়া বসিয়া থাকেন বা নিদ্রায় কালাতিপাত করেন। মনে হয় যেন শত বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। ইংলণ্ড পৌঁছিতে আরও কত যুগ বাকী আছে।

জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই যাত্রীদিগকে বলা হইয়াছিল যে জাহাজে জীবনযাত্রা "কঠোর" (austere) হইবে। এই কঠোরত্বটা যে সকল অসুবিধা ভোগের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহার মধ্যে "ডরমিটরি" বা এক ঘরে বহু লোকে বাস করাটা প্রধান। তৎপরে স্নানের অসুবিধা, ভোর বেলা এক পেয়ালা চা না পাওয়া, খাবার টেবিলে অল্পের জন্য পাখিয়া রাখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য; কিন্তু জাহাজে কোন প্রকার কাপড় কাচার ব্যবস্থা না থাকাটা কঠোরত্বের মাত্রাধিক্যে নিষ্ঠুর বা নির্ম্মম হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বোম্বা থাকা যে কত বড় একটা সখের ব্যাপার তাহা দিন পনের কাপড় কাচা না হইলে, বিশেষত যেখানে সহস্রাধিক লোক অল্প পরিসর স্থানে বাস করিতে বাধ্য হয়, ঠিক ভাল করিয়া বুঝা যায় ছাত্রাবস্থায় ও পরেও সঙ্গলের টিউব রেলের সিটে ইংরেজের গায় ও কাপড় বোঝা সম্বন্ধে কঠোর বা austere মন্তব্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এখনও এই সৈন্যবহনের জাহাজে গ্রীষ্মপ্রধান আরব্য ও লোহিত সাগরে সেই কঠোর সাধনার পুনরাবৃত্তি দেখিয়া একাধারে পুলকিত ও সম্মোহিত হইলাম। যাহারা আজন্মের অভ্যাসের ধাক্কায় কাপড় কাচা পরিহার করিতে পারিলেন না তাহারা স্নানের ঘরের ছোট হাত ধুইবার "সিঙ্কে" কোন প্রকারে কাপড় ধুইয়া শয়ন কক্ষে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তাহা শুখাইয়া দিন কাটাইলেন। সৈনিকরা উপযুক্ত স্থানে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজেদের বস্ত্রাদি ধৌত করে, কিন্তু যাত্রীদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করিয়া জাহাজে ধোপার ব্যবস্থা না রাখাটা শুধু "মিনিষ্ট্রি অফ ট্রান্সপোর্টের" পক্ষেই সম্ভব। যাত্রীদিগকে যদি সৈনিকবাহী জাহাজে না চড়িতে দিবারই ইচ্ছা তাহা হইলে শত শত যাত্রীর নিকট হইতে লাভজনক হারে ভাড়া লইয়া তাহাদিগকে জাহাজে তুলিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। আসল অর্থ তাহা নহে। যাত্রীদিগকে অসুবিধা ভোগ করানর উদ্দেশ্য তাহারা যেন কষ্ট পড়িয়া এই কথাই ভাবে এখনও সমুদ্র পথে যাতায়াত কি কষ্টকর। একথা যেন কল্পনাও না করে যে যাতায়াত খুবই সহজ শুধু বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের কারসাজিতে ৩৫০৲ টাকার টিকেটটা ১৯৯৲ টাকায় কিনিতে বাধ্য হইতেছি। যাহাতে একজন যাত্রী জুটিলেই তাহার বদলে দুইজন সৈনিক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে এ সকল ব্যবস্থা তাহারই জন্য সন্দেহ নাই।

জাহাজের মল্টায় আসার কথা না। কিন্তু একজন জাহাজের কর্ম্মচারী তাহাকে অনুরোধ করায় তাহাকে মল্টায় নামাইবার জন্য জাহাজটা মল্টার নিকটে সমুদ্রে দাঁড়াইয়া তাহাকে মোটর বোটে করিয়া তীরে পাঠাইয়া দিল।

এখান হইতে মল্টার বন্দর ও কেল্লা প্রভৃতি বেশ দেখা যায়। বহু রণতরী এখানে রহিয়াছে ও দুই একটা ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটা হাওয়াই জাহাজের বাসা-জাহাজও দেখিলাম। মল্টার সভ্যতা বহু প্রাচীন এবং বড় বড় বাড়ী ও গির্জ্জা প্রভৃতি পাহাড়ের গায়ে অনেক রহিয়াছে। মুসোলিনির মল্টা আক্রমণের চিহ্ন দূর হইতে কিছু চোখে পড়িল না।

মল্টা ছাড়িয়া জাহাজ পুনরায় জিব্রাল্টারের দিকে চলিল। পথে মুসোলিনির হাওয়াই জাহাজের আড্ডা পান্টালেরিয়া দ্বীপ দেখিলাম। এইখান হইতে ইতালীয় হাওয়াই জাহাজ মল্টার উপর বহু আক্রমণ করে। ইতালীয়দিগের যুদ্ধটা অনেকটা অভিনয়ের মতই ছিল বলিয়া মনে হয়, নতুবা অতটা ধাপ্পাবাজী ও আস্ফালন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে এতটা বিফলতার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

জাহাজ যত জিব্রাল্টারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল সমুদ্র ততই চঞ্চল ও মেঘলা রূপ ধারণ করিতে লাগিল। ইহার কারণ বোধহয় পূর্ব্বের গরম জলের স্রোতের সহিত পশ্চিমের শীতল জলের মিলন। নানা প্রকার গুজব উঠিতে লাগিল ঝড় তুফান ইত্যাদির। দুই দিন খুব কুয়াশা দেখা গেল। রাত্রে জাহাজটি "ফগহর্ণ" বা কুয়াশাকালীন সাবধানী বাঁশী বাজাইয়া সকলের নিদ্রা নিপাত করিয়া জ্বালাইয়া তুলিল। ফগহর্ণের আওয়াজটা অতিশয় জোরালো, শ্রুতিকটু ও কান কাটান! দুই এক ব্যক্তি উপরের ডেকে ফগহর্ণের নিকটে খোলা হাওয়ায় শুইয়া থাকিতেন। রাত্রে হঠাৎ উহা বাজিয়া উঠায় তাঁহাদের প্রায় হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কোন দিনই কুয়াশা অধিকক্ষণ থাকে নাই।

অতঃপর দূর হইতে কুয়াশার মধ্যে টিউনিসিয়ার লাইট হাউসের মিটিমিটি সঙ্কেত-বর্ত্তিকার আলো দেখিতে দেখিতে আমরা জিব্রাল্টারের পথে চলিলাম। রাত্রের অন্ধকারে কখন যে জিব্রাল্টারের সঙ্কীর্ণ পথ পার হইয়া জাহাজ অতলান্তিক মহাসাগরে পড়িল তাহা কেহ বিশেষ বুঝিল না। সকলেরই মন ছিল অতলান্তিকে পড়িলে জাহাজ পুনরায় খুব দুলিতে আরম্ভ করিবে। ইহার কিন্তু কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। অবশ্য অনেকেই পুনর্ব্বার অসুস্থ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আমার ক্যাবিনে একজন মাড়ওয়াড়ী যুবক নানখাটাই ও মেওয়া লাড্ডু খাইয়া লণ্ডন যাইতেছিলেন। জাহাজ কিছু মাত্র দুলিলেই তিনি ভূমিকম্প নির্দ্দেশকারী সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের মত চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। তিনি অতলান্তিকের নাম শুনিয়া একটা চৌদ্দা তাড়াতুড়ি ও একঘটি জল লইয়া বার্থে উঠিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে প্রথারের ভয় দেখাইয়া বার্থ হইতে নামাইয়া ডেকে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি কিছুকাল পরে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভাই ত, ঢেউ ত মোটেই নাই।" আমি বলিলাম, "ঢেউ তোমার মাথার মধ্যে আছে। ঢেউ সমুদ্রের নয়, আতঙ্কের ঢেউ।" তিনি ইহার পরে আর পীড়াক্রান্ত হইলেন না।

জাহাজ এর পর সোজা সাউথ্যাম্পটনের বন্দর পথে চলিল। দুইদিন পরে মধ্য রাত্রে আমরা দিগন্তের আলোকমালা ঘুরে জ্বলিতে দেখিলাম। বহু দীর্ঘ সে আলোকমালা অন্ধকারের বক্ষে হীরার হারের মতই শোভা পাইতে লাগিল। মনে পড়িল এইখান হইতেই ইয়োরোপের নৌসন্ন্যাসীর দল প্রথমে পৃথিবী লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া ঐশ্বর্য্য লালসায় নবজাগ্রত আগ্রহে শত শত নৌবহর ক্রমশঃ জগতের ঘাটে ঘাটে পৌঁছিয়া বিশ্বমানবের জীবন অস্থির করিয়া তুলিত। ব্যবসা ও লুণ্ঠন, পরে সাম্রাজ্যবাদ এই পথেই

অবতরণ হয়। পর্তুগালের গৌরবের দিন কবে শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারীরা এখনও লুটিয়া চলিতেছে। রীতি তাহার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কিন্তু নীতি সেই চির-পুরাতন।

তাহার পরে আসিল যে অন্ধ বিন্দু। যাহার নামে সমুদ্র-পথের পথিক মাত্রেরই হৃদকম্প আরম্ভ হয় সেই চিরচঞ্চল উপসাগর। কিন্তু জাহাজের কাপ্তান ও সকল যাত্রীর ভবিষ্যৎবাণী ও আতঙ্ক অগ্রাহ্য করিয়া বিস্কে নিস্পন্দ মুকুর বক্ষের ন্যায় প্রসারিত রহিল। চারিদিকে ফ্রান্সের পাল-তোলা মাছধরা নৌকার সারি। কোথায় ঝড় ঝঞ্ঝা, কোথায় সমুদ্র-মন্থনের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গি। সকলেই আশ্চর্য ও আপিলে খালাস হইবার মত সুখ আনন্দ বিহ্বল। কেহ কেহ অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "ইংলিশ চ্যানেলটা" নিশ্চয়ই একটা শেষ নাড়া দিবে। কিন্তু যখন অবশেষে ইংলিশ চ্যানেলও আসিল এবং তাহাতে সি-গালগুলি হংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইতে দেখা গেল, তখন ভবিষ্যৎবক্তার দল মুখ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে দক্ষিণে ফ্রান্সের তটভূমি পরিষ্কার হইয়া উঠিল এবং বামে ইংলণ্ডের আইল অফ ওয়াইট দ্বীপও দেখা গেল। জাহাজের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

পোর্টস্‌মাথ ও সাউথ্যাম্পটনের আশে পাশে অসংখ্য ইংলণ্ডীয় রণতরীর সমাবেশ। এখনও যে এতগুলি বাকি ছিল তাহা জানিতাম না। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িল ইংলণ্ডের সুসজ্জিত বর্ণবিন্যাস। বৃক্ষমালা ও মাঠের হরিত, গৃহপ্রাকারের ধূসর ও টালির ছাদের রক্তিমাভা। সব কিছুই যেন নক্সা করিয়া বসান।

সত্যেন্দ্র সৌম্য

ভগবান তথাগত আনন্দ শিষ্যের ঘিরে বসে আছেন। চারদিক থেকে গাছ হতে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ছে।

দুই অক্ষৌহিণীর শুষ্ক পত্র ঘিরে তথাগত জিজ্ঞাসা করেন, এই কি শেষ শুষ্ক পত্র।

শিষ্য বলে, না, অরণ্য জুড়ে ছয়ের শুষ্ক পত্র।

তথাগত বলেন, তেমনি জগৎ জুড়ে আছে সত্য। যতটুকু তোমার করতলগত, তার বাইরেও আছে সত্য, সর্বদা স্মরণে রাখবে এ কথা।

ভারতীর আসর

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে কোনো কোনো লেখক ভারতীর যুগের বা যুগের উল্লেখ করেছেন। এই ভারতীর যুগের প্রাচীনতমদের মধ্যে যোগেন্দ্র আমিই এখন শুধু জীবিত আছি। ভারতী-যুগের কথা বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে আজ এই ভারতীর আসরের অবতারণা।

ভারতীর এ আসরের পত্তন বাঙলা ১৩১৪ সালে। স্বর্ণকুমারী দেবী আবার নতুন করে নিয়েছেন তখন ভারতী সম্পাদনার ভার—মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং আমি তাঁর সে-কাজে আমাদের সাধ্যমত যোগ দিয়েছি,—মণিলাল খুলেছেন ছাপাখানা—রবীন্দ্রনাথ সে-ছাপাখানার নামকরণ করেছেন কাস্তিক প্রেস; আমার লেখা 'যৎকিঞ্চিৎ' নাটিকা নিয়ে মণিলালের প্রেসে ছাপার কাজ হলো সুরু; সেই থেকে প্রত্যহ বৈকালে কাস্তিক প্রেসে বসে আমাদের দুজনের নানা কথায় আলোচনা হয়—সাহিত্য-সাধনার কথাই প্রধান—ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবি আঁকি দুজনে।

কাস্তিক প্রেসের অবস্থান ছিল ২০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে—শিবনারায়ণ দাসের লেনের মুখে। লেনের দক্ষিণ-পা ঘেঁষে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী। সে বাড়ী এখনো আছে, তবে তার চেহারা গেছে বদলে। তখন এ বাড়ীর সদর ছিল ষ্ট্রীম-রাস্তার উপর। সদরের দুদিকে ছিল ফ্লোরের উপর টানা বারান্দা, এবং বারান্দার কোলে বড়-বড় কামরা। দক্ষিণ দিকের কামরায় ছিল মজুমদার লাইব্রেরী (এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন বেরুতো এবং এই লাইব্রেরী থেকেই বহু-বারো খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক এবং গানের বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৯-১০ সালে, ৺যোগিন্দ্রচন্দ্র সেনের সম্পাদনায়। ১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সংস্রব ত্যাগ করেছেন, বঙ্গদর্শন তখন সৌম্যেন্দ্রচন্দ্রের হাতে); উত্তর দিকের কামরায় কাস্তিক প্রেস। সামনের কামরায় ম্যানেজারের অফিস, এ-ঘরের উত্তরে বড় এক কামরায় কম্পোজের কাজ হয়,—ছাপার যন্ত্র শিবনারায়ণ-দাসের লেনে ঢুকেই এই বাড়ীরই অন্য কামরায়; এবং মণিলালের অফিস ছিল বাড়ীর দোতলায় দক্ষিণদিকে এক ঘরে।

২২ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তখন সদ্য খোলা হয়েছে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কলকাতার ব্রাঞ্চ এবং চারুচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছেন কলকাতার তার কার্য্যাধ্যক্ষ হয়ে। চারুচন্দ্র তখন থাকতেন মুকিয়া ষ্ট্রীটে (এখন সুরেন্দ্র বসু ষ্ট্রীট)। তিনি প্রবাসীর সহকারী সম্পাদকতা এবং ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের

কলকাতা—আবার অধ্যক্ষতা দু' কাজই করতেন এবং এই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস তখন রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ছিলেন একমাত্র প্রকাশক।

সত্যেন্দ্রনাথ (দত্ত), অজিতকুমার (চক্রবর্তী) এবং আমি একসঙ্গে বি-এ পড়েছিলুম জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ)। পাশ করে কলেজ ছেড়েছি ইংরেজি ১৯০৪, বাঙলা ১৩১০ সালে। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখাশুনা হলো ১৩১৪-র; অজিতকুমার শিক্ষকতা-ব্রত নিয়ে বোলপুর শান্তি-নিকেতনে গেছেন, কলকাতায় আসেন কালে-ভদ্রে,—এলেও দেখাসাক্ষাৎ ঘটে-কচিৎ কখনো। কান্তিক প্রেসের বারান্দায় আসরে চারুচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ নিত্য-নিয়মিত আসতে লাগলেন এবং আমাদের চারজনে খুব অন্তরঙ্গতা ঘটলো। গল্প-কবিতা যে যা লিখি, এ-আসরে তা পড়া হয়; পড়ার পর সকলের সত্য ও সুস্পষ্ট মতামত-প্রকাশ। তার ফলে কোনো লেখা হয় পরিত্যক্ত, কোনোটা মাসিকের পৃষ্ঠায় ছাপা হতে যায়। আমাদের এ মতামত-প্রকাশে সত্য কথা অকপটে হয়ে প্রকাশ পেলেও কারো মনে এতটুকু হিংসা-দ্বেষের গ্লানি জাগে নি,—যেমন অকুণ্ঠোচ্চারে পরস্পরের লেখার সমালোচনা করতুম আমরা, তেমনি অকুণ্ঠ নিবিড় হয়ে জমে উঠছিল আমাদের সখ্য সৌহার্দ্য। বিদেশী বা স্বদেশী কোনো ভালো বই কারো ভালো লাগলে অপরকে তা পড়ানো হতো। এ-আসরে সাহিত্য-আলোচনা ছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে হানেলা আমাদের যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখনি কলকাতায় আসতেন, আমাদের ডাক পড়তো; তিনি নতুন লেখা এনে আগে আমাদের পড়ে' শোনাতেন,—আমাদের যে-সব লেখা মাসিকে ছাপা হতো, সে সম্বন্ধে তিনি মতামত প্রকাশ করতেন,—লেখা সম্বন্ধে আমাদের নানা উপদেশ-নির্দেশ দিতেন। তাঁর কাছে সকলে মিলে যেতুম বিকেলের দিকে এবং ফিরতুম সান্ধ্যভোজ খেয়ে। এ-সময় তিনি ভোজনে বসার নতুন রীতি প্রবর্তিত করেন। মেঝে আসন পেতে বসা হতো, আসনের সামনে একহাত উঁচু কাঠের চৌকি,—সেই চৌকির উপর রাখা হতো ভোজ-পাত্র। রবীন্দ্রনাথ [illegible] পায়ে ঝুলে বসলে, সেজন্য অভ্যাসে সহজে পিঠ ছুয়ে যায়—তাতে পিঠের গঠনে দোষ এবং [illegible] সোজা থাকে। রবীন্দ্রনাথের এ-আসরে বসে তিনি 'ডাকঘর' নাটিকা, 'পঞ্চরক্ষা', 'রাসমণির [illegible] আগে আমাদের শুনিয়ে তারপর ছাপতে দেন।

সত্যেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের গৃহেও আমাদের নিত্য-যাতায়াত ছিল। মণিলাল ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা—একান্ত স্নেহ-প্রীতির পাত্র। বন্ধুত্ব-সূত্রে মণিলালের কাছে আমরা নিত্যই যেতুম। অবনীন্দ্রনাথ তখন নিজে থেকে এসে আমাদের সঙ্গে মিশতেন,—মিশতেন সমবয়সী বন্ধুর মতো। অত-বড় জিনিয়াস্—কিন্তু আচারে ব্যবহারে আশ্চর্য্য অমায়িক,—শিশুর মতো সরল। অবনীন্দ্রনাথ তখন চিত্র-শিল্পে ভারতীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করছেন—সেজন্য চারিদিক থেকে তাঁর উপর চলেছে দারুণ শ্লেষ-বাণ, তীব্র বিদ্রূপ কটূক্তি; 'লিকলিকে হাত-পা'—'টিকটিকির মতো দেহ'—তাঁর অঙ্কিত দেব-দেবী, নর-নারীর চিত্র সম্বন্ধে সাহিত্য-পত্রে সুরেশ সমাজপতি মাসে-মাসে টিটকারী টিপ্পনি ছাড়তেন। সেদিকে অবনীন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই, তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে [illegible] হাতে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার—শিষ্যদের নিয়ে শিল্পের সাধনায় একাগ্র-তন্ময়। আমরা তাঁকে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির মর্ম বোঝাবার কথা বলতুম—তিনি বহু যুক্তি দিতেন; এবং সেই বোঝাবোর ফলে লেখা হলো শিল্প সম্বন্ধে তাঁর এই "ভারত-শিল্প"।

অবনীন্দ্রনাথের গৃহে আরো এক বড় আকর্ষণ ছিল, ও-বাড়ীর লাইব্রেরী—বইয়ের বিরাট বিপুল সংগ্রহ। প্রাচীন যুগের বই থেকে হালের সদ্য-প্রকাশিত হরেক-রকম বই—সব-রকম বইয়ের সমাবেশ। এ-সব পড়ে তাঁদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেতেন, বেছে বেছে অনেক বই পড়তে দিতেন। ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এঁদের স্নেহ-সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভ করে' আমাদের তরুণ জীবন অপূর্ব রসে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

প্রতি-বৎসর মাঘোৎসব হতো মহর্ষির পুরোনো বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রনাথ আনতেন নব নব গীতিমঞ্জরী—প্রাঙ্গণে বিচিত্র-সুরের লহর বয়ে যেতো! এই মাঘোৎসবের সময় প্রাঙ্গণের প্রবেশপত্র পাবার জন্য শিক্ষিত সমাজের যে আগ্রহ আর উত্তেজনা দেখেছি, এখনকার সভা-সিনেমার দর্শকদের আগ্রহ তার কাছে অতি তুচ্ছ মনে হয়!

একবার রবীন্দ্রনাথ এসে অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। বলেন,—সব এখানে-সেখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে আছি, অভিনয় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল! গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ তখনি বললেন—বেশ, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করা যাক্। কথার সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন সুরু হয়ে গেল। গগনেন্দ্রনাথ সাজলেন বৈকুণ্ঠ, অবনীন্দ্রনাথ কেদার—ওঁদের একজন পুরোনো সরকার ছিলেন,—নাম ভুলে গেছি—বয়সে ওঁদের চেয়েও বড়, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখেছি, সেই ভদ্রলোক সাজবেন ঈশান,—কিশোর অবনত (অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র) সাজবে, এবং মণিলাল সাজবেন অবিনাশ। মোর রিহার্শাল চললো—তারপর অভিনয়। সভা বসা হলো ৬ নম্বর বাড়ীর একতলার প্রকাণ্ড হল-ঘরে। ঘর থেকে বেরিয়ে চওড়া বারান্দার বেড় ঘিরে ঘর—বারান্দার দুদিকে প্রশস্ত পথ—সেই পথ এবং বারান্দাকে জড়িয়ে দক্ষিণ দিকে। সুকৌশলে মিলিয়ে এক করে' দিলেন অবনীন্দ্রনাথ বেহারা অফিস থেকে অবিনাশের গৃহে প্রত্যাবর্তন, সে-দৃশ্যে আমরা দেখলুম ঘরের ওদিককার পথে এসে দাঁড়ালো ঘোড়া-জোতা বাড়ীর ব্রাউনবেরী গাড়ী,—গাড়ী থেকে নামলেন অফিসের বেশে মণিলাল—মণিলালকে নামিয়ে গাড়ী গেল চলে এবং মণিলাল বারান্দা অতিক্রম করে' ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন! দৃশ্যসজ্জায় এমন স্বাভাবিকতা কোনো পাবলিক থিয়েটারে দেখি নি! আর অভিনয় যা হলো, অপূর্ব! সে অভিনয় দেখে মনে আছে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেছিলেন—গিরীশ ঘোষ, অমৃত বসু—এঁদের দুজনকে এনে দেখালেন না কেন? ওঁরা অনেক শিখিয়ে পেতেন।

১৩১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স হলো পঞ্চাশ—সেই পঞ্চাশ বছরটিকে স্মরণীয় এক বরণীয় করে তোলবার জন্য এক উৎসবের কল্পনা আগে সত্যেন্দ্রনাথের মনে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে। আসরে তিনি তাঁর এ কল্পনার কথা প্রকাশ করে' বলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কথা আমরা শিরোধার্য করে' নিলুম। কিন্তু আমরা নগণ্য কজন তরুণ। দেশের যাঁরা মাথা, তাঁদের মুরিয়ে এ উৎসবকে জাতীয় উৎসব করে' না তুললে রবীন্দ্রনাথের অমর্যাদা করবো আমরা। মতীন্দ্র বাগচীকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এ প্রস্তাব শুনে মেতে উঠলেন এবং ক'জনে পরামর্শ ক'রে আমরা গেলুম, সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন তখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, তাঁর কাছে। তাঁকে আমরা বললুম—সামনের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছর বয়সে পড়বেন—তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য সাহিত্য পরিষৎ থেকে উৎসবের আয়োজন করুন। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—উচিত কথা বলেছো তোমরা, এ

উৎসবের অনুষ্ঠান আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ কোনো জীবিত লোকের সম্বন্ধে কিছু করতে পারবে না। এ কথায় আমরা অধৈর্য প্রকাশ করলুম। বললুম, যোনো লেখক, স্যার রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পরিষদের নিয়ম খাটতে পারে না। রায়েন্দ্রসুন্দর বললেন, আচ্ছা, সকলের সঙ্গে দেখা করে তোমরা মতামত নাও। এ উৎসবানুষ্ঠানে আমাকে তোমাদের দলে বলে নেনো! রায়েন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে কথা করে আমরা গিয়ে দেখা করি হীরেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে। তিনি সর্বান্তঃকরণে আমাদের প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, বললেন—টাকার জোগাড় চাই। তা ছাড়া এত বড় বিরাট ব্যাপার কি করে অত্ শীঘ্র সম্পন্ন হবে? হীরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা গিয়ে হাজির হলুম ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কাছে। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন—টাকার ভার আমি নেবো। নিজের সাধ্যমত টাকা তো দেবোই, তা ছাড়া দেশের সকলের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করবো। এ কথায় আমাদের মন আশার উল্লাসে পরিপূর্ণ হলো। আমরা ছুটলুম স্যর জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দেশের বাছা বাছা মাথা, তাঁদের সকলের কাছে। সকলে হলেন মহা উৎসাহী—বললেন, আমরা তো আছিই—খাটাখুটি করো তোমরা। কিন্তু বৈশাখেই উৎসব অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। ভেবে চিন্তে ব্যবস্থা করতে হবে—রবীন্দ্রনাথকে যেন যোগ্য সম্মান দিতে পারে, কোনো ত্রুটি না হয়! এই সঙ্গে কেউ কেউ চুপি চুপি বললেন—কিন্তু জানো তো, একটা দল আছে। সে দল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কটুকাব্য করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তারা না চেঁচামেচি করে! তাদের চেঁচামেচি শুনলে কবিকে রাজী করা কঠিন হবে। এ ইঙ্গিত আমরা বুঝলুম, এবং দলটিকেও আমরা ভালো রকম জানতুম। তখন দলের কজন চাঁইয়ের সঙ্গে দেখা করে সবিনয়ে এবং সসম্মানে জানালুম—তাঁদের সহযোগিতা চাই। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ হতে পারে না ইত্যাদি। তাঁরা বললেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, এঁদের বেলায় কিছু করা হয় নি, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের বেলায়? আমরা বোঝালুম [illegible] যে ত্রুটি আর কারো সম্বন্ধে না হয় সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার [illegible] সেই সঙ্গে বঙ্কিমকে সম্মাননার ব্যবস্থা হবে। এ কথায় তাঁরা তুষ্ট হলেন এবং [illegible] তালিকায় নাম লেখাতে রাজী হলেন। এদিককার কাজ চুকলে উৎসব [illegible] হলো। এ সমিতির সদস্য হলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, স্যর জগদীশচন্দ্র, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সারদাচরণ মিত্র, রায়েন্দ্রসুন্দর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। হীরেন্দ্রনাথ হলেন সমিতির সম্পাদক এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর ধন-রক্ষক। ১৩১৮ সালের বৈশাখের ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি-মাসিকে কবিসম্বর্ধনার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো দেশের লোকের অবগতির জন্য। এ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হলো পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের নামে। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছিল—ইতিপূর্বে আমরা দেশের যেই সাহিত্যসেবিগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্ম-তিথি উপলক্ষে যেন আমরা সেই ত্রুটির সংশোধন করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মাননা যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিষ্ঠিত-সভার যথা সাহিত্য পরিষদকে [illegible] ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন এবং পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী

বার্থা করিবেন।...সমিতির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন' ইত্যাদি।

দেশের সকলের সহজ সহযোগিতায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ১৩১৮ সালে ১৪ই মাঘ তারিখে জোড়াসাঁকো টাউন-হলে। সভায় ভিড় যা হয়েছিল, অসাধারণ রকম। সমস্তশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সারদাচরণ মিত্র করেন সভার উদ্বোধন। তারপর ষতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত—

বাণীবর-জনয় আজি স্বাগত সভা মাঝে
অমৃত-চিত্ত-কমলে বেথা আসন তব রাজে...

গানটি ঘরবারী সুরে গাওয়া হলো। গানের পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামদেহাল তর্করত্ন স্বরচিত সংস্কৃত-শ্লোকে কবিকে আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদের পর নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ (কবির বাল্যবন্ধু) কবিকে অর্ঘ্য দেন—একটি রৌপ্য পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ধান, দুর্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, দধি, ঘৃত, পুষ্প ও গোরচনা। মাল্যদান করেন সারদাচরণ মিত্র মহাশয় একটি স্বর্ণসূত্র গাঁথা ও একটি পুষ্পমালা, সেই সঙ্গে একটি স্বর্ণ থালা—খুব সুন্দর কাজ-কাজ-করা ফোটা পদ্ম উপহার। থালা উপহারের পর রামেন্দ্রসুন্দর পুঁথির আকারে হস্তিদন্তের পত্রে উৎকীর্ণ অভিনন্দন দান করেন। অভিনন্দনটি তিনি পড়ে দিয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনন্দন-দানের পূর্বে তাঁর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি চমৎকার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, বালক রবীন্দ্রনাথ "বাল্মীকি প্রতিভা"য় নিজের সম্বন্ধেই যেন ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। "বাল্মীকি প্রতিভা"য় বাল্মীকিকে সরস্বতী আশীর্বাদ করেছিলেন—

যে কমল রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শতদলে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
সে জাহ্নবী বহিবেক অমৃত ঝরণা দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া

এ আশীর্বাণী রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আশ্চর্য রকম সার্থক হয়েছে। তাঁর গুরুদাস ভাবীকালের কথা বলেছিলেন—"বাল্মীকি-প্রতিভা"য় সরস্বতী বাল্মীকিকে অন্যরূপ আশীর্বাদ করেছিলেন—

বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা সব
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।

বাঙলা সাহিত্যের দিকে চাহিলে আমরা দেখি-সাহিত্য-সাধনায় তখন যে-সব তরুণ-তরুণী আজ একাগ্র, তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য—রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তাঁরা পেয়েছেন ভাব, সুর, ভাষা, ছন্দ!

তারপর আমরা—অর্থাৎ যে সব তরুণ-তরুণী সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি, কবির চরণে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়ে ধন্য হয়েছিলুম। আমাদের এই চরণ-বন্দনার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তখনে সে এক

কি শুভলগ্নই না এসেছিল! সেদিনের সে আনন্দ, সে গৌরব আজ আমার জীবনে কেন, অনেকের জীবনেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, সন্দেহ নেই।

১৯১৩ সালে একবার আমরা রবীন্দ্রনাথকে ধরে বসলুম,—উপন্যাস কি করে' লিখবো, আপনার কাছে সে সম্বন্ধে উপদেশ চাই। রবীন্দ্রনাথ বললেন— তোমাদের যদি প্লট দিই? আমাদের ভয় হলো, বললুম, না। আমরাই প্লট তৈরী করে' নেবো। লেখবার টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে আপনার কাছে কিন্তু শুনতে চাই! এ-কথার জবাবে তিনি আমাদের উপদেশ দেন— কোনো ভালো বিদেশী উপন্যাসের তর্জমা করো। লাইন-ধরে' তর্জমা নয়,— উপন্যাসখানি পড়ে' বুঝে তারি প্লট, সেই সব নাম-ধাম চরিত্র নিয়ে স্বাধীন ভাবে লেখো। এতে ষ্টাইল তৈরী হবে; আর বুঝতে পারবে, উপন্যাস লিখতে হলে প্রথমে চাই একটি প্লট—সেই প্লটকে ভিত্তি করে' নানা চরিত্র বিকশিত হবে। ভালো বিদেশী উপন্যাসে দেখবে, কত গৌণ চরিত্রের অবতারণা হয় সে সব চরিত্রকে লেখক শেষ পর্যন্ত লেখক টেনে নিয়ে যান না, তেমনি আবার বহু চরিত্রের আভাসও পাবে না গোড়ার দিকে। তাছাড়া যেটুকু তোমার উপন্যাসের চরিত্র বা ঘটনা ফোটানোর জন্য দরকার, তার বেশী এতটুকু লিখবে না। একগাদা লেখা বড় কথা নয়—লেখা ছেঁটে সংযত করে' তোলাতেই কৌশল দরকার। কালিদাসের শকুন্তলার ঐ যে প্রিয়ম্বদা আর অনসূয়া—কি চমৎকার লাগে ও দুটি সখীকে। কালিদাস কিন্তু নির্মমভাবে ওদের বিদায় করে' দিলেন শকুন্তলার পতি-গৃহে যাত্রার পথে! কোনো আনাড়ি লেখক হলে মমতাভরে ওঁদের হয়তো দুষ্মন্ত-রাজার সভায় টেনে নিয়ে যেতেন কিম্বা শকুন্তলাকে নিয়ে আকাশ-পথে মেনকার অদৃশ্য হবার সঙ্গেসঙ্গে ওঁদের বৈরাগিনী করে বনে নিয়ে গিয়ে ছাড়তেন। অর্থাৎ মমতা যতই থাক, প্রয়োজন-অতিরিক্তভাবে কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে টেনানো চলবে না— তার উপর বিদেশী উপন্যাসের তরজমা করতে করতে বুঝবে উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি। তাঁর এ উপদেশ শিরোধার্য করে' সুনির্মল করলেন নূতন একখানি ডাচ্ উপন্যাসের তর্জমা—এ অনুবাদ 'মায়াবন' নামে ১৩১৭ সালের প্রবাসীতে ছাপা হয়— আমি করলুম ভিক্টর হুগোর Under Death এর অনুবাদ। 'বন্দী' নামে এটি ছাপা হলো ১৩১৭ ভারতীতে। এখানি ছাড়া বোনের 'ঝাঁক' এবং 'নবাব'— এদুখানিরও পর-পর আমি তর্জমা করি— 'মায়াবন' এবং 'নবাব' নামে এ দুটি তর্জমা ১৩১৮ ১৩১৯ (মায়াবন) এবং ১৩২০ (নবাব) ভারতীতে যথাক্রমে ছাপা হয়। সত্যেন্দ্র অনুবাদ করেন জোনা লাই রচিত Livsslaven উপন্যাসের অনুবাদ। 'জন্মদুঃখী' নামে এ উপন্যাস ছাপা হয় ১৩১৮ সালের প্রবাসীতে। চারুচন্দ্র অনুবাদ করেছিলেন 'কাবেরী'— 'আগুনের ফুলকি' নামে একটিও প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে, তা ছাড়া চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ একটি উপন্যাসের প্লট দিয়েছিলেন—সেটি নিয়ে চারুচন্দ্র লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস "স্রোতের ফুল।"

১৩১৬ সালে আমরে আর একটা ব্যাপার স্থির হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, প্রতি বছর পূজার সময় আমরা একখানি করে বই ছাপাবো এবং বইয়ের দাম করবো খুব সস্তা—সকলের পক্ষে যাতে সংগ্রহযোগ্য হয়, এবং এ কথা মনে ১৩১৩ থেকে চার পাঁচ বছর আমরা নিয়মিত একখানি ক'রে বই বার করেছি। আমাদের গল্পের বই যা হোক, স্থির হলো, কবিতার বই কিছুতেই নয়, কবিতার বই কিছুতেই চলে। সত্যেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন,— তোমাদের গল্পের বই কাটবে

পদ্যের হাতে, আর আমার কবিতার বই কাটতে পোসায়। সত্যই তখন বইয়ের বিক্রী এখনকার মতো ছিল না—কবিতার বই বিবাহে উপহার দেওয়াই আছিল, তিন্ন বিক্রী হতো না। তাছি আর রবি মতো নাম থাকতেন, তা হলে তাঁর কবিতার বইয়ের আদর এবং বিক্রয়াধিক্য দেখে কত খুশী হতেন।

আসরে আমরা বসে কত কল্পনা করতুম—আগে বলেছি। এখন সবলে বলেন মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ—তখন কজন চিনেছিল। আমরা তাঁর কাছে ভিড় ক'রে গিয়ে বলতুম—তিনি ছিলেন আমাদের উপদেবতা। কিন্তু দেবতার মতো উর্দ্ধাসনে বসে তিনি নীরব থাকতেন না—আমাদের সঙ্গে একাসনে বসে কত সরস হাস্য-পরিহাস করতেন। তিনি আমাদের নাগালের বাহিরে, এ কথা নিমেষের জন্য আমাদের মনে হয় নি।

আমি তখন ল' পড়ছিলুম এবং এটর্ণির অফিসে আর্টিক্‌ল্ ছিলুম—কিন্তু ফুটোর কোনো পরীক্ষাই দেবো না, মনে মনে ভেবে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, সাহিত্য-সেবা নিয়েই জীবন কাটাবো। চারুচন্দ্র আমার এ-ইচ্ছার কথা একবার রবীন্দ্রনাথকে বলে দেন। শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন···সর্ব্বনাশ! বই লিখে জীবিকার সংস্থান হয় না। আমার বই তোমাদের এত ভালো লাগে! ভালো, আমার এ সব বইয়ের একটা সংস্করণ কল বাহির কাটে নি। শেষে বহুমতীর গুদাম সাবাড়ে 'এক টাকায় চার-খানা কাপড় একখানা কাও'—ক'রে তবে শেষ হলো! তুমি ল' পরীক্ষা দাও। ওকালতি করতে করতে কেন লেখা চালাতে পারবে না? কবিগুরু নিজেও তো উকিল ছিলেন—বড় উকিল, সরকারী উকিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় এবং চারুচন্দ্রের কঠিন তাগিদে বিধি কাল উত্তীর্ণ হবার বহু পরে আমি ল' পরীক্ষা দিয়ে ওকালতি ব্যবসা গ্রহণ করি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প এবং প্রবন্ধাবলীর প্রচার যাতে বেশী করে হয়—তার ফলে সাধারণের রসবোধ জাগ্রত হবে, দেশের হবে কাল্‌চারাল্ প্রোগ্রেস্—(এখন এ-কথা শোনাবে রূপকথার মতো। কিন্তু সে দিনে এ দিনে কতখানি তফাৎ ছিল, একালের আপনারা তা বুঝবেন না। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা—হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে আজ নাচেরে,"—কবিতা। সমালোচনায় 'হৃদয়-নাচা'কে উদ্ভট বলে পরিহাস করা হয়। তাঁর 'বেদনা' কবিতায় "যে-লতাটি আছে শুকায়েছে শুধু,—ছুঁড়ি ধরে শুধু,—নাহি ফোটে ফুল" এ দুটি ছত্র তুলে এক সমালোচক শ্লেষ করে বলেন "কণ্ডাক্টরদের আলোক লতার গান ইহার চেয়ে সহজ। সহায় বেচারী বুঝিলাম না।" তাঁর প্রবন্ধের ভাষা নকল করে টিপ্পনী-কাটা হয়—"রবীন্দ্রবাবু বাঙলা ভাষাকে কোন্ পাতালে লইয়া যাইতেছেন, আমরা অনুধাবন করিতে পারিতেছি না—"সাহিত্য" (মাসিক সাহিত্য সমালোচনা চৈত্র ১৩১৯)। এ উদ্দেশ্যে স্থির হলো রবীন্দ্রনাথের কটি ছোট গল্প নাটকীয় রূপান্তরিত ক'রে ডাওলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আমরা অভিনয় করাবো। চাইবা মাত্র রবীন্দ্রনাথের অনুমতি পেলুম। এবং এ-অনুমতি নিয়ে আমি যুক্তির ছাপায় গল্পটিকে নাটকায় রূপান্তরিত করে রঙ্গমঞ্চ নামে অমৃতলাল বসু মহাশয়ের হাতে দিলুম। তিনি তখনি তাঁর থিয়েটারে এর অভিনয় করালেন। অভিনয় খুব উৎরোলো, এবং খুব প্রশংসার রব কেতাব চাইতে লাগলো। অমৃতলাল এ-কথা জানালেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ আমার সানন্দে অনুমতি দিলেন, 'রঙ্গমঞ্চ' বই ছাপো। 'রঙ্গমঞ্চ' অভিনীত এবং নাট্য-রূপটি ঐ নামে ছেপে বার করা হয় ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে। রবীন্দ্রনাথের এই [illegible] সাহিত্য অনুমতি-দানের কথা [illegible] ভূমিকায় [illegible] ভাষায় প্রকাশ করায় গৌরব-গর্ব্বের [illegible] লাভ করেছে

পারি নি। এর পরে 'বালিয়া'র নাট্য-রূপ দেবার চেষ্টা করি,—সেও যেন বেশ হচ্ছে, আসরে বসে পড়ে শোনাচ্ছি; মণিলাল-সত্যেন্দ্রনাথের কথামতো কাটছাঁট করছিলুম— রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, লেখা শেষ হলে তিনি তা ভালো করে দেখে দেবেন—এক দিন সেইদের লেখা খুব সতর্ক হয়েই লেখা চলছিল। কিন্তু খবরটা প্রচার করে ঘরোয়া প্রকাশ পায় এবং আমার লেখা বার হবার আগেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নূতন-খোলা চিত্রালী থিয়েটারে (এখন যেখানে বীডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস, সেখানে সেকালে ছিল মরেল বেঙ্গল থিয়েটার; তারপর সে বাড়ী ভেঙে সেইখানে ছোট একটি নাট্য-ভবন নির্মিত হয়েছিল, এখানে "অরোরা থিয়েটার," "ওসপিরান টেম্পল্" প্রভৃতি নামে কয়টি নাট্য-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে—পরে ইংরেজী ১৯১১ সালে অমরেন্দ্রনাথ এ মঞ্চের নাম দেন ভাগ্যলক্ষ্মী থিয়েটার) 'বালিয়া' নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে "জীবনে-মরণে" নাম দিয়ে অভিনয় করেন।

থিয়েটারে নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রে উপস্থিত হয়ে অভিনয় দেখা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের আর আমার প্রোগ্রাম। মণিলাল কচিৎ কখনো যেতেন;—চারুচন্দ্র ছিলেন দারুণ রকমের থিয়েটার-বিরাগী, আমাদের থিয়েটারে অনুরোধ দেখে চারুচন্দ্র আমাদের মৃদু মৃদু ভৎর্সনা করতেন, কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা! "জীবনে-মরণে" নাটিকায় এমন কদর্য রুচির অবতারণা ছিল, যে দেখা যেতো না! পর-পর রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' আর একটি গল্পকে নাট্য রূপান্তরিত করে' অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করেন। সে নাট্যরূপও আমাদের আজ মোটেই কোন্ বইয়ে মনে পড়ছে না, তবে মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে,—বিলাত যাবার সময় মণিলালের নামে পাওয়ার-অফ-এটর্নি দিয়ে যান। মণিলালকে আমরা অভিনয়ের রিপোর্ট দিয়ে তা বন্ধ করতে বলি। মণিলাল তখন রবীন্দ্রনাথের এষ্টর্নি 'মিত্তির এ্যাণ্ড সর্ব্বাধিকারী' ফার্ম থেকে রীতিমত চিঠি দিয়ে এ-সব অভিনয় বন্ধ করান।

[redacted] (কুণ্ডলেরের মে, ঘোষাল নামে প্রখ্যাত) পরলোক-গমনে স্বর্ণকুমারী দেবী [redacted] ভারতীর ভার পোষ্যপুত্র-রূপে ঘোষায় মতো হলো। ১৩২১-এর শেষে তিনি ভারতীর সম্পাদনা-[redacted] রবীন্দ্রনাথীর মণিলালের হাতে [redacted] দেন। মণিলাল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ [redacted] ১৩২২-এর বৈশাখ থেকে। এ সম্বন্ধে বৈশাখের ভারতীতে মণিলাল লিখেছিলেন—"আমার পরম বন্ধু [redacted] শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমার সহিত একযোগে ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।" আমি তখন ওকালতি-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছি এবং প্রাকৃটিশের খাতিরে সাহিত্য-সেবায় শৈথিল্যও কিছু কিছু ঘটছিল। মণিলাল বললেন—তোমাকে সম্পাদনার কাজে না রাখলে তুমি ওকালতিতে যেতে উঠবে। মণিলালের সঙ্গে ১৩২২ সাল থেকে একাদিক্রমে আমি ভারতীর সম্পাদনা করি।

এর দু'মাস আগে ১৩২১ সালে পূজার সময় মণিলাল তাঁর প্রেস আর অফিস তুলে আনেন ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট—প্রকাণ্ড তিন-তলা বাড়ীতে। এ-বাড়ীর তিন-তলায় প্রকাণ্ড ঘরে পড়লো আমাদের আড্ডা। এ-আড্ডাধারীর বল এবং অভ্যাগতের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এবং এতদিন যে সাহিত্য-সাধনা ছিল একান্ত নিজস্ব—বিশেষের তৃপ্তির জিনিষ, সন, ১৩২২ সালে ভারতীর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করা থেকে সে-সাধনায় এলো অনেকখানি দায়িত্ব। লেখার টোনার্ড বজায় রাখতে ত্রুটি করি নি।

ভারতীর সম্পাদনা ভার নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের রায় এসে যোগ দিলেন আমাদের আসরে। তাঁর উপর ভারতীর চয়ন-সঙ্কলন ও অনুবাদ এবং প্রুফ দেখার ভার দেওয়া হলো। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তিনি তখন যৌবনের এক বড় পার্শে আছে করেন—অফিসের পর প্রত্যহ বৈকালে তিনি আসতেন আমাদের আসরে। তরুণ বয়সেই তিনি জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন—তাই গল্পের আসর তিনি মাত করে দিতেন। গল্প-আলোচনায় কোথা দিয়ে সময় কাটতো—হায়ের বন্যা বয়ে যেত। প্রেমাঙ্কুরের গল্প বলবার শক্তি অসাধারণ। আজ পর্যন্ত তাঁর এ শক্তি অটুট আছে—পারিবারিক বিপদ-আপদেও তাঁকে কখনও মুষড়ে পড়তে দেখি নি। সদাহাস্যমুখ, মন তাঁর আশ্চর্য ধাতুতে গড়া। প্রেমাঙ্কুরের মুখে এ সব গল্প শুনে আমরা অনুরোধ করতুম, আপনি এ সব কথা লিখুন। ভারতীতে ছাপা হলে সাহিত্য হবে সমৃদ্ধ। হেসে প্রেমাঙ্কুর বলতেন—সময় কোথায়? শেষে ১৩২৪ সালে শেষকালে দুটি গল্প আমি করলুম তর্জমা এবং প্রেমাঙ্কুরকে না জানিয়ে সে দুটি গল্প ভারতীতে ছাপিয়ে দিলুম তাঁর নাম দিয়ে। প্রেমাঙ্কুর অবাক। আমি বললুম—যদি নিজে না লেখেন এবার, তা হলে যা-তা লেখা ছাপিয়ে দেবো আপনার নাম দিয়ে। ছাপা হলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। তখন প্রেমাঙ্কুরও লেখা ধরলেন। মনে পড়ে, লিখলেন "সাহিত্যের গড্ডলিকা"। রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে যা তা গালাগালি দেওয়া ক'খানা মাসিকের ছিল তখন ব্রত। কোন্ কাগজে এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, তাতে লেখা হয়েছিল—"বিষকুম্ভে বঙ্কিম যে গরল এনেছিলেন, সে গরল পান ক'রে বঙ্কিমের কোন্ সে আত্মীয়ের চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে—এবং সে গরল রবীন্দ্রনাথ দু'হাতে পরিবেশন করেছেন, গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ।" প্রেমাঙ্কুর এই সব লেখায় অসারতা আর মূঢ়তা নিপুণ ভঙ্গীতে দেখিয়ে দেন সে-প্রবন্ধে। তারপর থেকে তাঁর লেখনীতে যে মণি-মুক্তা ফুটেছে—তারি ফলে "মহাস্থবির জাতক" হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের মুকুটমণি। এ মণি দানের মূলে ভারতীর আসরের প্রেরণা কতখানি, মাঝে-মধ্যে বিচার করবো।

১৩২৩ সালে ভারতীর ৪০ বৎসর পূর্ণ হবার কথা। আমরা স্থির করলুম, বাঙলা মাসিকের পক্ষে এত বছর প্রাণবন্ত থাকা পূর্বে আর ঘটে নি—অতএব, ৪০ বৎসরটিকে নিয়ে আমরা উৎসব করবো। ১৩২২ চৈত্র সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা আমন্ত্রণ জানালুম ভারতীর প্রাচীন এবং নবীন লেখকদের। লিখেছিলুম—"যাঁহারা ভারতীর সাময়িক ছিলেন, এবং যে সকল সহৃদয় ভারতীর বন্ধু, তাঁহাদের অনুগ্রহ থাকিলে আমাদের এ কার্য (উৎসব-অনুষ্ঠান) তেমন দুরূহ হইবে না।" এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি সকলেই বৈশাখের জন্য লেখা পাঠিয়ে ছিলেন। ঐ-সব লেখা ছাড়া "পত্রের পাতড়ি" হেডিং দিয়ে প্রবন্ধ-বৎসরের ভারতী থেকে বাছা-বাছা সুপ্রবন্ধ আমরা ১৩৪০ সালের ভারতীর ক'সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলুম।

ভবিষ্যৎ ষ্টাটের এ-আসরে আমরা পেলুম আরো বহু বন্ধু—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে। শরৎ চট্টোপাধ্যায়, অনঙ্গ সেন, বীরেন্দ্রমোহন বাগচী—এঁরাও প্রায় আসতেন। সাহিত্য, সমাজ, আর্ট সম্বন্ধে কত বিচিত্র আলোচনা হতো। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, কোনো নীতির ধার ধারি না

পড়তো না। কি এক চিন্তা ও ভাবের বিনিময়ে আমাদের মনে জাগতো কি-অসাধারণ প্রেরণা আর উদ্দীপনা, আজ এতকাল পরে তার তা বোঝানো সম্ভব হবে না—বিশেষ অল্প-পরিসরে।

অভিনয়-কলার দিকেও আমাদের লক্ষ্য ছিল। বাঙলা থিয়েটারগুলোকে যাতে উন্নততর কাঠামোর ক্ষেত্র করা যায়, সে-বিষয়ে আমাদের অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট'কে প্রথম যখন নাট্যরূপ দেন, তখন সে নাট্যরূপের নাম দেন "প্রায়শ্চিত্ত"। 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশ করছেন হিতবাদী কর্তৃপক্ষ—এ খবর শোনবামাত্র ধনঞ্জয় এবং আমি গিয়ে হিতবাদীর মনোরঞ্জনের (কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পুত্র আমাদের ঘনিষ্ঠ-বন্ধু) কাছ থেকে ছাপা কাইল কপিখানি সংগ্রহ করি। মনোরঞ্জনকে বলি, তাঁর থিয়েটারে এ নাটকে অভিনয় করাবো এবং অভিনয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন বাজারে এ বই না বার করেন। মনোরঞ্জন সম্মত হলেন। তখন আমরা কাইল-কপি নিয়ে হাজির হই অমৃতলালের কাছে। আমাদের অভিপ্রায় শুনে অমৃতলাল রাজী হলেন কাইল-কপি বইখানি তাঁকে দিয়ে এলুম। পড়ে তিনি খুব উৎসাহিত—বললেন, একটি ভালো ছোকরা চাই যে, সুদর্শন, সুগায়ক—তাকে দিতে চাই ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা। আমাদের বললেন সন্ধান করতে বললেন, তিনিও সন্ধান করছেন। মাসখানেক কাটলো, তেমন ছোকরা পাওয়া গেল না। আমরা বললুম, তাঁর থিয়েটারের এক সুগায়ক অভিনেতাকে লক্ষ্য ক'রে, তাঁকে ধনঞ্জয় সাজান। অমৃতলাল বললেন—ও তেমন লেখাপড়া জানে না—শেষে তাঁড় হয়ে দাঁড়াবে ধনঞ্জয় বৈরাগী। আমরা আবার সন্ধান করতে লাগলুম। তিনকড়ি চক্রবর্তী আমায় খুব স্নেহ করতেন। তিনি তখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নামেন নি, নামবার কল্পনাও তাঁর ছিল না। ভবানীপুরে বাড়ির নাট্য সমাজে অভিনয় করতেন। চমৎকার অভিনয়। তাঁকে ধরলুম। তিনি বললেন, শারীরিক ভেবে আমি নামতে পারবো না—কিছুতে না। নিরাশ হয়ে তাঁর থিয়েটারে গেলুম। ওদিকে চলেছে বিবাহ। তাঁদের দলের অন্যান্য অভিনেতা অমৃতলাল ছিন্ন তুললেন আপত্তি। চার-পাঁচখানি বেনামী চিঠি লিখেছে তাঁর থিয়েটারে—সে চিঠিতে তার দেখিয়ে কারা লিখেছে—সে-ক্ষেত্রে কীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্য [illegible] রবীন্দ্রনাথের 'বসন্তরায়' প্রতাপাদিত্য ('বসন্তরায়' কথাটি চিঠিতে লেখা ছিল।) দেখানে দর্শক [illegible] দেবে। অমৃতবাবু এ-ভয় গ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু মিত্র মহাশয় ভয়ে মার্ডান। অগত্যা [illegible] সব চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হলো।

১৯১৪ সালে অজিতকুমার আসেন কলকাতায়। এর আগে যাবে যাবে তিনি কলকাতায় আসতেন এবং বজিয়ে থাকতেন, তারতীর আসরে বৈকালের দিকে কখনো পর-হাজির হতেন না। তিনি আনতেন রবীন্দ্রনাথের নূতন নূতন গান—সুর-সহ কণ্ঠে ভরে—তারতীর আসরে যেন সুরের ধারা বহিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের শুধু নূতন গানই তা নয়; যে সব গান রবীন্দ্রনাথ সেই কোন বিশেষ বয়সে রচনা করেছিলেন, সেগুলিকেও সুরে ভরে এনে তারতীর আসরকে বিভোর করে দিতেন। আজও মনে পড়ে অজিতকুমারের কণ্ঠে শোনা—

"সখি প্রতিদিন হায়, আসে ফিরে যায় কে"

সেই গান—"এসেছি গো এসেছি
মন দিতে এসেছি।

১৯২৪ সালে তিনি ভারতীর জন্য সাহিত্য-সমালোচনা লেখবার ভার নিলেন। 'মাসিকাবাদি' হেডিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি মাসে লেখা দিতে লাগলেন—সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে অপূর্ব চিন্তাধীন প্রবন্ধ তাঁর এ লেখা ভারতীর গৌরব-সমাদর অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯২৫ সালে শিশুর বয়স যখন ছয় বছর তখন বন্ধুবর অক্ষয়কুমার পরলোক গমন করেন। তাঁর অকাল-বিয়োগে শুধু ভারতীর নয়, বাঙলা সাহিত্যের যে বড় ক্ষতি হয়েছে, আমরা তা মর্মে মর্মে বুঝি।

১৯২৫এ আমাদের আসরে এলেন মোহিতলাল মজুমদার। কোন্ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর 'নাবিক শাহের আগমন' এবং 'নাবিক শাহের দেশ'—এ দুটি কবিতা ঐ বছরের ভারতীতে পর-পর-ছাপা হয়। ১৯২৬ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে তিনি লিখতে লাগলেন ভারতীতে 'মাসিকাবাদি'—সাহিত্য ও আর্ট আলোচনা। শ্রীসত্যসুন্দর দাস ছদ্ম-নামে। এ-বছর নরেন্দ্র দেব আসরে যোগ দেন।

১৯২৬এ সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ভারতীর আসর গড়ে তুলবার "রবি-মণ্ডলী" হয়েছিল দুই-অর্থে। প্রথম অর্থ, রবীন্দ্রনাথের রশ্মি-কণার মণ্ডলের পরি। দ্বিতীয় অর্থ, প্রতি রবিবারে এক-একজন সভ্য তাঁর গৃহে অপর সভ্যদের বৈকালে নিমন্ত্রণ করবেন, এবং যিনি নিমন্ত্রণ করবেন, তাঁকে নিজের একটি নূতন রচনা পড়ে শোনাতে হবে,—জলযোগের পর বৈঠকী রসযোগের ব্যবস্থা। ১৯২৬ সালে মাঘ-মাসের প্রথম-রবিবারে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে হলো নিমন্ত্রণ—এ-আসরে সত্যেন্দ্রনাথ পড়ে শোনালেন তাঁর নব-লেখা অপরূপ নাটিকা "ঘুপের ধোঁয়ার"। 'ঘুপের ধোঁয়ার' ১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে ছাপা হয়। রবি-মণ্ডলীর নানা অধিবেশনে এমনি করে পড়লেন চারুচন্দ্র তাঁর লেখা 'জয়ন্তী' নাটিকা; যতীন্দ্রনাথ পড়েন "মুক্তার মুক্তি" (এ নাটিকাখানি পরে ম্যাডান কোম্পানির কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ইংরেজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর-মাসে অভিনীত হয়েছিল); অবনীন্দ্রনাথ পড়েন "নোয়ার কিস্তি", আমি পড়ি 'শাহজাদা' নাটিকা (এখানির পাণ্ডুলিপি আজো পড়ে আছে শিশিরকুমারের হাতে—অভিনয়ের জন্য); হেমেন্দ্রকুমার পড়েন "প্রেমের প্রেরণা" (সিনারিওর পরে অভিনীত); নরেন্দ্র দেব পড়েন কবিতা,—প্রেমাঙ্কুর পড়েন গল্প, সুধীরকুমার চৌধুরী প্রবাসীর পড়েন গল্প; মোহিতকুমার পড়েন কবিতা। রবি-মণ্ডলীর যৌবনে সেবায় আমাদের প্রচুর উদ্দীপনা জোগাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথও আমাদের এ উদ্দীপনা দেখে তাঁর গৃহে করলেন সভ্যদের নিমন্ত্রণ এবং নিজের নতুন লেখা পড়ে শুনিয়ে তৃপ্তি-দানে আমাদের কৃতার্থ করেন।

১৯২৬ ছেলেমেয়েদের মাসিক-পত্র "সন্দেশ" বন্ধ হয়ে যায়—তার জীবন নিঃশেষিত দেখে আমাদের আসরে কথা উঠলো—ছেলেদের জন্য ভালো একখানি মাসিক-পত্রের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কে প্রকাশ তার দেবে? আসরে ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি নিলেন ভার,—বললেন, আপনারা যদি লেখা দিয়ে সাহায্য করেন, দেখাশুনা করেন, আমি দেবো টাকা। এক-কথায় ঠিক হয়ে গেল—ছেলেদের মাসিকপত্র তিনি বার করবেন ১৯২৭ সাল থেকেই। কাগজের নাম সত্যেন্দ্রনাথ তখনি বলে ঠিক করে দিলেন—"মৌচাক"। 'মৌচাকে'র পঁচিশ বৎসরের উৎসবে সুধীরচন্দ্র যে-সব কথা লিখেছিলেন, তারি একটু অংশ উদ্ধৃত করলুম—তা থেকে ভারতীর আসরের পরিচয় পাওয়া যাবে। সুধীরচন্দ্র লিখেছেন, "তখন আমরা সকলেই যুবক। সাহিত্যের নেশায় সবাই

মধ্যে ১৩২৮ সালে আমাদের সাহিত্যের আসর বসতো ভারতী-অফিসে। ভারতী ছিল সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। তখন ভারতীর সম্পাদনা করতেন আমাদের বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সেই সাহিত্যের আসরে সকালে বিকেলে ও সন্ধ্যায় আসতেন সেই সময়কার যাঁরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। এই ছোট সভার সভ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিত্র-শিল্পী চারু রায়, নরেন্দ্র দেব এবং আরো অনেকে। সাহিত্যের সভাটী আমাদের এই আসরকে 'ভারতীর দল' বলে জানতো। শিশির মাসিক পত্রিকা বের করবার প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠলো" ইত্যাদি।

১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ন্যাশনাল থিয়েটারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে যোগ দেন। [illegible] কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের সভ্যদের নিয়ে হাতের ছেঁড়া পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস অভিনয় করেন। এ অভিনয়ে আমি নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে ছিলুম। ইনস্টিটিউটে বহু অভিনয়ে শিশিরকুমার তখন প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন আমি দিয়েছিলুম ওঁর অভিনয় দেখতে। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হই। শুধু কি অভিনয়? সাজসজ্জা, হাব-ভাব—আর সৌরাষ্ট্রির আবহাওয়া এমন বিমূর্ত যে সে-অভিনয় সাধারণ নাট্য-মঞ্চের আদর্শ [illegible] হয়েছিল। ছেলেই শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। তাঁকে আমাদের ভারতীর আসরে আনবার কথাই। তিনি এসেছিলেন অবশ্য বহু কাল পরে—কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে "আলমগীর" নাটকে আলমগীরের ভূমিকায় নামবার দু তিন হপ্তা পরে। আলমগীরের প্রথম অভিনয়-রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল এবং আমি তিন জনে টিকিট কিনে দর্শক হয়ে গিয়ে ছিলুম। শিশিরকুমারের সঙ্গে তিন জনের প্রথম আলাপ হলো বিরিঞ্চি এবং শিশিরকুমার এই সময় থেকে আমাদের আসরে প্রায় নিত্য আসতে লাগলেন। [illegible] আমরা স্থির করে উঠলুম—যাহোক থিয়েটারকে ভালো ক'রে তোলবার জন্য শিশিরকুমারের সঙ্গে [illegible] আমরা চুক্তিবদ্ধ হবো, রবীন্দ্রনাথের নাটক ধরবো। এবং স্থির হলো, কর্ণওয়ালিস [illegible] অভিনয় করাবেন শিশিরকুমার। কিন্তু তাতে বাধা ছিল অনেক। শিশিরকুমার [illegible] উপযুক্ত মহিলা পাত্র পাবেন না। তখন এগ্রিমেন্ট-করা যারা আছে, তাদের নিয়েই চালাতে হবে। [illegible] কিন্তু গভর্নিং বডি যারা ওপরে চাটুছিলুম। তখন মণিলাল বললেন—তোমার এ শক্তি নিয়ে এত-বড় [illegible] রঙ্গালয়ের রঙ্গবোধহীন মালিকের হাত করবে, শিশির! থিয়েটার একটা সভ্যতার গড়তে পারবো না! এবং এই [illegible] মনে বড়ই লাগে উঠলো শিশিরকুমার কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। [illegible] তখন 'তাজমহল কিন্ত' জোড়াসাঁকো করছিল বাঙালী কিন্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার; শিশিরকুমার তাজমহলের ভার নিলেন, এবং সেখানে তিনি খুললেন "আলোর আলো" ছবি। কিন্তু বিরাট প্রতিভা আর বিরাট উদ্যম [illegible] ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তৃপ্তি পেলো না। থিয়েটার চালাবেই হবে—যেমন ক'রে হোক। সুবিধা ঘটলো শীতকালে। [illegible] ইডেন গার্ডেনে এগজিবিশন বসিল—সিভিলিয়ান কিনুচন্দ্র যে তার অধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে শিশির-কুমার ঐ এগজিবিশনে বক্ষ রেঁধে অভিনয় করবেন স্থির হলো। [illegible] স্থির আর তাজমহলের নিয়ে দল গড়লেন। জাহাজারের [illegible] একটা প্রকাণ্ড ঘর ভাড়া নিয়ে বিদ্যেরলালের 'সীতা'র রিহার্সাল দিলেন এবং বড়দিনের [illegible] এগজিবিশনের ষ্টেজে হলো বিদ্যেরলালের 'সীতা'র অভিনয়। অভিনয় সুখ্যাতি এবং অর্থ মিলেছে।

তারপর তিনি উদ্যোগী হলেন নিজের থিয়েটার খুলতে। থিয়েটারের 'স্বত্ব' নিয়ে এলেন, ঠিক নিল, সীতা — নাটকের অধিকারী হন অর্ধ-চাওয়ার মতন সে আশা ত্যাগ করে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে [illegible] করে 'সীতা' নাটক লেখালেন। এ নাটকের রচনা-কাল অর্থ শেষ যে সময় হয়েছিল, সে সময় মণিলাল হুগলি শিবির কুমারের অধ্যক্ষ উৎসাহে।

যোগেশচন্দ্র সীতা নাটক নিয়ে শিশিরকুমারের স্থায়ীভাবে রঙ্গালয়ের পক্ষে যাবে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, যার সঙ্গে ভারতীয় আদরের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস থিয়েটার শিশিরকুমার ভাড়া করেন ইংরেজী ১৯২২ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। ভাড়া করে তিনি তাতে নিজের ভার নিজেই। "আঁধারে আলো" নির্মাণে ভারতীর আসর থেকে মণিলাল এবং আমার সহযোগিতা একটু ছিল প্রত্যহ অবসরের বাসরে বসে এবং বৃত্তাকলী সম্বন্ধে আলোচনা—তার উপর নট-নটী সংগ্রহ। "আঁধারে আলো" দিনের রিহার্সাল হবার পর শিশিরকুমার বললেন, এ-নিয়ে থাকলে থিয়েটার করা চলবে না।

শিশিরকুমার যখন কর্ণওয়ালিস ছাড়েন, তখন ওখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রতাপাদিত্য" পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা হচ্ছিল। দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রাচীর-পত্রও বোধ হয় পড়েছিল। তখন পূজার টিন্ আগে ম্যাডানের বাংলা-থিয়েটার কাজ দেখতেন কালীফিল্মসের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শিশিরকুমার চলে যাওয়ায় সেখানে হুকুম অবস্থা। লাভের ব্যবসা ম্যাডান কোম্পানি ছাড়তে চান্ না। প্রিয়নাথবাবু এসে আমাদের পরামর্শ দিলেন—ওল্ড-ক্লাবের "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনয়ে নির্মলেন্দু লাহিড়ী করেছিলেন কৃষ্ণার ভূমিকায় ভালো অভিনয়, ওল্ড-ক্লাবের নির্মলেন্দুকে যদি আনতে পারেন তা'হলে মুখ রক্ষা হয়। এ কথায় প্রিয়নাথ নির্মলেন্দুকে আনেন ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে। "প্রতাপাদিত্য" পুনরভিনয়ে প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় নির্মলেন্দুর এবং সাধারণ মঞ্চে অবতরণ। প্রিয়নাথবাবু নির্মলেন্দুকে এনেই ক্ষান্ত হলেন না। মণিলালকে এবং আমাকে পাকড়ালেন,—থিয়েটারটা না নষ্ট হয়—এত লোকের জীবিকা উপার্জন যন্ত্রে—ওটাকে বাঁচাতে আমার তেমন অবসর ছিল না। মণিলাল এ অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। রক্তমঞ্চী সাহেব উপর্যুপরি কর্ণওয়ালিসের ভার দিলেন—বিনা-পারিশ্রমিকে মণিলাল সে ভার নিলেন। আমাকে বললেন—প্রিয়নাথবাবুর কথা, সব গড়া-থিয়েটারটা ভেঙে যাবে, এ ঠিক নয়। তাঁরি অধ্যক্ষতায় 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন ওখানকার বাঁধা নাট্যকার। তিনি আমাদের বললেন—"আমি বুড়ো হয়েছি বাবা, থিয়েটারটাকে বাঁচাতে চাই। তোমরা আমার দুই হাত হয়ে আমার সঙ্গে থাকবে।" এর পরে নূতন বই চাই। মণিলাল তাঁর সেই রবি-সভার লেখা "মুক্তার-মুক্তি" অভিনয়ের আয়োজন করলেন। আমরা নিয়ে এলুম বাঁধা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যৌথিক সুর-শিল্পী ওস্তাদ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। গানগুলিতে তিনি বসালেন রবীন্দ্রনাথের সুর,—সুর-সজ্জার ভার নিলুম আমি এবং চারুচন্দ্র রায় নিলেন নৃত্য-সজ্জার ভার আমাদের অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে। নোবোদ্যোগ আনিয়ে ওস্তাদ একখানি কোরাস-গান রামনাইস করালেন। এরপরে খোলা হলো (১৯২৩) ক্ষীরোদ-প্রসাদের "রত্নপরের মন্দিরে"। এ নাটকখানির বিষয়বস্তু কাটে আমরাও অনুমোদন দিয়েছিলুম। "রত্নপরের মন্দিরে" অভিনয়ের পর কর্ণওয়ালিস ছেড়ে থেকে বাংলা থিয়েটার সত্যাধ্যক্ষকে কোম্পানি নিয়ে গুরু-ভার অধ্যক্ষের

ষ্টেজ—কর্তৃত্ব নিয়ে হলো বাগবিতণ্ডা দেখবার ব্যবস্থা। ১৯২৩ সালে মিনার্ভাতে অভিনয় হলো ক্ষীরোদ-প্রসাদের "পরিমল" নাটকের, তারপর বাইরের এক নাট্যকারের লেখা নাটক। এ দুটি নাটকের পরিচালনায় মণিলালের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। ১৯২৩-এই মোর হয় ম্যাডান কোম্পানি সীতা নাট্য সম্প্রদায় ভেঙে দিয়েছেন। এই সময়-প্রসঙ্গে মণিলালের মধ্যস্থতায় শিশিরকুমার অ্যালফ্রেডের ষ্টেজ ভাড়া নিলেন—এবং ১৯২৪-এর ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমার দিন অ্যালফ্রেডে শিশিরকুমার তাঁর নব-সম্প্রদায় নিয়ে আবার অভিনয় সুরু করলেন। অভিনয় আরম্ভ হলো মণিলালের লেখা "বসন্তলীলা" গীতিনাট্যে। রবীন্দ্রনাথের কখানি গান, সেই সঙ্গে মাইকেলের গান ও নিজের কখানি গান লিখে দু-একজন বন্ধুর গান নিলেন—এবং এই কখানি গানে অপরূপ গীতি-নাট্য "বসন্তলীলা"র সৃষ্টি হলো। "বসন্তলীলা"র বেশীর ভাগ গানে সুর দিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—তাঁর গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-কেও শিশিরকুমার প্রথম মঞ্চে নামালেন "বসন্তলীলা"য়। তাঁর কণ্ঠের সেই "হে কণ্ঠি রচিত হইল ফুল ফুটনে" শ্রোতাগৃহে মোহ-জাল বিছিয়ে দিয়ে ছিল। "বসন্তলীলা"র পর শিশির কুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর" করলেন রঙ্গমঞ্চে—সঙ্গে সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের সীতার রচনা ও রিহার্সাল চলতে লাগলো। দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" তিনি পান নি প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সাধারণ নাট্য-সম্প্রদায়ের কারসাজিতে—এ জন্য মণিলাল এবং শিশিরকুমার স্থির করলেন—দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাই বা পাওয়া গেল—নতুন ক'রে "সীতা" নাটক লিখিয়ে অভিনয় করবো এবং এই জিদের বশেই যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে শিশিরকুমার আর মণিলাল লেখালেন "সীতা" নাটক।

সঙ্গে সঙ্গে মণিলাল বললেন—নাট্য-সম্পর্কীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্র বার করা একান্ত আবশ্যক—এতে পাবলিসিটির কাজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলা এবং আমাদের নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখে সাধারণ [illegible] মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। তাঁর এ প্রস্তাবে সুধীরচন্দ্র সরকার পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন—সে [illegible] "নাচঘর"; এর সম্পাদনা তাঁর ভার হলো যোগেন্দ্রকুমার ধর এবং প্রেমাঙ্কুর [illegible] প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো ২৩ বৈশাখ, ১৩৩২। আমাদের তখন এমন উৎসাহ [illegible] পাড়ায় পাড়ায় বিক্রয়ের জন্য একশো কপি "নাচঘর" জমা করেছিলুম—একদিন নয়, ক' [illegible] ধ'রে।

বাঙলা ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাস থেকে মনোমোহন থিয়েটারের মালিক মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে শিশির-কুমারের কথাবার্তা হয় মনোমোহন ষ্টেজ নেবার জন্য। পাঁড়ে মহাশয় তখন তাঁর থিয়েটার বন্ধ করেছেন—এবং এ কথা বৈশাখে পাকা হয়। শিশিরকুমার মনোমোহন ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে থিয়েটার গৃহ দখল করেন পৌষ মাসে। [illegible] শিশিরকুমার যাতে না পান সেজন্য বহু চক্রান্ত চলেছিল—কিন্তু চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। তারপর ঘরোয়া-ভাবে "নাচঘরে" বিজ্ঞাপন ছাপা হতে লাগলো—

"কালের অনন্ত-বহুধমিতার চিরবন্দিতা পীঠ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অধিনায়কত্বে নবযুগের নবীন প্রেরণায় অভিনয়-সৃষ্টির কলাশপথ সুচিহ্নিত নিখুঁৎ পৌরাণিক দৃশ্যপট ও পুরাতত্ত্বের অনুমত সাজসজ্জা, ঘনায়মান রজনীর ঐশী ছায়ই মহা-সমারোহে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে অভিনীত হইবে।"

প্রাবণের শেষাশেষি। তারিখ মনে পড়ছে না), মনোমোহনে বসে 'গীতা' নিয়ে শিশিরকুমার।

তাদেরই চলেছিল ঐ সময় জল্পনা-কল্পনা।

এদিক থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ভিদ-কাব্য কালপ্রাণ উদ্বর্দ্ধিত ক'রে বললেন। তা'র উপায় নাহি বিপদ। ১৩২৯ সালে শ্রাবণ-মাসে সত্যেন্দ্রনাথ কবিদের অকালে ইহলোক ত্যাগ ক'রে ১৩৩০ সালের শেষাশেষি ভারতী পত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্ব যখন আমাদের দুজনের পরে এসে বর্ত্তাবার উপক্রম হয়ে উঠলো, তখন সরলা দেবী স্বামী-বিয়োগের পর কলকাতায় ফিরেছেন। তাঁর হাতে ভারতীর সম্পাদন-ভার ন্যস্ত ক'রে আমরা বিদায় নিলুম।

ভারতীর সম্পাদনা ছাড়লেও ভারতীর আসর ছাড়লো অটুট। এ-আসরে এসে জমায় ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি।

একটা কথা বলতে ভুলেছি—নজরুল আমাদের আসরে আসেন ১৩২৬ সালে। তাঁর কবিতা দু-একখানা কাগজে বেরিয়েছে, আমরা পড়েছি। শক্তি দেখে আমরা উৎসাহিত করেছি, হিরণ ভট্ট ও আমি। ঠিক এমনি সময়ে এক রবিবার-সকালে তিনি এলেন ভারতীর আসরে—সোজা বন্ধু পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ীতে। নজরুলের কবিতার লেখক-হিসাবে নাম ছাপা রয়েছে মুজফ্ফর আহমদ,—'হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম' পড়ছি হেমেন্দ্রলাল। নজরুলের দুটি চোখে অসাধারণ দীপ্তি দেখেছিলাম, আর মুখে যে-সরলতা, তাহাতে আমাদের মনে তা অনুকূল করছে। হেসে আমি বলেছিলুম—'হাবিলদার' কথাটা কেন লেখেন? ওতে মাথার অসুখ হয় যে!' এ-কথায় সরল হাসি-মুখে নজরুল তখনি জবাব দিয়েছিলেন,—আর লিখবো না!

আর একটা কথা, ভারতীর আসরে আমরা যে সকল লেখা পেতুম, তাঁদের সবার মনে ছিল আশা—প্রেরণা—অসাধারণ অধ্যবসায়। একটা দৃষ্টান্ত দি—১৩১৭ সালের মাঘ মাসের শেষে দুর্ভিক্ষপীড়ন উপলক্ষে এসেছে ভারতীতে ছাপার জন্য। ১৩১৭-এর চৈত্র মাসে সব কথানিই ছাপার অযোগ্য বিবেচিত হলো। অথচ বৈশাখ মাস—উপন্যাস না হলে মাসিকের শুধু অগৌরব নয়, আর্থিক ক্ষতি। কোথায় পাই উপন্যাস! আমাদের এক সাহিত্য-রসিক বন্ধু হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন,—আপনারা অনেকেই তো গল্প লিখছেন—আমি বলি, এক-একজন এক-এক মাস ক'রে লিখে যাবেন জানি দিলে যাবে মাসে এক-খানি উপন্যাস লিখে ফেলুন। কথাটা আমাদের মনে লাগলো। মণিলাল বললেন, বেশ, বারোয়ারি উপন্যাস হবে। নাম দেবো বারোয়ারি। তখন সমস্যা হলো, কে সুরু করবে? সময় সংক্ষেপ। প্রথম সংখ্যার জন্য কেউ লিখতে রাজী হন না। তখন হরিদাস বললেন—লটারি ক'রে ঠিক হোক, তাহলে কারো আপত্তি হবে না।...তখনি—নাম আর লেখকদের নাম নিয়ে লটারি হলো। বৈশাখে দেবার জন্য প্রথম নাম উঠলো—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দ্বিতীয় নাম উঠলো সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তৃতীয়ের নামও ঠিক ছিল—এবং ইচ্ছা ছিল, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শেষের পরিচ্ছেদ লেখাবো। তিনি ছিলেন বিদেশে,—তাঁকে পত্র লিখে সব কথা জানানো হলো। তিনি খুশী-মনে লিখতে রাজী হলেন। আমাদের মনে যে কি উৎসাহ! বারোয়ারি লেখা সুরু হয়ে গেল। ছেপে বার হলো, সকলেই খুশী-মনে এক কথায় সবযোগিতায় সমাপ্ত হলেন—প্রেমাঙ্কুর, অবনীন্দ্রনাথ,

[illegible] নই। কিন্তু কাছুন মাসের কিস্তি ছাপা হলো তখনো [illegible] বিলেতে—তাঁকে দিয়ে [illegible] হয় না। উপায়? মণিদাস আর আমি প্রবন্ধে তখন [illegible] ইউনিভার্সিটি [illegible] মধ্য [illegible] ঘরে ঢুকে, ক'রে তাঁকে বাল সেব পরিচ্ছেদ লিখে যেতে। তিনি রাজী [illegible] যে [illegible] উপন্যাসটি লেখার ইতিহাস হলো এই। বোধ হয়, বাঙলার একাধিক লেখক মিলে বসে [illegible] উপন্যাস-ই তার প্রথম পথ-প্রদর্শক। এবং এ-কাজে যে-আনন্দ দিয়েছিল, তা শুধু ভারতীর [illegible] দিয়েছে।

পরবর্তী যুগে সাহিত্য-রচনায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার, [illegible] মহাশয়ের [illegible] প্রথম-রচনা 'ভারতী'তে আমাদের সম্পাদনা-কালেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি ও [illegible] আজ 'ভারতী' করে এসেছে চিরকাল—তার মস্ত গৌরব।

এ-আসরে সকলের সঙ্গে মেলামেশায় যে শক্তি, যে প্রেরণা আমরা প্রত্যেকে পেয়েছিলুম, তা আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয়। এ মেলামেশা না ঘটলে আমাদের আজকের জীবন যে অন্যরকম থাকতো, অন্যের জীবনের মতো হয়তো তাও হয়তো খরা থেকে যেতো অন্যের মতো। এ মিলনকে আমার জীবনে আমি সম্পদ ব'লে মনে করি।

আজ জীবনের দায়াহ্নে এ-সব কথা ভাবতে, বন্ধুদের স্মরণ করতে বসে মন বেদনায় ভরে ওঠে। কোথায় আজ জীবনের যাত্রা-পথে হুলভরে-পাওয়া পরম সৌভাগ্যের মতো সেই সব প্রত্যুষের বন্ধু [illegible] মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, মণিলাল—অকালে তোমাদের হারিয়ে আমি কী-সম্পদ হারিয়েছি, তোমরা [illegible] কতখানি নিয়ে গেছ, তা আমি মনে মনে জানি! তোমাদের স্মরণ ক[illegible] [illegible] নিবেদন করলুম।

[illegible] সৌভাগ্য

বিধাতার [illegible] তবু চাওয়ার বাহিরে ধরিত্রী।
বিধাতা দেবেন, তোমারে যত অর্ঘ্য প্রেরেছ যে।
ধরিত্রী দেবেন, বন্ধু!
বিধাতা দেবেন আরো, সৌভাগ্য তোমারে দিয়েছি, অধিক [illegible] থেকে অধিক আমারি
[illegible]।

কণ্ঠাভরণ

ডঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

(৯)

ডাঃ লেখা ঝিয় তার শোবার ঘরের দরজার বড় ক'রে বাহুতে একটা ছোট গার্মেন্ট [illegible] ডাকে—ডাকের নাম প'ড়েই লেখা লেটাকে নিয়ে ছুটে এসেছে এই ঘরে, [illegible]

ফুলে মেরে হ'ল খানিকটা সরু লাকলাইন, তার একদিকে একটা আঙুল, আর আঙুলে [illegible]

ভয়ান্বিত হ'য়ে লেখা ভাবলে, এর মানে কী ?

মানেটা একটু পরেই প্রকাশ হ'ল। সঙ্গে ছিল একখানা চিঠি :

"লেখা,

অনেককাল পরে দেখে ফিরে এলে শুনলাম তোমার বিয়ে হয়েছে। [illegible] একটা অপূর্ব যৌতুক পাঠালাম। যে কণ্ঠাভরণ পাঠালাম তোমার এ বিয়েতেই [illegible] যৌতুক আর কিছু হ'তে পারে না।

প্রদোষ।"

সেই প্রদোষ। যে একদিন লেখার কথায় শুধু মনে [illegible]

(১০)

[illegible] বছর আগে লেখা পড়তো মেডিক্যাল [illegible] প্রদোষ ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রদোষ ছিল কবি ছাত্র, উজ্জ্বল ছিল তার ভবিষ্যৎ। লেখাও ছিল কবি ছাত্রী, তার [illegible] ভবিষ্যৎ অনেক ঘন। সে নিজে দেখতো আঁকতে অনেকে দেখতো।

হাসপাতালে কাজ ক'রতে ক'রতে তাদের মিলন হল। [illegible] নিবিড় ঘনিষ্ঠতা।

[illegible] কাছাকাছি এসে প'ড়েছিল তারা। প্রদোষ লেখাকে কেন্দ্র ক'রে [illegible] তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে কত না আনন্দ পেতো, লেখার সেবা ক'রতে পেরে কী তৃপ্তিই [illegible]

সেদিন প্রদোষ সবার আগে লেখাকে এসে খবর দিল যে লেখা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছিল, [illegible] অধিকার ক'রেছে—লেখা সেদিন লাফিয়ে উঠে উল্লাসভরে প্রদোষের দু'হাত ধ'রে ব'লে, "ওঃ! [illegible] তোমাকে এই পুরস্কার দেব তা ভেবে পাচ্ছি না।"

এবং সেই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিতে এ সভাস্থলে লেখার শেষ প্রবন্ধ আলোচ্য।

দীর্ঘ নিবিড় ঘনিষ্ঠতার অবকাশে প্রমোদ প্রতিদিনই লেখাকে একান্তভাবে কামনা ক'রেছে, তাকে নিয়েই তার জীবনের সকল স্বপ্ন রচনা ক'রেছে। তবু লেখার সকল কথা-বার্তার ভিতর এমন একটা কিছু [illegible] সে তার মনের একোণে খুঁজে পেয়েছে। লেখা তার সঙ্গে যেন খুব, খুব ভেদের সঙ্গে কথা ক'য়েছে। [illegible] মনে হয়েছিল যেন কোনও পুরুষ বন্ধুর হ'তে পারে।—সে যে নারী, এ বোধটা প্রমোদের [illegible]। তাই নারীকে সম্পূর্ণ অভিভূত ক'রে রাখতো তার বন্ধুত্ব—স্ত্রীর ও [illegible] প্রতি অন্যায় ভা। তাই প্রমোদের মনে হ'ত যে তার নিজের মনের তাঁর যেটা। প্রায় সম্পূর্ণ এই পুরুষনারী ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রকাশ হ'লে যেন ভেঙ্গে যাবে তাদের এই বন্ধুত্ব। তবে তবে তাই কোনদিন মুখে তার সম্বন্ধে কিছু বলে না, বরং চেষ্টা ক'রে এমন ভানটা ক'রতো যেন সেও তাদের এই বিষয়ক প্রভেদটা বুঝতে সম্পূর্ণ অচেতন।

তার লেখার কথা শুনে তার উজ্জ্বলিত ভাবোজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে তার মনে হ'ল বুঝি লেখার পুরুষালি কোনদের ভিতর তাই হ'য়েছে—হয়তো এই তার সুযোগ।

তাই প্রকাশ্যে ব'লে, "পুরস্কার দিতে চাও অনায়াসেই দিতে পার—সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে।"

লেখার উচ্ছ্বাস তাকে অন্ধ ও বধির ক'রে দিয়েছিল তাই সে একথা শুনে আর প্রমোদের মুখ চোখে উৎসুক ভিখারীর দৃষ্টি সে লক্ষ্য করতে পারলে না কি ভিক্ষা সে চায়।

লেখা হেসে ব'লে, "তাই নাকি? কী সে দুর্লভ জিনিষ?"

প্রমোদ আরও উৎসাহ পেয়ে লেখার দুই হাত চেপে ধ'রে ব'লে, "সে পুরস্কার তুমি! দাও যদি তবে ব'লে [illegible]

[illegible] দিতে পারে, তার হাত টেনে নিয়ে সে ব'লে [illegible] তাই অধীর হ'য়ে গেল। কী যে ব'লবে সে ঠিক-পছ ভেবে পেলো না।

লেখা প্রতিবাদ-ও করতে পারলে। কিন্তু সে ভাবলে কেন? কিসে সে লেখার অযোগ্য?—তার অন্তরালে প'ড়লো প্রচণ্ড আঘাত। মনে হ'ল লেখার এত গর্ব কিসের?

এ কথা মুখ ফুটে সে ব'লতে পারলে না, কেন না, বুঝ লেখার ঐ অমলিন ভাষা [illegible] তার মনে ফুটছিল প্রচণ্ড আবেগের ঢেউ। তাই সে স্থানু হ'য়ে চেয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ চুপ-ক'রে থেকে লেখা ব'লে, "তোমার কাছে অন্ততঃ আমি একথা প্রত্যাশা করি নি [illegible]

[illegible] ভেবেছিলাম তুমি বুঝি অন্য পুরুষের চেয়ে ভিন্ন; নারীকে আর সবাই যে চোখে দেখে সে চোখে তুমি দেখ না, নারীত্বের অন্তরালে তার যে মানুষ আছে তাকেই সম্মান ক'রতে জান—সেই মানুষের [illegible] ভুল বুঝেছিলাম।"

প্রবোধ মুখ ভার ক'রে বলল, "এ তুমি অবিচার ক'রছ লেখা। তোমার চেয়ে কাকে আমি বেশী ভালবাসি—"

"সেটাকে চাও না যাতে আমার দেহটাকে বিদ্ধ ক'রে নিতে চাও। নইলে সত্যি সে আর তাকে বলি তুমি তবে কি আমার বিবাহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর রেখে আমার জীবনের সব ও সমস্ত [illegible] পারতে? আমি কি চাই তা তুমি কি জান না এত দিনে? আমি চাই, বিশ্বকে একটা সত্য [illegible] গণ্ডীর মধ্যে না রেখে নিখিল একাগ্র সাধনা ক'রে তাকে দিয়ে যাব এমন একটা দান যাতে দুঃখ অনাদর বাড়বে না, সমগ্র নারীজাতির মর্যাদা বেড়ে যাবে। সে সব জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি যদি আমায় শুধু ভোগের [illegible] ভেবে মোহে মত্ত হ'য়ে এত বড় সাধনাটাকে বিসর্জন দিতে বল তবে কি এই জানবে না যে তুমি ঠিক আর সবার মতো এই দেহটাকেই ভালবাস, আমাকে নয়।"

প্রবোধ লেখাকে ভালবেসেছিল খুব, কিন্তু ভালবাসার ঠিক আত্মবিস্মৃত হ'তে পারে নি। তারজন্যে যে মর্যাদাবোধ ছিল তা এখন সম্পূর্ণ জেগে উঠলো। তাই লেখার এ উত্তরে সে ব'লে দিতে পারলো না, সাধনা ক'রলে তর্ক।

সে বলল, "জগতে যে সব পুরুষ সব চেয়ে বড় দান ক'রে গেছেন তাঁরা অধিকাংশই বিবাহ ক'রেও তাদের কাজ ক'রে গেছেন। মেরীর জন্যেও যদিস কুরী বা ইবসেনের নোরা, বা চিকিৎসা করতে [illegible] সবাই বিবাহ ক'রেছিলেন।"

তর্কে পরাস্ত হবার মেয়ে লেখা নয়। সে ব'লে গেল মাদাম কুরীর আবিষ্কার যদি প্রথমে আকস্মাৎ ক'রেছিলেন তাঁর স্বামী—আর স্বামী যদি বেঁচে থাকতেন হয়তো মারণের নাম তেমনি তাঁর আগেই থাকতো। কুরী দোসিয়েকে নিয়ে স্বাধীন ভাবে কিছু ক'রতে পারতেন কিনা পুরুষের অহং সেটা স্বীকার ক'রতে চায় না। ডল-প্রিকার্টের বাক্সটাই জগতে প্রসিদ্ধ হ'য়েছে তাঁর স্ত্রীর কথা কয়জন?

লেখা বলল, "আমি চাই চিকিৎসা জগতে এমন একটা দান দিয়ে যেতে যাতে আমার নাম লোকে উচ্চারণ ক'রবে পিটার পাওয়ার কল প্রভৃতির সঙ্গে—সে নামে কলঙ্কের কালি থাকবে না কোনও পুরুষ।"

প্রবোধের যুক্তি হার লেখার স্বাভিমানের সীমা নেই। তারও অনেকটা সেই রকম কথা।

লেখাও চটেই জবাব দিল, "কাজেই বুঝতে পারছ অমন অহঙ্কারী স্ত্রী নিয়ে ঘর করা চলবে না।"

"বেশ," ব'লে প্রবোধ উঠলো।

তখন লেখা তার হাত ধ'রে বলল, "বেশ, কিন্তু এই শেষ নয়। তোমায় স্ত্রী আমি না হ'তে পারি কিন্তু তাতে কি থাকবে না? হেসে সে বলল, "তোমার বন্ধু সমর যা অমলকে তুমি বিয়ে ক'রতে পারবে না বলে কি তার বন্ধু নয় তোমার?"

প্রবোধ সোৎসাহে বলে উঠল, "আচ্ছা তাই হবে।"—তার পরও প্রবোধের [illegible] লেখা হ'য়েছে। লেখা বন্ধুত্বের খোলসটা জড়াবার পরবার চেষ্টা ক'রেছে কিন্তু মানিয়ে নিতে পারে নি।

[illegible] বলে ওঠে, "আশ্চর্য! এই কথা একটা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেতে [illegible]।"

[illegible] হেসেছিল, "হাঁ"—কিন্তু ভুলতে সে পারে নি।

(৩)

[illegible] তিনের পর যেখায় বহু সুপ্রীতি এলো তার সঙ্গে দেখা ক'রতে। সুপ্রীতি লেখার [illegible] অনেক দূর [illegible]। এখন সে এম, সে-সি পাশ ক'রে রিসার্চ ক'রছে। লেখারই মত জেদী সে, লেখারই মত তার [illegible] ছিল, বিজ্ঞানের সেবায় সে আত্মোৎসর্গ ক'রবে—বিয়ে ক'রবে না।

সুপ্রীতি হেসে লেখাকে অবাক ক'রে জানাল, "ঠিক আমার বিয়ে—মনে ভাই।"

"সে কি রে? তোর আবার বিয়ে কী? তুই করবি বিয়ে?"

পুরুকোচ্ছল দৃষ্টিতে লেখার দিকে চেয়ে সুপ্রীতি ব'লে, "কেন ভাই, আমি কি বিয়ের বাজারে একেবারেই অচল?—তা বোস্ট বাই ভাবিস একজন বোকা ছেলে তা মনে নি। বেকুবের অভাব কিনা!"

সুপ্রীতির পুরুকোচ্ছ্বাস লেখার মনে কোন আনন্দের সাড়া দিল না। সে অসহিষ্ণু হ'য়ে ব'লে, "যাস, হ'য়ে [illegible] সাধনা! [illegible] ছেলে বিয়ে কেন্দ্রি চন্দ্রন ছেলেদের হাঁড়ি ঠেলতে।"

সুপ্রীতি ব'লে, "না ভাবছিস তা নয়। আমার রিসার্চ আমি ছাড়ছি না! রিসার্চ ভাল ক'রে [illegible] বিয়ে ক'রছি। আমরা দুজনে আমেরিকা যাচ্ছি রিসার্চ ক'রতে।"

[illegible] কলেজ তার স্বামীও সহপাঠি ডি, ফিল-লি ডিগ্রী নিয়ে রিসার্চ ক'রছেন। সুপ্রীতি ব'লে, তাঁরা [illegible] রিসার্চ ক'রবে।

[illegible] রিসার্চ হবে। [illegible] একটা চিরন্তন এক্সপেরিমেন্ট। [illegible] ভুলেই বিয়ে-থাওয়ার কথা হবে। অবশেষে সুপ্রীত এই

"আচ্ছা দেখে নিস আমি কি করি। দশ বছর পর দুজনের কাজ তুলনা করা যাবে। যাস, যাস তুই, [illegible] দিস যেন—তোর প্রস্তাবের মত।"

"আমার প্রস্তাব মানে? আমাকে কি তোর মত ছ্যাকলা ভাবিস্!"

লেখা সেদিন অত protest ক'রে না। এক মাস আগে আমিও এমনি তেজই ক'রেছিলাম। কিন্তু পুরুষ [illegible] হাত। ওরা নেবে ব'লে না নিয়ে ছাড়ে না। আমার কপালটি দেখতে এমন হাবাগোবা গোছ কি [illegible] আমাকে যেন ভয়ে কেমন করে যে আমার "না" অনেকে "হাঁ" বনিয়ে নিলে। তা ছাড়া [illegible] না। তার কোন বাঁধ না।"

সুপ্রীতা তোর গলায় ব'লে, "যাক কি না, জিজ্ঞেসা করিস একদিন প্রবোধকে? তোরা জানিস আর না জানিস, সে [illegible] একটি চিঠি এমন আছে যে পুরুষকে তোর ক'রে 'না' করতে পারে।"

বিস্মিত হ'য়ে সুপ্রীতি ব'লে, "কবে তাই নাকি? সে তো তোমাকে বিয়ে ক'রতে দুই বার এসেছিল। তাই বুঝি প্রত্যাখ্যান—এ তুই ভাল করিস নি লেখা।"

"কেন না, আমি লোকটাকে ঘৃণার হতে রাজী নই। আচ্ছা দশ বছর পরে দেখা যাবে কে ঠিক আমি।"

"সে কথা নয় ভাই। তুই হয়ত ভাল ক'রেছিস কি মন্দ ক'রেছিস ব'লতে পারি না। কিন্তু প্রদোষের জীবনটা মাটী ক'রেছিস। এ কথা জানতাম না তাই আগে বুঝতে পারি নি কি দুঃখে প্রদোষ দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।"

"তার মানে? কোথায় যাচ্ছে সে?"

"সে নাকি জাহাজের চাকরী নিয়েছে: পরশু সে যাবে চ'লে। প্রদোষের জীবনে তোকে বাদ দিয়ে সে জাহাজের ডাক্তারী ক'রতে যাবে শুনে আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝলাম।"

লেখা চমকে উঠে ব'লে, "পরশু যাচ্ছে সে! কই কালও তো সে কথা বলে নি কিছু।"

"মানে? কালও সে এসেছিল? এখনও আসে?"

"কেন আসবে না? বিয়ে ক'রতে চাই নি, তাই বন্ধুত্ব রাখে কেন আমাদের?"

একটু থেমে সুপ্রীতি ব'লে, "বুঝলাম। তাহলে এটা প্রদোষেরই ভুল: তুই যখন তাকে স্পষ্ট না ক'রে তার বন্ধুত্বটাকে বজায় রেখেছিস তখন তারই এটা মনে করা ভুল হ'য়েছে যে সব শেষ হ'য়ে গেছে। তার বরং আরও ছেপে ব'সে প্রতীক্ষা করা উচিৎ ছিল।"

এখন প্রদোষের এই চিঠি সামনে ধরে মনে মনে এই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রতে গিয়ে লেখার মনে হ'ল ঠিক ব'লেছিল সুপ্রীতি। প্রদোষের যদি সে বুদ্ধি হ'ত তবে কি সামান্য লেখাকে নিয়ে এমন খেলা খেলতে পারতো।

(৪)

সুপ্রীতির কথা শুনেই লেখা হঠাৎ বুঝতে পারলে যে প্রদোষ তার জীবনের কতখানি। হঠাৎ তার বুকটা কেঁপে উঠল—উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো দুই চোখ ভ'রে অশ্রু। চোখ মুছে সে উঠে গেল তার বাবার পড়বার ঘরে টেলিফোন ক'রতে।

তার বাবাকে সে বল্লে, "বাবা, অনেকক্ষণ পড়া হ'য়েছে। এখন তুমি একটু বিশ্রাম নাও যে, নইলে আবার অসুখ হ'য়ে প'ড়বে।"

"না, না, আমি যে আছি—এটা শেষ ক'রে যাই।"

"তোমার দেরার কি আবার দেখা আছে নাকি? সে হবে না। চলে যাও।"

বেয়ারা কার্ড উপরে পাঠিয়ে দিলে সে। উপরে গিয়ে সে বলে, "তোমার সে বন্ধুকে বাড়ীর [illegible]"

"সে লোক নেই," হেসে উত্তর দেয় সুপ্রকাশবাবু। "প্রথমে সে তবুও টাকা দিয়ে গিয়েছিল তাতেই সে রেগে গেছে।" [illegible] "তাহলে, তোমার মুখটা দেখি একবার।" ব'লে ডেপুটিবাবু এসে মুখ [illegible] ব'লে, [illegible] ভাল, কিন্তু একটু murmur আছে। প্রদোষকে ডাকি একবার।" ব'লে নীচে গেল।

ডেপুটিবাবুর মেয়েগুলো কী বিশ্রীই ব'কতে পারে। তাদের আর তাড়াতাড়ি কিছু তাদের সৌন্দর্যে খোলাই নেই। অনেকক্ষণ পর যদি বা এয়ারেঞ্জের সাড়া পাওয়া গেল প্রদোষের বাড়ীর সাড়া পেতে গেল এক ঘণ্টা। তবু যা হোক সাড়া পাওয়া গেল।

[illegible] ব'লে বেয়ারা বলে, "প্রদোষ?"

—না প্রদোষ বাবু, সে গেছে তার মামাবাড়ী।

—এখন [illegible] পারে সবাই। —যা হ'ক মামাবাড়ী কাছেই। তাকে ডাকতে লোক গেছে।

আর একটু কেটে গেলে প্রদোষের সাড়া পাওয়া গেল।

সেবা ব'লে, "প্রদোষ?"

"হ্যাঁ, কে সেবা?"

[illegible] যাও। তাঁর মুখের murmurটা ব'সেই গেছে।"

[illegible] নিয়ে।

[illegible] ব'লে মনে ক'রো?"

[illegible] তাকেই এখন দেখতে হবে। আমি চ'লে যাচ্ছি কি না।"

"ওঃ, আমি তোমার সেই পাগলামি! তাহলে চাকরী নিয়ে যাও। ক্ষ্যাপা, ও সব হবে না।"

"হবে না বলবার আর সময় নেই। থাকলেও কিছু নেই। আসছা-মা।"

"আচ্ছা, তুমি এলো তার পর সব কথা হবে।"

প্রদোষ ও তার বন্ধু এসে সুপ্রকাশবাবুকে পরীক্ষা করবার পর সেবা প্রদোষকে ব'লে, "তুমি যেও না [illegible] কথা আছে।"

[illegible] প্রদোষের সঙ্গে সে বাবার অসুখের কথা আলোচনা ক'রলে। প্রদোষ যা সেবা [illegible] সে সবকিছুর [illegible] তাতে তার [illegible] মনে ক'রলে [illegible] lost battle [illegible] করে কিছু করা যায়।

সেই কথা নিয়ে খানিক কথাবার্তার পর লেখা কিছুক্ষণ নীরবে হুঁকো টেনে ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে বলল, "এই কি তোমার বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি প্রদোষ? তাই আমার উপর রাগ ক'রে সমস্ত career ফেলে আসতে পার? সে কী ভয়ানক কাণ্ড ক'রবে? কী লিখবে? কী 'প্রোডিউস' ?"

প্রদোষ চটে ক'রে জবাব দিলে, "ভুল বুঝছো লেখা। আমি রাগ বা অভিমান ক'রে যাচ্ছি না। আমার এ একটা অ্যাডভেঞ্চার। জাহাজে ক'রে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াবো, কত দেশ দেখবো, কত অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা শোনা হ'বে। নিজের পয়সায় তা করা আমার হবে না কোনও দিন তাই যাচ্ছি।"

লেখার মনের ভিতরে যে সব কথা প্রকাশ হবার জন্য আকুল হ'য়ে আঘাত ক'রছিল, এই উত্তরের কোনও ফাঁকে তার কোনও কথাই বলা সম্ভব হ'ল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা শুধু ব'লে, "এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা কি ভাবতেও পারতে তুমি, যদি—যদি তোমার স্ত্রী থাকতো।"

প্রদোষ একটুও দ্বিধা না ক'রে, হেসে ব'লে, "পারতাম না হয়তো। সেই জন্যই এখনি ভাবছি স্থির করে নিজেকে বেঁধে ফেলি নি আমি; সেটা আমার সৌভাগ্য। নইলে এ অ্যাডভেঞ্চার থেকে হয়তো বঞ্চিত হ'তাম। তুমি বুঝতে পারবে না যে কি উল্লাস হ'চ্ছে আমার এই বাঁধনহারার কল্পনায়।" উৎসাহে যেন তার মুখে চোখে হিরণ্ময় দীপ্তি বেরুচ্ছে।

একথায় লেখা ম্লান হ'য়ে গেল। মনের ভিতর প্রকাণ্ড বোঝা যেন এই ভাবতে যে তাকে না পেয়ে প্রদোষ কষ্ট পাবে কি, প্রদোষ মুক্তির উল্লাসে বিভোর। আহতভাবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল লেখা।

তার পর নিজেকে আড়াল দিয়ে ভুলে সে ব'লে, "যাক্ সে কথা ছাড়। ও সব হবে না—আমি বলছি তোমার যাওয়া হবে না। ফেলে যেতে দেবো না আমি।"

প্রদোষ ব'লে, "এ নিয়ে এখন কথা কওয়া বাজে বকাই বটে। কেন না, না যাওয়া এখন তোমার হাতে নয়। আমি এখনি জাহাজে যাচ্ছি সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নিতে। কাল উঠলো আর পরশু তোমে জাহাজ ছেড়ে যাবে। কাজে এ নিয়ে কথা কওয়া একেবারে নিরর্থক।

"তবে আর কি ব'লবো?" ব'লে লেখা চুপ ক'রে গেল। আর কোনও কথা তার মুখে সরল না। বুকের ব্যথায় টন টন ক'রছিল তার মন। আর কোনও কথা কইলে মনে হ'ল যে ভেঙে প'ড়বে।

এতদিন পরে সেই কথা ভাবতে লেখার মনে হ'ল যে বলা উচিত ছিল তার! তার মনে তখনি যে কথাটা আত্মহারা প্রদোষের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বলা উচিত ছিল তার। তা যদি সে বলতো তবে—তবে আজ তার এই সর্বনাশ হয়।

(৫)

সেই যে প্রদোষ চ'লে গেল তার পর অনেক লেখাকে নিয়ে কি খেলাই খেলেছে। হাতে হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে যে মানুষ তার পরিত্যক্তদেহে অভিমান নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গ'ড়তে চায় বিধি অদৃষ্ট তার যে সব ব্যবস্থা নির্মম ভাবে ভেঙে চুরে অবাধালে ছিনিমিনি খেলে তার বুকের রক্তের ভিতর।

প্রমোদ যাবার পর সিঙ্গাপুর ও হংকং থেকে দুখানি চিঠি লিখেছিল সে যেখানে বর্ণনা ক'রে আর ঘটনাগুলি দিয়ে। তারপর এ দশ বছরের মধ্যে কোনও চিঠিই লেখে নি।

দেশে ফিরে তার পর জীবনের দুর্যোগে প'ড়ে এমন করে ভেসে চ'লো যে তার কথা তার মনে আর বেশী সময় পায় না।

প্রফেসরবাবুর অনুমান মতে ডাঃ বর্মন যে আশঙ্কা প্রকাশ ক'রেছিলেন, সেইটাই সত্য দাঁড়ায়।

ডাক্তারেরা তাঁকে উপদেশ দিলেন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে। তিনি তা কিছুতেই মানতে চাইলেন না। যেন না, বয়স-উদ্ভূত শরীরের দিকে শরীর-পাতুলেও তাঁর শরীর ছিল ঘুড়ের মত শক্ত ও কর্মিষ্ঠ। তাঁর যে কোনও অসুখ হ'তে পারে এটা তিনি কিছুতেই স্বীকার ক'রতেন না। মৃত্যু যে গোপনে তাঁর হৃদয় কবরে বাসা ক'রেছিল ইতিমধ্যে, তা তিনি সন্দেহও ক'রতে পারেন নি।

অবশ্যতা তিনিই তাঁর নেশার মত ছিল। তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর এইটাই হ'য়েছিল তাঁর [illegible] ধনী ছিলেন না তিনি, কিন্তু তাঁর একখানা বাড়ী ছিল আর পেনসনের টাকা ছিল। স্ত্রী ছিলেন সংসারিণী। সংসারের ঝামেলা তাই তাঁর পোহাতে হ'ত না।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে যখন লেখা মেডিক্যাল কলেজে প'ড়ে। তার পর তাঁর পুরাতন ভৃত্য অর্জুন নিয়ে সংসারের ভার তাঁর নেবার ভার। লেখা পড়াশুনা ক'রে যতটুকু অবসর পেতো তার মধ্যে যতটুকু পারে ক'রতো।

সুপ্রকাশের বড় ছেলে বাঙ্গালোরে বড় চাকরী করে। মেজ ছেলে দিল্লীতে। বড় মেয়ে ক'লকাতায় বসীয় [illegible] সেই প্রান্তে যাইনি না, থাকেন শুধু সুপ্রকাশ আর লেখা। লেখাও মেডিক্যাল কলেজের [illegible] ইন্টার্নশিপ সারবে হয়ার পর সেও তাদের বাইরে থাকে।

[illegible] পর তাই সুপ্রকাশ অনুভব করলেন তিনি বড় একা। তার ছেলেমেয়েরা কাছে আসে কালে [illegible] থাকে না বাড়ী। বনটা থেকে থেকে হা হতাশ ক'রে ওঠে এই নিঃসঙ্গ নির্জনতায়।

তাই তাঁর দিন রাত্রি কাটতো বই-খাতা নিয়ে।

প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে তিনি গবেষণা করেন, বহু পণ্ডিত সভায় সাময়িক পত্রে বের হয় তাঁর প্রবন্ধ—তা পণ্ডিতেরা পড়েন শ্রদ্ধার সহিত। কিন্তু দেশের লোক তাঁর পাণ্ডিত্যের খবরও রাখে না, কেন না ভারতের মোট অধিবাসীর [illegible] পর্যন্ত—তাতে সুপ্রকাশের নাম থাকে না।

[illegible] তাঁর ভারী নেশা লেগে গিয়েছিল গবেষণায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ [illegible] গবেষণা ক'রতে ক'রতে একদিনে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি পেয়েছেন সেই আলোক যাতে সে সময় [illegible] হ'য়ে যাবে, ভারতের সামাজিক ইতিহাস এশিয়া ইউরোপের মূলের ইতিহাসের একটা পরিচ্ছন্ন ধারা [illegible] যাবে।

এই নিয়ে তিনি লিখতে আরম্ভ ক'রলেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস। দিন নেই রাত নেই তিনি এই নিয়েই প'ড়ে থাকেন। এইটা শেষ ক'রে যেতে পারলে তিনি জগৎকে দিয়ে যেতে পারবেন একটা মস্ত বড় দান।

অনেক কিছু বড় কাজ করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর যৌবনে। অনেক কিছু আরম্ভ ক'রেছিলেন, প্রতিবেশের জন্য ক'রে উঠতে পারেন নি কিছুই। তাতে একটা ব্যর্থতাবোধ তাঁর মনকে ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, আজীবনে হ'ল এই একটা মেলে বুঝি বা তিনি সফল হ'তে পারবেন।

তাঁর হাতে যে সময় বেশী নেই, মৃত্যু যে অদূরে তাঁর প্রতীক্ষা ক'রছে সেই কথা স্মরণ ক'রেই তাঁর কাজের বেড়ে গেল। সময়ের আগে এ কাজটি তাঁর শেষ ক'রতেই হবে।

তাই ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি কাজ ক'রেই চ'লেন। লেখা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে অনেক সময়, অনেক সময় জোর ক'রে তাঁকে বিশ্রাম করায়। কিন্তু লেখা বাপনই বের হ'য়ে যায় অমনি তিনি লেগে যান কাজে।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েই তাঁর আয়ুও তাড়াতাড়ি ক্ষীণ হ'য়ে এল। তিনি শয্যাগত হ'য়ে পড়লেন।

আগে লেখা যখন তাঁকে শারীরিক পরিশ্রম ক'রলে বিপদ হ'তে পারে ব'লতো, তখন তিনি ব'লতেন, "সত্তর বছরের বুড়োর আবার বিপদ কী! ম'রবো? ম'রবই তো ম'রতে, তা নিয়ে এ'রকম অত পাহারা দারী ক'রে কি হবে?"

যখন তিনি শয্যাগত হ'য়ে প'ড়লেন তখন লেখা দারুণ ক্ষোভের সঙ্গে ব'লে, "কেন তুমি আমার কথা শুনলে না, অত কাজ ক'রতে গেলে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি ব'লেন, "কেন যে ক'রেছিলাম কাজ তা কী বুঝবি? জানিস মাত্রাকে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল জীবনে মস্ত বড় একটা কাজ ক'রে যাব। কোনও কিছুই ক'রতে পারি নি। এত দিনে ভেবেছিলাম বুঝি হোল একটা কাজের মত কাজ। কিন্তু হোল-না। জীবনটা একেবারেই নিষ্ফল হয়ে গেল।"

তার পর ব'লেন, "জানিস লেখা, এই দুরাকাঙ্ক্ষা যদি না থাকতো, শুধু সুখের সন্ধান ক'রতাম তবে এর চেয়ে ঢের বেশী সুখী হ'তে পারতাম। কেমন সুখী হবার অনেক অবসর এসেছিল আমার, সে সব সুযোগ যদি অবহেলা না ক'রতাম তবে দুই আনা রকম ভাল থাকতে পারতিস্। আর মনে হ'চ্ছে যে সৌভাগ্য না থাকলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উহা আদৌ হয় নাই জীবনের অভিশাপ।

তোর দাদাদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—তারা শুধু জীবনে দুটি সাত খাওয়া নেবেই খুসী। এ নিয়ে আমার মনে বড় দুঃখ ছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে তাদের হয় নি সেটা তাদের সৌভাগ্য।

আজ লেখা মর্মে মর্মে অনুভব ক'রলে, কী দারুণ ব্যর্থতার এ সত্য।

(৬)

মনে পড়লো তাঁর জীবনের চরম দুর্ভাগ্য যেদিন সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে যখন পিতা হিসেবে মহাপ্রয়াণ।

মহাপ্রয়াণের ব্যাধি তাঁকে পঙ্গু করেছিল কিন্তু তাঁর জীবন হরণ করতে কোনও অশোভন চাঞ্চল্য দেখায় নি। হৃদযন্ত্রের ব্যাধি প্রথম এক একবার আক্রমণ হ'ত তখন প্রাণ নিয়ে হ'ত টানাটানি। তার পর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি উঠতেন। অনেক দিন হয়তো বিশেষ কোনও উদ্বেগই বোধ করতেন না। তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সবার সঙ্গে মিষ্টি কথাবার্তা কইতেন।

এমনি কাটলো দুই বৎসর—কী ক্লান্তিকর দুই বৎসর। তাঁর সত্তর বৎসরের জীবন মনে হ'ল এর তুলনায় সংক্ষিপ্ত।

কোনও কাজ করবার তাঁর অধিকার নেই, যন্ত্রিকের পরিচালনা করবার হুকুম নেই, শক্তিও নেই। এক একদিন তিনি তাঁর লেখা খাতাগুলো এনে পড়িয়ে শুনতেন—ঠিক যেন নিজে কথা বুঝতেও পারতেন না; কি ভেবে কি লিখেছেন তাও মনে হ'ত না।

বুঝলেন তাঁর কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। মনের যে শক্তির বলে তিনি গবেষণা ক'রতেন সে হ'য়ে গেছে লোপ—যে কোতূহল ঠেলা মেরে তাঁকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যেতো তা আর নেই।

হতাশ হ'য়ে খাতা ফেলে দিয়ে তিনি নীরবে অপেক্ষা ক'রতেন।

মরণের প্রতীক্ষায় তিনি অধীর হ'য়ে উঠতেন। এ কী জীবন—নিরন্তর শুধু মৃত্যুদ্বারে আর ভিখারীর মতো ঘোরা। এইটাই তাঁকে ক'ষ্টতো বেশী হয়।

[illegible] উপায়ই তাঁর নেই। বাড়ী তাঁর শূন্য। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী সব আছে কেউ কাছে নেই—শুধু দেখা, সেও যাকে যতটুকু অবসর পায় ততটুকু।

নীরব অভিযোগ উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে তাঁর মনে তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধে। তাদের মানুষ ক'রতে কী না ক'রেছেন তিনি, আজ তাদের পাখা বেরিয়েছে যে আর উড়ে গিয়ে আপন নীড় বেঁধে নিশ্চিন্ত। এই মমতার তাদের প্রতি পুঞ্জীভূত স্নেহ যে নিরন্তর তাদের সুখশান্তি চেয়েছে, তাদের কথা দুটো শুনবার আগ্রহ আজও পাগল হয়ে আছে—তা কি একবারও ভাবে না তারা! মাঝে মাঝে এই ব্যথায় তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু নেমে আসতো যখন কেউ থাকতো না কাছে।

যখন তাঁর ছেলে মেয়ে বা নাতি নাতনী কেউ কাছে আসে তখন উৎসব লেগে যায় মনে, আনন্দের জোয়ার আসে। কিন্তু সে কালে অল্প—রোষ আসে শুধু দেখা—তাকেও তাটা তিনি পান না।

তাই এই দুরন্ত অভীপ্সার প্রান্তিতে তাঁর মন কেঁদে ওঠে। তাদের ওর কি প্রয়োজন ছিল। [illegible] কি এত আয়োজন দাবে—এত কি অন্ন অন্নবস্ত্র

লেখার অনেক কাজ। হাসপাতালের কাজ যখন শেষ হ'য়ে যেত তখনও তার রোগীরা বাড়ীতে আসতে লাগলো। বাইরে রোগীর ভীড় আসে। তাই নিজে তার বাবার কাছে বসবার বেশী সময় হয় না। অথচ বাবাকে ছেড়েও সে যেতে পারে না। তার বাইরের কাজ ছেড়েই দিতে হ'ত কিন্তু এমন সময়ে অতুল বন্ধু নিরঞ্জন এসে তার কাজের সুযোগ ঘটালে।

নিরঞ্জন ছেলেমানুষ, জোর সিক্স বৎসর বয়েস, লেখার চেয়ে ছ' সাত বছরের ছোট। বন্ধুর ছোট ভাই সে, তাদের বাড়ীতেই তাদের আলাপ হয়। সেই সূত্রে সে ক্রমে লেখার কাছে আসা যাওয়া আরম্ভ করে।

নিরঞ্জন একবার ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে বেশ ক'রে স্বাধীন হ'য়েছে। সে পড়েও না, কোনও কাজও করে না। কোনও কাজ নেই তার, তাই সে দিন রাত লেখার কাছ ক'রে বেড়ায়। লেখা পড়ায় বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও ভারী কাজের ছেলে নিরঞ্জন। বাড়ীর লোকে তার টিকিটিও দেখতে পায় না, কিন্তু পরের বাড়ীর কঠিন কাজ থেকে তাদের যে কোনও কাজ অনায়াসভাবে ক'রে দিয়ে সে পায় আনন্দ—সে কাজ যত কঠিন বা ঝঞ্ঝাটের হোক সে কাজ একবার হুকুম পেলে হয়, অমনি ছোটে সে বাজার আর সে কাজ ক'রে দিয়ে তবে সে থামে।

নিরঞ্জনের এই অযৌক্তিক সেবায় বহু লোকের মধ্যে লেখা ছিল একজন বড় সমঝদার।

একদিন নিরঞ্জন যখন এলো তখন লেখার কাছে এসেছিল এক আত্মীয়স্থানীয় মেয়ের আত্মীয়। লেখা তাকে ব'লছিল সে যেতে পারবে না, খোকা হয় তো সারারাত থাকতে হবে, বাবাকে ফেলে সে থাকতে পারবে না।

নিরঞ্জন অমনি ব'লে, "যাও না লেখাদি, আমি থাকবো 'খন তোমার বাবার কাছে।"

এর পর নিরঞ্জন আপনি এসে সুপ্রকাশবাবুর শয্যাপার্শ্বে স্থায়ী স্থান ক'রে নিয়ে। কি দিনে কি রাতে যখন দরকার তখনি সে হাজির হয়েছে।

সুপ্রকাশ তাকে প্রথমে বড় সুচক্ষে দেখতে পারেন নি। মূর্তিগতিকে তার চেহারাটা এমন নয় যে দেখলেই তার উপর প্রীতি উথলে উঠতে পারে। তার দেহ সুগঠিত, কিন্তু তার রঙের উপর কালো কষ্টি যথাসম্ভব কুৎসিত কালো মুখ। কিন্তু শুধু সেই জন্যই সুপ্রকাশ বিরূপ হন নি। অসহায় হয়ে শুয়ে থেকে তিনি যখন লেখার জন্য লেখার প্রতীক্ষা ক'রতেন তখন লেখা না এসে সামনে দাঁড়াতো নিরঞ্জন। অমনি মুখ বিকৃত হ'য়ে উঠতো। তাই তিনি নিরঞ্জনের যাতের, অল্পটুকু ছেলেও বিরক্ত বোধ করতেন।

কিন্তু দিনের পর দিন অক্লান্ত ও নিপুণ সেবায় নিরঞ্জন বন্ধুকে শেষে বশ ক'রে ফেললে। সুপ্রকাশের মৃত্যুর সে হ'য়ে গেল একটা অপরিহার্য অঙ্গ—ওষুধের বাক্স, বাজার সরকার বল, নার্স বল, ইলেক্ট্রিশিয়ান বল, সব একাধারে নিরঞ্জন।

সুপ্রকাশ যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তখন নিরঞ্জনই তাকে ধ'রে বসিয়ে রেখেছিল।

সুপ্রভাস মারা যাবার পর নিরঞ্জন হ'য়ে উঠলো অসহ্য। লেখা শোকে অধীর, নিরঞ্জন তার হ'য়ে সব কাজ ক'রে চল্লো, আর লেখাকেও যাতনা দিয়ে যেন ভ'রে খাড়া ক'রলো।

সুপ্রভার বড়দাদা পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ ক'রতে এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিলেন বড়বৌদি। সুপ্রভার সঙ্গে তাঁরা একবার কয়েক দিনের জন্য এসেছিলেন, বউদিদি আসেন নি।

সুপ্রভার সঙ্গে পরিবারের কারও যেন সম্বন্ধ ছিল না। শ্বশুরের প্রতিও তার বিশেষ প্রীতি ছিল না, শাশুড়ীকে তিনি যথোচিত অবজ্ঞা ক'রতেন। সুপ্রভা লেখাকে জন্মাতে দেখেছেন—বাড়ীর বড়বউ তিনি, তার উপর তাঁর স্বামী বড় চাকরে, তাই তিনি সবার উপর প্রভুত্ব ক'রতেন আর খরধার ওষ্ঠের আঘাতে সকলকে নিরন্তর জর্জর ক'রতেন। সুপ্রভার বচনপ্রভায় বাড়ীর কেউ তাকে রুখে দেখতে পারতো না, শুধু ভয়ে ভয়ে সবাই তাকে মেনে চ'লতো।

১দিন না যেতেই বোঝা গেল যে সুপ্রভা যে এতদিন পর শ্বশুরবাড়ী এসেছেন সে তাঁর পারলৌকিক মঙ্গলের চেষ্টায় নয়—এসেছেন শ্বশুরের বাড়ীখানা দখল ক'রতে।

শ্রাদ্ধের পর দিনই সুপ্রভা লেখাকে এই মিষ্টসম্ভাষণ জানালেন :

"তোরা তো খেলেন, এখন তুই কি ক'রবি? বিয়ে থা ক'রবি না এমনি বিধবা হ'য়ে থাকবি?"

লেখা ব'লে, "বিয়ে আমি ক'রবো না। যা করছি তাই ক'রবো।"

"তা জানি, তা থাকবি কোথায়? কার কাছে!"

"কার কাছে আবার থাকবো? এখানেই থাকবো যেমন আছি।"

সুপ্রভা হাসি চেপে মন্তব্য করেন, "এ বাড়ী তো আমাদের নয় যে এমনি থাকলেই হ'ল। বাড়ী এখন তোর ভাসুরের। যদি তুই বিয়ে থা ক'রতিস তবে না হয় যদিন না বিয়ে হয় থাকতে পারতিস। তা যখন করিস নে তখন চিরকাল তো আর তোকে বাড়ী ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

এই বাড়ী—তার পিতার স্নেহস্মৃতিপূত গৃহ—এতে তার কোনও অধিকার নেই, একথা এমনি রূঢ়ভাবে উচ্চারিত হ'তে লেখার দুই চক্ষু জলে ভরে উঠলো। অপ্রিয়ভাষিণী ভাতৃবধূর দিকে দৃষ্টি তুলে একবার চেয়ে সে ব'লে, "তা বউদি, তোমরা তো এখন এবাড়ীতে বাস করবে না।"

"না করি, ভাড়া দেব—খরচটা তো রাখতে হ'বে। ভাড়া দিলে ১০০৲ টাকা মাসে পাওয়া যাবে।"

লেখা ব'লে, "তা বেশ আমি ১০০৲ টাকা ভাড়াই তোমাদের দেবো।"

লেখাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভরে হেসে সুপ্রভা তখন লেখার মাথে একটা শেষ ছোবল বসিয়ে দিলেন। তারপর তিনি চ'লে গেলেন।

সুপ্রভা যতদিন ছিলেন ততদিন নিরঞ্জন বাপমায়ের পা টাকা দিয়ে ছিল। তিনি চলে' যাইলো।

সুপ্রভা যে কথা ব'লেছেন তা শুনে নিরঞ্জন ক্ষেপে উঠলো। সে ব'লে, "কেন লেখাদি, তুমি ওর কথা শুনে মাঝ করছিলে গেলে। না হয় যেতেই উঠে এখান থেকে। এমন বাড়ী গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যেতো।"

"কিন্তু সে সব বাড়ীতে তো বাবার স্মৃতি নেই," ব'লতে লেখার চক্ষু জলে ভ'রে উঠলো। তারপর সে ব'লে, "তা হোক, শুধু অধিকার যখন নেই তখন এ বাড়া ছেড়ে যেতে হবেই একদিন, একটা ভাল বাড়ী খুঁজে রেখ।"

লেখার এখন বেশ পশার, টাকা পয়সার অভাব নেই তার, তাই নিরঞ্জন কয়েকদিন ঘোরাঘুরি ক'রে এসে ব'লে, "বাড়ী ভাড়া ক'রে কি হবে? একটা জমী কিনে ফেল, আস্তে আস্তে বাড়ী করা যাবে তাতে। এখনি তো আর তোমায় এখান থেকে উঠতে হ'চ্ছে না।"

সেই যুক্তিই স্থির হ'ল। জমী কেনা হ'ল বাড়ীও আরম্ভ হ'য়ে গেল। নিরঞ্জনের আর বাধুনির অভাব নেই এখন—বাড়ী তৈরীর তদারক করে সে।

ইতিমধ্যে লেখা একটা স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত গেল।

বিলেত থেকে বড় বড় ডিগ্রোমা নিয়ে আর নানা ইউরোপের বড় বড় হাসপাতালে কিছুকাল কাটিয়ে যখন লেখা ফিরে এলো তখন তার বাড়ী শেষ হ'য়ে গেছে। নিরঞ্জন তাকে নিয়ে তুললে সেই নতুন বাড়ীতে। দক্ষিণ কলিকাতায় ফাঁকা জায়গায় বাড়ী, বেশ খানিকটা কম্পাউণ্ড আছে আর বাড়ীতে আধুনিক যত কিছু সুযোগের ব্যবস্থা হ'তে পারে সব আছে।

বিলেত থেকে যখন লেখা ফিরে এলো তখন তার মাথা ভোরাই হ'য়ে ছিল টাটকা নূতন নূতন আইডিয়ায়। ইংলণ্ড আর জার্মানী অষ্ট্রিয়ার নানা হাসপাতালে সে যে সব জিনিস দেখে এসেছে, নূতন নূতন চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ব্যবস্থা যা দেখেছে, এখানে একটা আধুনিক ক্লিনিক ক'রে তেমনি সব ব্যবস্থা করবার জন্য সে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো—আর সেই সঙ্গে আধুনিক প্রক্রিয়ায় ক্যানসার প্রভৃতি দুরূহ ব্যাধির চিকিৎসা নিয়ে রিসার্চ করবার কল্পনাও নিয়ে এলো।

কিছুদিন ক'লকাতার বড় বড় ডাক্তারের কাছে ঘোরাঘুরি ক'রতে তার উৎসাহ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসলো। এঁদের কেউ কেউ তাকে মৌখিক উৎসাহ দিলেন প্রচুর, কিন্তু কাজে কিছুই ক'রলেন না। আর কেউ কেউ তার এই নবীন উৎসাহকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

এতে নিরাশায় হ'লেও লেখা একেবারে আশা ছেড়ে দিলে না। আরো একটা হাসপাতালের কাজ নিয়ে সে স্থির ক'রলে কিছুদিন বাদে পসারটা একটু জমিয়ে নিয়ে আবার তার এই সব পরিকল্পনার হাত দেবে।

কিন্তু এ কাজে তরুর বাবা এসে উপস্থিত হ'লে চিকিৎসার তার অপূর্ব সফলতা হ'তো। তার পসার এত দ্রুত ক'রে বেড়ে গেল যে বিশ্রাম নেবার অবসর সে পেলে না।

এমনি ক'রে বছরের পর বছর কেটে গেল। টাকা আসতে লাগলো বন্যার স্রোতের মত। অর্থাগমের প্রাচুর্যে তার প্রকৃতি বিলাসিতা হ'য়ে উঠল যে তার সন্ধানিত গবেষণার অবসর লুপ্ত হ'য়ে গেল তা সে টেরও পেলে না। তার স্ত্রী ও তার সন্তানের নিয়েই সে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হ'য়ে রইল।

এত বড় পসার সত্ত্বেও, তার ঘর দুয়ারের খবর রাখা কেনা কাটা প্রভৃতি খুঁটিনাটির খোঁজ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হ'ত না মোটেই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নিরঞ্জন এসে হাজির হ'য়েছিল সে বিলেত থেকে ফিরেই আর সেই থেকেই সে তার অবৈতনিক সেক্রেটারিয়েটে ভর্তি হ'য়ে গিয়েছিল। সে এখন সেন সৌষ্ঠবের সঙ্গে সংসার সব কাজ চালাতে আরম্ভ ক'রতে লাগলো আর লেখার উপযোগিতার সম্বন্ধের সদ্ব্যবহার ক'রতে লাগলো যে লেখার জীবন কিসে কেমন চলেছে তার সঠিক আন্দাজ সে সহজে পেতে লাগলো।

তার পসার করবার দশ বছরের মধ্যে তার বাড়ী হ'য়ে গেল বিচিত্র প্রাসাদ। বাড়ী বাড়ী মটর হ'ল তার, সাজাতে রোগী দেখবার আয়োজন হ'ল বিরাট—একটা আধুনিক ক্লিনিকের কল্পনা যে অনেকটা তার ভিতর করে নেওয়া।

(৮)

একদিন লেখা প'ড়ছিল একখানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। তাতে atomic energy সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প'ড়ে তার মনোযোগ বেশী গেল।

[illegible] আণবিক শক্তি নিষ্কাশনের ইতিহাস ও প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আছে।

[illegible] ও তার স্বামী অধিকারের নাম প'ড়ে তার চোখ জ্বলে গেল। পাছে পর্যায়ক্রমে গবেষকদের নাম [illegible] এক এক দিন উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন যে এঁদের গবেষণার ফলে রিয়াক্টর সাইক্লোট্রোনের মত যন্ত্র [illegible] থেকে শক্তি নিষ্কাশনের সম্ভাবনা অনেক দূর এগিয়েছে।

প্রবন্ধ প'ড়ে লেখা গম্ভীর হ'য়ে গেল।

তার মনে প'ড়লো যে যুথীতির সঙ্গে কথা ছিল দশ বৎসর পরে পরস্পরের কীর্তির তুলনা করে দেখা যাবে এঁদের কে জেতে। সে দশ বৎসর চ'লে গেছে কিছু দিন আগে—লেখা প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রলে, সে পরাজিত। সে ডাক্তারীতে প্রচুর পসার ক'রেছে, রোজগার ক'রছে অনেক টাকা, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা তাদের ছিল তা রক্ষা করবার কিছুই করে নি সে—গবেষণা ক'রে মানবী জাতির একটা গৌরব প্রতিষ্ঠার কোনও চেষ্টা বা আয়োজনই [illegible] সে—যুথীতি ক'রেছে।

সেদিন এম বিদায় নেবে এসেছিল সে অনেক কল্পনা নিয়ে। সে-কল্পনা সে কাজে পরিণত ক'রতে পারে নি পরিবেশের প্রতিকূলতায়—মেধাবীর নূতন কিছু ক'রবার উদ্যমের পরিচয়। কিন্তু এ কথা সে স্বীকার করে পারলে না যে সে বিশেষভাবে এই করবার মতোই যা কিছু [illegible] তার সত্তাবার কারণও

কোনও চেষ্টা যে সে করে নি তার কারণ তার নিজেরই বিশ্বাস। ব্যবসায়ে সমস্তার সঙ্গে টাকা রোজগারের নেশায় বিভোর হ'য়ে ভুলে গিয়েছিলো সে তার সেই স্বপ্ন, মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল তার আবেশের প্রেরণা।

সংবাদটা জেনে প্রথমে তার হ'য়েছিল দারুণ আঘাত, সুপ্রিয়া—সে নামে তার উপর টেকা দিয়ে হ'য়েছিল আক্রোশ নিয়তির উপর, দেশবীণার উপর, সমগ্র পরিবেশের উপর। কিন্তু সেই সব-জ্বালা সব আক্রোশ মুহূর্তে ভূমিসাৎ করে এলো দীনতা বোধ, লজ্জা। নিজের কাছে তার স্বীকার ক'রতেই হ'ল যে সে পরাজিত—আর সে পরাজয় ঢাকবার কোনও অজুহাতই নেই তার।

তাহলে সে, এখনও তো সময় আছে তার! এখন তার অর্থ আছে প্রতিষ্ঠা আছে, আর শক্তিও আছে। মাত্র ফিফটিফিফ বছর বয়সেই তার হাল ছেড়ে দেবার কোন হেতুই নেই। সে স্থির ক'রলে এখনও সে ফিরে যাবে তার পরিত্যক্ত পথে। চিকিৎসার কাজ যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ক'রে একমনে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা। তার বাড়ীতেই একটা পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ক'রবে, হাসপাতালের যে কয়টি রোগিনী আসে তাদের, নিয়ে ক'রবে নূতন নূতন পরীক্ষা!

তখনি নিরঞ্জনকে ডেকে সে আদেশ দিলে পরীক্ষাগারের আসবাব কেনবার, পরামর্শ ক'রলে বাড়ীর কোন্ অংশ কি ভাবে বদলে পরীক্ষাগার করা হবে আর এই বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কাগজে যা কিছু প্রকাশিত হ'য়েছে সে সব সংগ্রহ ক'রতে পাঠাল।

সেই দিন রোগীদের দেখে ফিরতে তার বেলা দুটো হ'য়ে গেল।

বাড়ী ফিরবার পথে প'ড়লো সুপ্রীতির বাড়ী। গাড়ী থামিয়ে সে নামলে

সুপ্রীতির বাড়ীখানা ছোট; কোনও বাড়াবাড়ি সম্পদের চিহ্ন সেখানে নেই। কিন্তু বাড়ীখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আসবাব অল্প দাম কিন্তু সুন্দর ও সুবিন্যস্ত।

সেখা ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলো সুপ্রীতি ব'সে তার একটি ছেলে ও মেয়েকে পড়াচ্ছে। ছেলের বয়স আট ও মেয়েটির ছয় বৎসর। দুইটুটি সুন্দর দুটি ছেলে মেয়ে, আর তাদের সাদৃশ্যের উপর, রাঙাটকা পরিয়েছে তাদের প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ। একাগ্র চিত্ত আগ্রহের সহিত সুপ্রীতি তাদের দিচ্ছে ইংরাজী ও অঙ্কের প্রাথমিক শিক্ষা। কে ব'লবে যে এই ঘরোয়া মাষ্টার বিদুষী খ্যাতি হ'য়েছে বিশ্বব্যাপী!

সেখা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলে এই মনোজ্ঞ দৃশ্য, তার পর সে ডাকলে, "সুপ্রীতি!"

সুপ্রীতি চমকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে, "ও মা! কি ভাগ্যি আমার! তোকে পরশু থেকে লোকে খোঁজ পায় না তুনি, তুই আসনি এসেছিস আমার বাড়ী। আমি তোকে কী ব'লবো ভেবে পাচ্ছি না।"

সেখা হেসে ব'ল্লে, "তোর প্রথম কাজ হ'চ্ছে তোর এই ছোট সংস্করণ দুটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া।"

সুপ্রীতি ব'ল্লে, "ওরে মিনা, প্রণাম কর। এ তোদের সেখা মাসিমা।"

দু'জনে সলজ্জিত হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাকে প্রণাম ক'রলে। সেখা তাদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বন ক'রলে। একটা অপূর্ব পুলকের আবেশ তার চিত্ত।

মন্টু ছেলে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "তুমি কেন আমাকে ?"

সে ঘাড় নেড়ে ব'লে, "খু-উ-ব। মার কাছে খুব শুনেছি আপনার কথা।"

"ও মা, তাই না কি ? কী শুনেছ বল তো।"

"কত ? আপনি মার সঙ্গে প'ড়তেন—কেবলি সব পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'তেন। আপনি কত বড় ডাক্তার হ'য়েছেন। আপনি ভারী বিদ্বান আর ভারী ভাল—"

লেখা একবার ভেবেছিল যে সুপ্রীতি জীবনে তার আকাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ ক'রে হয় তো তাকে ভুলে গেছে বা ভুল ক'রে তার সঙ্গে দেখা করে নি। কিন্তু তাদের বা অন্যের করা দূরে থাকুক সে যে এমনি মনোভাবে তাকে স্মরণ ক'রেছে তা দেখে সুপ্রীতির প্রতি তার প্রীতি উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো।

লেখার তখনও খাওয়া হয় নি শুনে সুপ্রীতি ব'ললে তাকে খেয়ে যেতে হবে। আর দেখতে দেখতে সে তার সামনে গরম গরম ভাল ভাত আর নানা রকম তরকারী সাজিয়ে দিলে।

আয়োজন দেখে লেখা বল্লে, "হাঁ রে তোরা কি atomic energy দিয়ে রান্না করিস নাকি ? এত সব দেখি কোথায় ?"

"আমি তো এক বেলা-চাঁদি, আমার খাবার থাকে টিন বাক্সের একটা ঘর ক'রেছেন উনি তাতে। তাই তোকে দিলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর লেখা ব'লে, "মনে আছে তোর দশ বছর পর note compare করবার কথা ছিল। তা কই তুই গেলি না তো কোনও দিন।"

সুপ্রীতি ব'লে, "কী বলবি বল ? তুই-যদি অত বড় ডাক্তার। তোর দেখা পাওয়াই ভাগ্যের কথা। আর [illegible] দুনিয়ী। না গিয়েই যে বেঁচে আছি তাই।"

[illegible] একটা চোক গিলে লেখা বল্লে, "ছাড় ভাই, সেকথা। আমি যেন কিছু জানি না। তুই atomic [illegible] বিজ্ঞানাচার্য্য তোর খোঁজ তুমি দিয়েছিস আর আমি তুচ্ছ ডাক্তার। তাই বুঝি আমাকে মনে [illegible] দিস।"

সুপ্রীতি ব'লে, "সে ভাই বড় দুঃখের কথা। ওইটে যদি আমরা কায়েম রাখতে পারতাম তবে সত্যি বড়-[illegible] হ'তাম। আমরা যে প্রক্রিয়াটা বের ক'রলাম সেই-টা কাজে লাগাবার জন্য একটা বড়ের কারখানা নিয়ে [illegible] আর্থাভাবে খুলেছি ; এ দিকে সেই প্রক্রিয়ার আর একটু উন্নতি ক'রে, একজন আমেরিকান একটা [illegible] ক'রে পেটেন্ট ক'রেছে। বড়লোক হ'লে সেই, আমরা যেখানকার সেইখানেই র'য়ে গেলাম।"

লেখা বল্লে, "সে হোক, টাকা না হয় বাইপেরেছিস, তবু একটা বড় কিছু তো জগৎকে দিতে পেরেছিস। টাকার তো শুধু মন্দ করবার শক্তি আছে।"

"আরে, আর মেশের পরে [illegible] দেশ সাজিয়ে মানুষকে প্রাণদিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার কি ! আর টাকা, তোকে তো দুজন করবার দিলাম।"

লেখা ব'লে, "ছাই টাকা। টাকা তো আমি চাই নে, আমি যা চেয়েছিলাম তা তুই পেয়েছিস।" তার বড় বড় দৃষ্টিতে মস্ত বিস্ময় নিয়ে হেসে ব'লে, "কিন্তু এই atom-এর পেছনে তোর বড়ই বড় লোক বাবসন্ধির কিনটে এই বুদ্ধি কল যে বের ক'রেছিল এর জোড়া নেই।"

সুপ্রীতির চোখ তার সন্তানের প্রশংসায় উৎফুল্ল ক'রে উঠলো।

অনেকক্ষণ পর সন্ধের পর লেখা ব'লে, "এখন যাই ভাই।"

"ওমা, সে কি? মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারবি নে—তিনি এলেন ব'লে।"

লেখা বলে, "মাষ্টারমশায়, কে তিনি?"

যেন সুপ্রীতি ব'লে, "বুঝতে পারলি নে? এই ডাকাতটার বাপ," ব'লে কটুর গাল ধ'রে টিপে দিলে। "তিনি যে আমার মাষ্টারমশায় ছিলেন আর এখনও আছেন।"

মাষ্টারমশায়—অনিমেষ—ইউনিভার্সিটির প্রফেসার। সুপ্রীতি কোনও চাকরী করেনা, কিন্তু অবসর মত স্বামীর প্যাথলেটারীতে রিসার্চ ক'রে থাকে।

লেখা ব'লে, "থাকতে পারি, এক সর্তে", ব'লে কটুর মিনতি দিয়ে [illegible]

"কি সর্ত?"

"যদি যাবার সময় ওদের সঙ্গে নিতে দিস। আবার সন্ধ্যেবেলায় ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"আচ্ছা তা যাস," ব'লে সে ছেলে মেয়ের দিকে চেয়ে ব'লে, "কি বলিস ডাকাত, যাবি?"

দুজনেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। এই দাসীটিকে তাদের বড় ভাল লেগেছিল।

অনিমেষ এলে চা খেতে খেতে আলাপ হ'ল। তিনি সুপ্রিয়ার মাষ্টার ছিলেন কিন্তু লেখাকে কখনও পড়ান নি, তাই লেখাকে তিনি যথেষ্ট সমীহ ক'রে কথা কইলেন। লেখার বড় লোক যে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে তাতে তাঁর কৃতার্থতা বাক্যে ও ব্যবহারে পদে পদে ফুটে উঠলো।

লেখা ব'লে, "ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র ছিলেন আত্মবিস্মৃত, আপনারা দুজনেও দেখছি তেমনি। আপনাদের যে জগৎজোড়া খ্যাতি তা যেন আপনারা জানেনই না।"

অনিমেষ চায়ের পাটাতে চুমুক দিতে দিতে সুপ্রিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে লেখার মুখ থেকে নাদিয়ে বলেন, "খ্যাতি ট্যাতি যা বলুন সব ওঁর পাওনা। সব কাজটাই ক'রেছেন উনি, আমি শুধু ওঁকে বাধা দিয়েছি ব'লে উনি জোর ক'রে লেখাটায় আমার নাম জুড়ে দিয়েছেন।"

কপট ক্রোধের দৃষ্টি হেনে সুপ্রীতি ব'লে, "ইস্, ভারী বিনয়। তুই তার এক কথায় বিশ্বাস করিস না লেখা। লোকটি ভারী ঠগ, ওকে দিয়ে ক'রে ঘাড়াতে একেবারে পক্ষ দুখ।"

অনিমেষ ব'লে, "আমি ঠগ—নারীজাতী তো অবশ্যই। আমার কি মনে হয় জানো লেখা দেবী?"

লেখা হেসে ব'লে, "আপনারা দুজনেই।" সবাই হেসে উঠলো।

হাসলে লেখা, কিন্তু এরের মুখই আনন্দ কণহ, এরের জীবনের আর্থ, সৃষ্টি যে আনন্দের উৎসব লাগান আছে তার পরিচয় লেখার বুক ঠেলে টেনে বের করলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস।

তার মনে হ'ল, সুপ্রীতির কাছে সে [illegible] হেরে যায় নি, সব দিক দিয়েই হেরেছে। জীবনে সে যা হ'তে পারতো তাই যেন এসে জিতে মূর্তিমান হ'য়ে তাকে ক'রলে ভিখারী।

এলোমেলো ছবিখানি এর পাশে মনের কোথায় মেশে উঠলো।

(৯)

মণ্টু ও মিনিকে নিয়ে লেখা যখন উঠলো তখন সে বাড়ী গেল না, গেল দোকানে। সেখান থেকে তাদের জন্য খাবারের বই খেলনা জামা প্রভৃতি কিনে বাড়ী ফিরলো।

বাড়ী ফিরে দেখলে নিরঞ্জন যেন ছট্ ফট্ ক'রছে।—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ লেখাদি?" সে ব'ল্লে।

লেখা ছেলে মেয়ে দুটিকে দেখিয়ে ব'ল্লে, "এদের বাড়ী গিয়াছিলাম" ব'লে তাদের পরিচয় দিলে।

নিরঞ্জনের কোনও সে কথা কানে গেল না। সে ব'ল্লে, "আমার একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, বড় তাড়া। যাব আমি?"

লেখা ব'ল্লে, "যাও—কিন্তু তাড়াটা কিসের?"

"আমি আসছি ফিরে, মানে লেখাদি ডেকে পাঠিয়েছেন, তুমি আসবে ব'লে এতক্ষণ ব'সে আছি।"

লেখা একটুখানি ভেবে ব'ল্লে, "যাও।" তার মনে হ'ল নিরঞ্জনের যেন বাইরে যাবার দরকার বড় [illegible] হ'য়ে।

নিরঞ্জন বেরিয়ে গেল, লেখার ছোট সাড়ীখানা বের ক'রে নিজে চালিয়ে।

নিরঞ্জন লেখার সব কাজের কাজী। সে মাইনে পায় না কিছু, কিন্তু লেখার অনেক টাকা তার হাত দিয়ে যায় আসে। তাতে কিছু কিছু আটকে থাকে। তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া বেশ ভূষা সবই চলে লেখার খরচায়। তার ভূষার খরচ ইদানিং বেশ বেড়ে গিয়েছিল এবং সব সময়ে তা কেনবার অর্থ সে লেখার কাছে [illegible] পেত না। আর, একখানা মোটর তো সে কখন খুসী নিয়ে বের হ'য়ে যেতো, তার জন্যও লেখার কাছে গাড়ি চাওয়ার অভ্যাস সে ছেড়ে দিয়েছিল।

তার এতটা বাড়াবাড়ি লেখার ভাল লাগতো না কিন্তু তাকে কিছু বলতে সে পারতো না।

লেখার কাছে কয়েকজন লোক এসেছিল, তাই সে ছেলে মেয়ে দুটিকে নূতন খেলনা দিয়ে তার নিজের জিম্মায় দিয়ে সে ঐ লোকদের সঙ্গে কথা কইতে গেল। খুব নীচু তলার বিদায় দিয়ে সে ছেলে মেয়ে দুখানির খেয়ালিপুল ক'রে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলো।

বাড়ী-ফিরে এসে তার মনে হ'ল সারা বাড়ীটা যেন একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় ভরে' গেছে। বাড়ীতে সব সময়ই থাকে, নিরজনও প্রায় থাকে না, কিন্তু আজ মনে হ'ল বাড়ীটা যেন শূন্য।

একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে সে ভাবতে লাগলো। কেবলই মনে হ'ল, প্রবোধকে যদি সে বিয়ে ক'রতো তবে এত দিন তার বয়স আরো হ'ত, মুখর হ'য়ে উঠতো বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েতে। এমন শূন্য ব্যর্থ মনে হোত না তার জীবন। যে বিশ্রী মুহূর্তে সে তার সেই অযাচিত সৌভাগ্য প্রত্যাখ্যান ক'রেছিল তখনো তার সম্ভাবনা লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। আর হ'তই যদি তার পক্ষে সফল কীই বা হ'ত তাতে। সুপ্রীতি তো সে সফলতা অর্জন ক'রেছে কিন্তু তার সে সৌভাগ্য কি বটু বিহুর চেয়ে বড়? সেবা তো সেখানেই এলো সুপ্রীতি তা মনেও ভাবে না।

এমন সৌভাগ্য সে পায় ঠেলেছে। তাই আজ আটত্রিশ বছর বয়সে তার প্রাণ হাহাকার ক'রছে—কেউ নেই তার! সুখ দুঃখের কোনও ভাগী নেই, অভিমানের মত মধুর সঙ্গে সুখের ঝগড়া ক'রবার লোক নেই—একটা ভাঁড়ো ছেলেও নেই।

আটত্রিশ বছর। সেদিনকার সে ভুল সংশোধন হবার আর উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে সে উঠে গেল তার আয়নার কাছে। আয়নাতে তার মুখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস পেলো। আটত্রিশ বছরেই তার যৌবনশ্রী ম্লান হ'য়ে গেছে। ঠোঁটের দুপাশে স্পষ্ট রেখা পড়তে সুরু ক'রেছে, কানের পাশ দু' একটা পাকা চুলের রেখা দেখা যাচ্ছে। সেদিন সে যৌবন যা প্রেমে পুরুষকে সার্থক ক'রে দিতে পারতো তার জীবন সুপ্রীতির মত।

টেবিলের উপর এক পাশে বইয়ের উপর তার দৃষ্টি পড়লো। প্রফেসার হিসাবে আসতে যাবার মুখে এই সব বই তার আদেশে নিরজন এনে রেখেছে। আলস্যভরে একখানা একখানা ক'রে বইগুলো টেনে দেখতে লাগলো। তার পর ঠেলে ফেলে দিলে সব।

কী হবে এ সবে? কী হবে রিসার্চ ক'রে? আর জীবনে তৃপ্তি আর হবে না কোনও দিন।

আবার বই টেনে নিল, তাহলে এই কাজই সে ক'রবে। এটাই তার বাঁচবার একমাত্র অবশিষ্ট উপায়।

সঙ্গে সঙ্গে তার ইচ্ছার অবোচরে তার মনে প্রশ্ন উঠলো, প্রয়োজন কী? কে পড়বে সে কি একেবারেই গেল? আর কি সে বিয়ে করবে না? বেঁচে আছে কি সে? থাকে যদি হয় তো কোন সুখী হোক। কোন বিদেশিনীকে বিয়ে ক'রে বিলিতি সংসার ক'রছে। না হয় তো! হয় তো সে মরেই গেছে।

কল্পনাকে একটু আড়া দিয়ে ভুলে সে ভাবলে মৃত হোক সে। প্রয়োজন থাকলেই বা কী? বারো বছর আগে নবযৌবনাগমে যে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিল হ'লেও কি আজ তাকে মনে পড়বে, ভাবতে পারে কখনও এই দুটী মেয়েকে বিয়ে ক'রবার কথা!

অতঃপর যা হোক! সে বিসাটই ক'রবে—আর চিন্তা তার ব্যবস্থা ক'রবে। বইগুলো গুছিয়ে আবার নাড়া চাড়া ক'রতে লাগলো।

সেদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখলে—প্রদোষ এসেছে। প্রদোষই সে কিন্তু যেমন সে ছিল তেমন নয়। তার গায়ের রঙ ঠিক ছাইয়ের মত চাকচা পড়তে শুরু করলো—মাড়িগুলা ঠিক যেন চড়াবার আগে কুমারের গড়া মাটির মত। হঠাৎ লেখার মনে হ'ল এ ভীষণ প্রদোষ নয়—ম'রে গিয়ে তার শুকনো ঘুমির মত দেহ নিয়ে—এসেছে লেখার কাছে। লেখার সামনে এসে সেই কাঠের মত শুকনো আঙুলের ইসারায় লেখাকে ডেকে ঘরে ঢুকে গেল। দাঁড়াবার দাঁড়িয়ে লেখা ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো, সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠলো। ঘরে ঢুকতে তার পা উঠলো না।

ঘুম ভেঙেও সে কাঁপতে লাগলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল। আকণ্ঠভরে জল খেয়ে কথঞ্চিৎ সুস্থ হ'য়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে—পাঁচটা। অন্ধকারের ঘোর তখনও ছাড়ে নি তবু রাত শেষ হ'য়ে গেছে আর শোবার দরকার নেই ভেবে লেখা যেন বাঁচলো।

একটু পরে এক্কাওয়ালী ডাকলো। পথে বাজারের তরকারীর বোঝা নিয়ে গরুর গাড়ী কাঁচর কাঁচর ক'রে চলেছে। এক ঝাঁকুনে প্রদোষের স্বপ্নও ভাঙলো। তারপর শুনতে পেলো তার চাকর উমানি বরাবর কাকে ডাকছে।

পাঁচুর ডাকের এই সাড়ার আশায় হ'য়ে লেখা উঠে মুখ হাত ধুয়ে পান ক'রতে গেল।

স্বপ্ন যে শুধু স্বপ্ন—মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া তা লেখা জানে। মানুষ মরলে আর তার কিছু থাকে না তা লেখা জানে। তবু প্রদোষের সেই শবের ছবি স্মরণ ক'রে বার বার তার দেহ শিউরে উঠতে লাগলো।

[illegible] হাসপাতালে গেল, কিন্তু যাবার সময় নিরঞ্জনকে সে [illegible] বিশেষ করে বলে গেল "তুমি একবার প্রদোষবাবুর বাড়ী গিয়ে খবর নিয়ে এসো তিনি কোথায় আছেন, [illegible] ফিরবার সময়।"

গাড়ীতে যেতে যেতে সে নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রলো, কেন? স্নেহের আশায়?

নিজের মনের উপরই সে চটে গেল।

(৯০)

হাসপাতাল থেকে ফেরবার পথে লেখা গেল সুধীতির বাড়ী, এবারও সই মিত্তির অফিসে। সুধীতি বা তার ছেলে মেয়ে বাড়ী ছিল না। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় নিরঞ্জনের কাছে এলো—খবর। সে বলে, "সই মিত্তির বলেন সন্ধ্যে তাঁর বাসাবাড়ী যেতে।

অনেকক্ষণ হ'লে সুপ্রীতি গল্প সাঙ্গ ক'রলে। মায়ের সমস্ত মন হ'লে, "তুই ওকে ওদের অত দামী দামী প্রেজেন্ট ফিরিয়ে দিলি কেন?"

লেখা বল্লে, "বেশ ক'রেছি, মা। তাতে তো ওর মাসে একশো টাকার বেশী নয়।"

"একশো টাকা তোর কাছে কিছুই নয়, কিন্তু গরীবের ছেলে মেয়ের পক্ষে বড্ড বেশী। এমনি সব জিনিষ পেলে ওদের বাড় খারাপ হ'য়ে যাবে তখন আর পোষাকের সামান্য জিনিষে ওদের মন উঠবে না। সখী তাই ওদের ভুল ক'রে ওদের ভুল দিস নে।"

সুপ্রীতি চ'লে গেলে লেখা নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, এই হবে কথা। এই জন্যই এরা ইচ্ছা করে ছেলে মেয়ে দুটীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। হায় রে! পরের ছেলে, তাকে প্রাণভরে ভালবাসতেও—বাধা—অনুমতি চাই!

নিজের যে ছেলে সে পেলো না আর কখনও পাবে না তার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ও উদাস হতাশা তার মন আচ্ছন্ন ক'রলো।

নিরঞ্জন বাড়ী ছিল না, একা ব'সে লেখার প্রাণ আরও হাঁপিয়ে উঠলো—বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ ক'রে তাকে গিলতে আসছে মনে হ'ল।

বিরক্ত হ'য়ে উঠলো তার মনটা—কোথায় গেল নিরঞ্জন হতভাগা? মনে হ'ল কেমন যেন হ'য়ে নিরঞ্জন! এখানে থাকতেই চায় না, পালাতে পারলে বাঁচে। তবু তো লেখাকে না হ'লে চলে না তার—তার গাড়ী ছাড়া বাবু এক পা নড়তে পারেন না। স্থির ক'রলে আজ নিরঞ্জন এলে খুব একচোট বেড়ে নেবে লেখা।

নিরঞ্জন এলো যখন তখন রাত হ'য়ে গেছে, তখন সে কথা ব'লে তাকে বকবার কথা ভুলে গেল।

নিরঞ্জন গিয়েছিল প্রমোদের বাবার কাছে; ব'লে, "ও বাবা—সে বড় মানুষের মুখে পা!"

প্রমোদের বাপ নেই, মাইনে তার বড় দাদা। ভারী চটা মেজাজের লোক, প্রায় অগ্নিশর্মা হ'য়েই থাকেন। নিরঞ্জন যখন তাঁর কাছে গিয়েছিল তখন তিনি বিশেষ বিরক্ত হ'য়ে ছিলেন, কেন না একটা চাকর কি জিনিষ কিনতে গিয়ে চার পয়সা চুরি ক'রে ধরা প'ড়েছে। চাকরটা এবং তার পর বাড়ীর সমস্ত লোকের উপর সাধারণ ভাবে প্রচুর অনুযোগ ক'রলেন তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে—তাঁর কষ্টের রোজগারের টাকা, কি কষ্টে তিনি সংসার চালান তিনিই জানেন, অথচ বাড়ীর কারও গা নেই একটি পয়সা বাঁচিয়ে দিতে। সবাই এ-ব্যাটা চুরি করে তবু একেই পাঠান চাই জিনিষ আনতে। এদেরও আছে যেন এক একটা গাড়ী-ঘোড়া—দু-পা হেঁটে দু' আনার জিনিষ কিনে আনতে পারে না নবাব পুত্তুরেরা—পয়সা যদি বাঁচাতে হয় তবে তাদের নিজে যেতে হবে তাঁরই ইত্যাদি—

নিরঞ্জন চুপ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। যখন তার দিকে তাঁর চোখ দেবার সময় হ'ল তখন তিনি ঔদ্ধত্যে বিস্ময়ে ক'রলেন, "তুমি কি চাও হে ছোকরা?"

"আজ্ঞে, প্রমোদবাবু—"

"প্রদোষবাবু তো এখানে কি ? জান না আর দশ-বারো দিন দেশ ছাড়া। এত বড় একটা সম্পত্তি তা ফেলে তিনি উধাও হ'লেন আহারে চ'ড়ে—ন্যাড়া মাথাতে নাকি আছেন। ঘরে বাড়ি ঘেটে ঘেটে এই সবের ভার পড়য়াছে—বাবু হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

"তিনি কোথায় আছেন ? কবে ফিরবেন ?"

"আমি কি জানি ? জিগ্‌গেস কর গে তার ম্যানেজারের কাছে চিঠি লেখেন বাবু। সেই সাতমাস আগে হলদুদ থেকে একখানা পোষ্টকার্ড ছেড়েছেন আর পাত্তা নেই বাবুর। আমি কিছু জানি না। কিন্তু তুমি কে ? কি দরকার তোমার প্রদোষের সঙ্গে ?"

"মানে দরকার আমার নয়, খবর নিতে পাঠিয়েছেন তাঁ মেথা মিত্র।"

"ও: ! সেই হারামজাদা। কেন তাকে ন্যাজে খেলিয়ে বেশতাগী ক'রেও আশ মেটে নি, এখন ওরে ভরে আছেন, আবার এসে হয়।—আসবে না সে—যাও পালাও।"

নিরঞ্জন রণে ভঙ্গ দিয়ে দু পা' যেতেই তিনি খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, "তুমি কে, নামটা কি হে ?"

অনেক ভাবতে নিয়েছিল নিরঞ্জন, সে ব'লে, "কিছু নই না, তবে তাঁরাওখানে মানে তাঁর কাজকর্ম করি ; মুহুরি—"

"তুমি কি সেই ছোকরা যার কথা শুনেছি। তুমি সে বাড়ীতে থাক তার পয়সায় বাবুগিরি কর, তার ঘোটর চ'ড়ে সহর চ'ষে বেড়াও—বুঝেছি। তবু তুমিই তো আছ বাবু তার, আমার প্রদোষের উপর নজর রেখো।"

এসব কথা নিরুত্তরে বসে গেল লেখাকে, এবং দু'এক জায়গায় বেশ একটু হং চড়িয়ে ব'লে, সঙ্গে কথা শেষ ক'রে দিলে, "সে প্রদোষের সম্বন্ধে সে কথা বলেছেন, তাকে তুমিই ফিরে ক'রে দেল তোমার উচিত্তা ভাবনা নাই।"

লেখার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'লে, "বেটা শাকচুন্নি, ইচ্ছে হ'ছিল তার মুখটা ভেঙে দি।"

লেখা শান্ত ভাবে বলে, "দিলে না কেন।" ব'লে পূর্ববৎ ব'সে রইলো। তার পর নিরঞ্জন একটা কি বলতে যেতেই সে বলে, "যাও, এখানে দাঁড়িয়ে আর মর্যাদা হারাতে হবে না।"

নিরঞ্জন মুখ চুন ক'রে চ'লে গেল।

নিরঞ্জন যাওয়ার পর লেখা ভাবতে লাগল প্রদোষের কথা। সে বেঁচেই আছে, কিন্তু লেখার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে সে আগের মত ভালবাসে। মুহূর্তে লেখা তার মন-প্রাণ

না যাবে কেন? তারপর লেখা—তাবলে,

"বিদায় ক'রেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ডাকিলে তারে কিসের ছলে।"

মিছে কথা, নয়ন জলে সে বিদায় দেয় নি। যাবার সময় তার কী উল্লাস। লেখাকে না পেয়ে দুঃখ তো হয়ই নি হ'য়েছে মুক্তির আনন্দ।

প্রদোষের দাদা ভাবে, সুপ্রীতিও ভেবেছিল—এ তো সবাই ভাবে সেই প্রদোষকে দেশত্যাগী ক'রেছে। তার বদ কেউ তাকে ক্ষমা ক'রতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু হায়, আজ যদি তারা তার অন্তর দেখতে পেতো প্রদোষ যদি দেখতে পেতো, এতদিন পরে কি ব্যথায় টনটন ক'রছে তার মনটা।

এরা কিন্তু শুধু তার অতীতের সেই অপরাধ নিয়ে গাল দিয়ে খুসী নয়, তার বর্তমানকেও অম্লান বদনে কালিমা লিপ্ত ক'রতে কুণ্ঠিত নয়। নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে প্রদোষের দাদা যা ব'লেছেন তাতে তার সারা অঙ্গ জ্বলে গেল। এই সব হতভাগারা যে কোনও সম্ভ্রান্ত মেয়েকে সম্পূর্ণ বিনা হেতুতে এমনি কলঙ্কিত করে কি আনন্দ পায়? এই সব লোককে কুকুর দিয়ে খাওয়ান উচিত।

হতাশ হ'য়ে লেখা উঠে প'ড়ে লেগে গেল রিসার্চ নিয়ে। বাড়ীতে ল্যাবরেটারী ক'রে, বাপুরে রাজ্যের যন্ত্রপাতি পুষে সে তার পরীক্ষা চালাতে লাগলো। দিন নেই রাত নেই যখন সে একটু অবসর পায় তখনি সে পড়ে বা হয় তার লাবরেটারীতে কাজ করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনেকক্ষণ একটানা ল্যাবরেটারীতে কাজ ক'রে এসে লেখা ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে তার শোবার ঘরে ইজিচেয়ারের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়লো।

নিরঞ্জন পিছু পিছু ঘরে এসে প্রবেশ ক'রলে। সে আসতেই লেখা ব'লে, "আলোটা নিবিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দাও, চোখে লাগছে আলো।"

স্তিমিত আলোয় লেখা অনেকটা আরাম বোধ ক'রলে, কিন্তু বাইরে সিঁড়ির আলোটা তখন চোখে লাগতে, লেখা ব'লে, "ওই দরজাটা ভেজিয়ে দেও।"

নিরঞ্জনের বুকের ভিতর এতে নৃত্য জেগে গেল।

সে সাহস ক'রে এসে লেখার ইজিচেয়ারের হাতলের উপর ব'সে ব'লে, "লেখাদি, এমনি ক'রে শরীরটা খারাপ করা কি ভাল হচ্ছে?"

ক্লান্তস্বরে লেখা ব'লে, "কে ব'লে আমি শরীর খারাপ ক'রছি?"

"খেতে আর বসে কেন? শরীর আধখানা হ'য়ে গেল চোখে কালী প'ড়েছে, খাওয়া দাওয়া চুলোয় গেছে।" যেন আদরের সুরে স্নেহের অভিযোগ।

"তা ছাড়া," লেখা একখানা এলিয়ে পড়া হাত তুলে নিজের কোলের উপর রেখে ব'লে, "তা ছাড়া দিন রাত তুমি মন ভার ক'রে ব'সে থেকে কত ভাব তা কী বুঝতে পারি না আমি। কিন্তু—"

লেখা হেসে ব'লে, "আচ্ছা, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমায়।" তারও মুখে খুশি ছিল একটু তৃপ্তির আভাস চোখে ছিল স্নেহের ইঙ্গিত। ওই দুজনের হৃদয়ে সহানুভূতির এই ধারা সিঞ্চনে সে একটু তৃপ্তি বোধ ক'রছিল।

"আমি মাথা ঘামাব না তো কে ঘামাবে? তোমাকে দেখবার আর কে আছে? এমন ক'রে তোমাকে বশ হতে আমি দেব না।" ব'লে সে কস্ ক'রে লেখার চিবুক ধ'রে নেড়ে দিলে।

ঠোর ঠেলে ঠিক তখনি ঢুকে আলোর সুইচ টিপে ঘরে এসে দাঁড়ালেন—বড়বউদি, সুপ্রভা!

দুজনেই তফাৎ ক'রে উঠে দাঁড়াল। লেখার আঁচল গড়িয়ে প'ড়েছিল সে তা তুলে গায় দিলে।

ঠিক এই সময় এমনি অবস্থায় সুপ্রভাকে দেখে লেখা ও নিরঞ্জন দুজনেরই মেঘ কেটে উঠলো।

তীব্র অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে সুপ্রভা নিরঞ্জনকে ব'লেন, "তুমি কে হে?"

নিরঞ্জন মৃদু ব'লে, "আমি নিরঞ্জন।"

"তুমি নিরঞ্জন না প্রভঞ্জন না তার বেটা তা শুনতে চাই নে। তুমি এখানে কেন?"

দুর কথায় এর কোনও শোভন ব্যাখ্যা দেওয়া যে কোনও অবস্থায়ই অসম্ভব হ'তো—এখন তো তা সম্ভবই নয়। তাই নিরঞ্জন একটু ভেবে আরম্ভ ক'রলে, "আমি এখানেই থাকি, মানে লেখাদি'র কাছ কি—মানে—"

"মানে অতি সোজা, তার ব্যাখ্যা ক'রতে হবে না। কাজ কর তাই তার সন্ধ্যায় লেখার বেডরুমে ঢোর বন্ধ ক'রে আলো নিভিয়ে তার কোলের উপর ব'সে থাকি নাড়া দিতে হয়। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

নিরঞ্জন ও লেখা দুজনেই একটা কি ব'লতে যাচ্ছিল, সুপ্রভা ধমক দিয়ে ব'লেন, "তুমি বাইরে যাও না হতভাগা। তোমার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।"

একবার তাঁর দিকে, একবার লেখার দিকে বিষাক্ত ভাবে চেয়ে নিরঞ্জন মুখ লাল ক'রে গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

লেখা যে নিদারুণ সঙ্কোচ বোধ ক'রছিল, নিরঞ্জন চ'লে যেতে তাতে একটু স্বস্তি পেল। এই দুর্মুখ নারীর মুখ থেকে এখন যে সব বীভৎস কথা বের হবে তাতে তৃতীয় ব্যক্তি কাছে না থাকলে তবু একটু শান্তি আছে।

তখন লেখা ব'লতে চেষ্টা ক'রলে, "হি বউদি, কিছু জান না শোন না, না হ'ক মিথ্যে ক'রে—"

আর বলা হ'ল না। সুপ্রভার মুখনিঃসৃত অগ্নি প্রপাতের ধাক্কায় লেখার কণ্ঠ ভেসে গেল আর সে স্রোত চলতে আরম্ভ করলে বিচিত্র ভেঙ্গে। সে অপূর্ব বাগ্মীতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে সে বক্তৃতার মর্ম এমন দাঁড়ায়:

"আর আদিখ্যেতা লোকের কিই বা আছে, ওলেইহি থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত চিচকার প'ড়ে গেছে—অনেই তো এখানে ছুটে। এমন কাউকে তো দেখলাম না, যে না জানে যে তুই (মুখরোচক

যোগ্য নহে)। আর যাও বা বাকী ছিল নিজের চোখেই তো দেখলাম। কে কবে শুনেছে যে ভদ্রলোকের মেয়ে বেটাছেলেকে নিয়ে আসে তার বেডরুমে? আর ওরসন্ত্যার মোর ভেতরে আলো নিবিয়ে গায় গায় ঘেঁষে এক শয্যায় রাত্রি যাপন করে? ওলো, অনেক বয়স হ'য়েছে অনেক দেখেছি। ওসব ভাত দিয়ে মাছ ঢাকা আমার কাছে নিষ্ফল। (আর এক কথা অশ্রুতপূর্ব অকল্পনীয় কথা)। এ বক্তৃতার সমাপ্তি ও মুলধন এই যে, লেখা লজ্জায় মাথা হেঁট করে তাঁর নিজের মাথা খেয়ে ফেলেছে, বাপ ভাইয়ের মুখেও চুণ কালি দিয়েছে। বাপ বুড়ো হ'য়ে গেছেন, কিন্তু ধার্মিক আছেন। তাঁদের লোকের কাছে মুখ দেখাবে তারা। এবং কেবলমাত্র সুপ্রভা তার বড় দাদার মুখ দেখানর ভয়প্রাপ্ত সেই জন্য তিনি আর কেলেঙ্কারী হ'তে দেবেন না। যদি লেখা সাবধান না হয়, ও ছোঁড়া যদি আবার এ বাড়ীতে আসে তবে ঝাঁটা পাটিয়ে সুপ্রভা ঐ নিরঞ্জন প্রভৃতি তাঁর সবাইকে খুন ক'রাবেন।

তার পর যাবার বেলায়, লেখার কাছে দাঁড়িয়ে ব'ল্লেন, "আর যা হয়, এখনই যদি না চলে তোমার, তবের একটাকে বিয়ে ক'রে ফেল। বিয়ে ক'রলেই সব দিক মিটবে (অবশ্যই অশ্রুতপূর্ব)।

ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় লেখা দাঁড়িয়ে শুধু কাঁপতে লাগলো। এত বড় মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে এ রাক্ষসী যে ঘাপটের উপর তাকে ডিসমিস ক'রে গেল তাতে ক্রোধে তার বাক্‌স্ফূর্তি হ'ল না। একটা আগুনের গোলা যেন সে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো।

সুপ্রভা সে বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর চলে গেলে নিরঞ্জন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ঢুকে এলো। লেখা তখনও তেমনি নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রক্ত চক্ষু হয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে।

অনেকক্ষণ সেদিকে নীরবে চেয়ে থেকে নিরঞ্জন বল্লে, "কী সুন্দর মেয়ে! ইচ্ছা হয় এক ঘুসি মেরে ওর দাঁতগুলো ভেঙ্গে দি!"

এ কথায় লেখার আক্রোশ ভেঙ্গে পড়লো নিরঞ্জনের উপর। সে ব'ল্লে, "আর আর বীরত্ব দেখাতে যখন ওই রাক্ষুসীটা বকতে লাগলো তখন তো আমার একলা ফেলে সুড় সুড় করে বেড়িয়ে গেলে।"

নিরঞ্জন লজ্জিত ভাবে বল্লে, "তুমি রাগ করোনা। তুমি কিছু ব'লে না, কি ক'রবো।"

"আমি বলছি তবে তোমার বিজন বের হও।" আমার বাড়ী থেকে এখনি।

"তা নইলে তোমার বাড়ীতে তোমার বউদিকে আমি কিছু ব'লবো কি অধিকারে? আমি তো—আমি তো তোমার কেউ নই।"

লেখা আরও ক্ষেপে গেল। তার মুখ দিয়ে রা সরল না। ঘর ঘর করতে লাগল ইঞ্জিনের মত। সেটা ছিল একটু তফাতে—তাই প'ড়তে প'ড়তে তাকে ধ'রে ফেলে নিরঞ্জন।

লেখা এইবার ভেঙ্গে প'ড়লো। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে নিরঞ্জনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার কোনরকম চেষ্টা না ক'রে, তারই বুকে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এই দিনকার দুর্বলতার ফলে দু'দিন সে আর নিরঞ্জনের কাছে মুখ দেখাতে সাহস পায় নি। একলা ঘরে শুয়ে ছিল।

দু'দিন পরে সন্ধ্যার সময় সে একলা ব'সে ভাবছিল আকাশ পাতাল। তার সমস্ত জীবনটা সে উল্টে পাল্টে আলোচনা ক'রছে। মনে হ'ল সারাটা জীবন তার বিফল হ'য়ে গেছে—এ পোড়া জন্ম চ'ষে আর কোনও ফসল সে পাবে না কোনও দিন।

প্রদোষের কথাই খুব বেশী ক'রে মনে হ'ল—মনে ক'রতে বুকের ভিতর সিরসির ছুরী দিয়ে যেতে লাগলো বার-বার। এত বড় সৌভাগ্য হাতে পেয়ে হারিয়েছে সে নিজের বুদ্ধির দোষে।

তাই আজ—আজ যে-সে যা তা কথা ব'লে যাচ্ছে তাকে অনায়াসে। প্রদোষের দাদা তাকে পরামর্শ দিয়েছেন, বন্ধুটিও পরামর্শ দিয়েছেন নিরঞ্জনকে বিয়ে ক'রতে! কি স্পর্দ্ধা!

তার চেয়েও তার গ্লানি বোধ হ'ল এই ভেবে যে সেদিন দুঃখের আবেগে সে সেই নিরঞ্জনকেই এতখানি প্রশ্রয় দিয়েছে যে যখন সে বাধার জ্ঞানশূন্য হ'য়েছিল নিরঞ্জন তখন সেটা ধরে নিয়েছিল তার আত্মসমর্পণ ব'লে, বুকে চেপে ধ'রে আদর ক'রেছিল। যখন তার হুঁশ হ'ল তখন সে সেই যে পালাল তার পর আর নিরঞ্জনের মুখের পানে চাইতে পারে নি।

মনে হ'ল, নিরঞ্জন সেদিন ব'লেছিল, কি অধিকার তার? অধিকার চায় সে। আর সেটা নিজেকে এমন স্থানে এনে ফেলেছে যে তার মুখের ওপর না বলবার সাহস তার নেই।

কি তবে তার নিয়তি?

মরে যাওয়া? এর চেয়ে ভাল কিছু হবার যোগ্যতা সে তো অর্জন করে নি?

হতাশ ধ'রে ভাবতে ভাবতে এই কথাটা তাকে হঠাৎ মুক্তির সন্ধানের আলো দিয়েছিল ভেবে সবলীয় হ'য়ে উঠেছিল। এখনই এক্ষুণি তাদের যে নিরঞ্জনকে বিয়ে ক'রে ফেললে জীবনের কয়েকটা অদিন এখনি হয়ে যায়। আর নিরঞ্জনের কাছ তার সেই সেই ক'রতে পারবে—অধিকার নিয়ে।

কিন্তু একথা ভাবতেই তার গা-টা রী রী ক'রতে লাগলো।

নীচে একটা গোলমাল শোনা গেল। অনেকগুলি লোক যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।

মুখ বাড়িয়ে দেখা গেল, নিরঞ্জনকে ধরাধরি ক'রে তুলে আনছে তিন চার লোক।

ব্যস্ত হ'য়ে দোর খুলিয়ে দেখা গেল নিরঞ্জনের মুখ চোখ রক্তাক্ত হ'য়ে ফুলে উঠেছে, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজের মত বাঁধা—তাতেও রক্ত জমে গেছে।

ওর হাতে লেখা তাকে একটা ঘরে শুইয়ে দিয়ে শুশ্রূষা ক'রতে লাগল। তার বাঁধা টানা হয়ে গেলে সে নিরঞ্জনকে একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "লাগছে কি?"

নিরঞ্জন ব'লে যে সন্ধ্যার অন্ধকারে হাত ধুয়ে ওরা তাকে আক্রমণ করে। নিরঞ্জনের হাতে কিছু ছিল না শুধু একটা চোখে একটা ঘুসী ক'ষে দিয়েছিল। তারপর তারা তাকে অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখে গেছে দিয়েছে। একজন ভদ্রলোক দয়া করে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

ওরা লাগিয়ে যায়। লেখার ভাবতে এক মুহূর্তও লাগলো না যে বড়বউদির এ কাজ। রাগে তার রক্ত হিম হয়ে উঠলো।

নিরঞ্জনের কোনও আঘাতই গুরুতর হয় নি। কিন্তু ব্যথা ও যন্ত্রণায় সে তিন চার দিন উঠতে পারে নি।

সব কাজ ফেলে লেখা তার শুশ্রূষা ক'রতে লাগলো। তার কেবলি মনে হ'তে লাগলো, নিরঞ্জনের এই দুঃখের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের। সে তার নিজের দোষে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি ক'রেছে যে লোকে নিরঞ্জনের উপর অমন ক্রুদ্ধ হ'য়েছে।

সে ব'লে, "আমার জন্যে তোমার এত দুঃখ। আমি শুধু লোককে দুঃখ দিতেই জন্মেছিলাম।"

নিরঞ্জন ব'লে, "না, তোমার দোষ কি? তুমি তো আর ওদের লাগাও নি।"

"ওরা আমি না লাগাই আমার জন্যই লেগেছে। দেখ তুমি আমার কাছে আর এসো না। আমার জন্য তোমার এ লাঞ্ছনা আমি আর হতে দেবো না। এইবার সেরে উঠে তুমি আর এসো না।"

নিরঞ্জন শুধু ব'লে, "সে আমি পারবো না।"

"কেন পারবে না? পারতেই হবে।"

"না, না, না, আমি ম'রলেও তোমাকে ছাড়বো না। তোমার কাছ ছাড়া হ'লে আমি বাঁচবো না। আমাকে তাড়িও না।" তার চোখে জল।

লেখারও নিজের চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তার চোখও জলে ভরে উঠলো। নিরঞ্জনের মুখের উপর প'ড়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে অনেকক্ষণ ভাবলে। তার পর দৃঢ়স্বরে সে ব'লে, "না, তোমায় ছাড়বো না। তুমি থাকবে চিরদিন আমার হ'য়ে।" ব'লে সে নিরঞ্জনের মুখে একটি চুমো দিলে।

সেই দিনই সে বিবাহ রেজিষ্ট্রারের কাছে খবর দিয়ে এলো।

নিন্দিত কলিকাতাবাসী কয়েকদিন বাদেই শুনতে পেলো নিরঞ্জনের সঙ্গে লেখার বিয়ে হ'য়ে গেছে!

শুনে সবাই অরবিন্দর আবোধ অনুভব ক'রলে আর যার যার চরিত্র অনুযায়ে মন্তব্য ক'রলে। কেউ কটাক্ষ ক'রলে শুধু বুড়ো বয়সে ছেলে রোগের উপর, কেউ ব'লে, এ তো দিব্যি বাহ্য চলছে, কেউ বা এ ধরণের গূঢ় কারণ আবিষ্কার ক'রতে বসলো।

অনিমেষ যখন লোক মুখে শুনে সুপ্রীতিকে খবরটা ব'লে, তখন সে হেসে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু পরে যখন খবরের কাগজে কথাটা বের হ'ল তখন সে মনকে উতলো। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সে বলে, "অমলদা এই কথা লেখা—মেয়েটার তোপ ফুটুয়ে দিয়ে যা হোলে। নিরঞ্জন কী—একটা? যেমন চেহারা তেমনি নাম—হেরম্ব মূর্তি।"

অনিমেষ হেসে বলেন, "এখন দেখছি বুড়ো ঠিকই বলেছিলেন, মৈত্রা [illegible] ন যযুঃ, অবশ্যই পুনর্নিভোব পুরুষে। নিরঞ্জন যে পুরুষ তাতে তো সন্দেহ নেই।"

মুখ রাঙা ক'রে সুপ্রীতি বলে, "এই কথা নিয়ে রসিকতা ক'রছো? ভাবতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।"

"তোমার বুক ভাঙলো তো বয়ে গেল। জিজ্ঞেস [illegible] তোমার বন্ধুকে—তিনি হয় তো ভাবছেন, কার কোথায়? হাসেবাত।"

"যান, যান, তুমি আর আমায় কেপিয়ে দিও না", ব'লে সে মেথাকে টেলিফোন ক'রতে গেল।

খবর পেলে দেখা নেই। কে একজন অপরিচিত গলায় ব'লে।

"তিনি নেই? কোথায় গেছেন?"

[illegible] যে।"

"বাইরে কোথায়?"

"সেটা ঠিক জানি নে—মানে ব'লে যান নি—"

"কলিকাতার বাইরে?"

"না তাই হবে দিন তিনেই ফিরবেন।"

[illegible] দিন।"

[illegible]

অনিমেষ হেসে, "এই সেরে, বুড়ো বয়সের বিয়ে দিনদুনটা একটু বাড়াবাড়ি হওয়াই সম্ভব।"

সুপ্রীতি বলে, "নিশ্চয়ই [illegible] তোমার।"

"বলা যায় কি।"

"এই নেও তোমার প্রতিফল। নিরঞ্জন [illegible] পাবারা [illegible] তাও ঠিক জানে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

অনিমেষ বলে, "বোঝবার কথা নয়—ত্রিকালজ্ঞিনী মেয়ে ন আসতি।"

সুপ্রীতি এক ঝাড় বই ছুঁড়ে ব'লে, "রসিকতা খারাবে তোমার? একটু কিলিং নেই তোমার।" সে হেসে ফেলে।

অনিমেষ তারী [illegible] হ'য়ে গেল।

নিরঞ্জন ছিপ্রেক খাটি কথা বলে নি। লেখা কোথায় আছে তা সে জানে, কিন্তু সাহে কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে হাত ছাড়া হয়ে যায় সেজন্য সে সবাইকে ডেকে আনি ভাসা ভাসা জবাব দেয়, যেন কথা দু' চার দিনে সবাই ভুলে যাবে।

লেখার বিয়েটা সে চুপি চুপি সারতে চেয়েছিল, লোক জানাজানি হওয়াটা তার ইচ্ছা ছিল না। অথচ নিরঞ্জনেরই বন্ধুকে সাক্ষী করে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

তার আগের রাত্রি থেকেই লেখার মনে ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল। সে ভাবছিল কাজটা ভাল হচ্ছে না।

বিয়ের দিন সকালবেলায় তার ভেবে ভেবে মুখ শুকিয়ে গেল, বুক কাঁপতে লাগলো—এ কী করছে সে? মন সুস্থির করবার আশায় সে সকালে চা খেতে যেমন রোজ হাসপাতালে যায় তেমনি গেল।

নিরঞ্জনের মুখ শুকিয়ে গেল। তবে কি অবশেষে লেখা কাঁকি দেবে সব? সে বলে, "ইয়ে—মানে আজ না গেলে হ'ত না?"

লেখার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, সে বলে, "কেন?"

"মানে, আজকে সেই—মানে রেজেষ্ট্রি—"

"হাসপাতাল থেকে বাড়ী গিয়ে তুমি সাক্ষী নিয়ে রেজেষ্ট্রি অফিসেই যেও।" বলে লেখা মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

হাসপাতালের কাজে মোটেই মন লাগলো না। ঘুম হতে লাগলো বার বার। রোগীর ভিড়ের বার বার লেখার মনে উঠতে লাগলো—এ কী করছি? কী করলাম!

কোনও মতে কাজ সেরে সুস্থির হবার জন্যে সে একটু বসলো। কিন্তু সুস্থির হবে কে—রাশি রাশি এলোমেলো চিন্তা আজ কদিন থেকেই তার মনের ভিতর কাটাকাটি করছিল। বিশ্রামের অবসরে সেগুলো ভীড় করে হুড়মুড় করে মনের ভিতর তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দিলে।

"দূর ছাই!" বলে সে উঠে পড়লো। মনে হল কাজটা শেষ করে না ফেলে সে সুস্থির হতে পারবে না।

রেজেষ্ট্রী আফিসে সংক্ষেপ কাজ শেষ হল। তার পর লেখা সাক্ষী দুজনকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে রোগী দেখতে চলে, নিরঞ্জনকে বাড়ী যেতে আদেশ করলে। নিরঞ্জন কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

তার যে বন্ধুরা সাক্ষী হতে এসেছিল তারা বলে, "যা রে। বিয়ে হল, ইতরে কাজের ব্যবস্থা করবে না?"

নিরঞ্জন বলে, "হাঁ হবে বই কি, চল—"

তাদের নিয়ে আর পরে আরও চারটি বন্ধুকে সংগ্রহ করে সে চলো লেখার বাড়ীতে, বন্ধুদের সেখানে খাওয়াবে বলে। বন্ধুরা সবাই নিরঞ্জনের বন্ধুই বটে অতিরিক্ত নিকট।

লেখা যখন বাড়ী ফিরছে তখন নিরঞ্জনের মনে নিরাশায় আশার সাফাতের ঝলমলি তার মুখ ভাসিয়ে উঠলো। আশাময়ী রাত্রির কথা ভেবে সে শিউরে উঠলো—একটি রাত্রি পাবে সে!

বাড়ীতে ঢুকলো সে খুব চিকণ। তখন নিরঞ্জনের বন্ধুদের কাজ হয়ে গেছে, খাবার দিন সাদি—খুব হৈ-হুল্লোড়—আর যাবে মাঝে তাদের গানের টুকরো।

লেখার সমস্ত অন্তরটা বিষিয়ে উঠলো। এই বন্ধুপরিবৃত নিরঞ্জনকে সে যেন আর কখনো নিজস্ব ক'রে পেতে পারে না।

পা টিপে টিপে উপরে গিয়ে সে শোবার ঘরে ঢুকে কি ক'রলে। চাকরদের ব'লে-ক'য়ে তার খাওয়া হ'য়ে গেছে, কেউ যেন তাকে না ডাকে। ঘরে গিয়ে সে চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়লো। দুই চোখে তার অজস্র অশ্রুধারা। কেবলি সে ভাবতে লাগলো—এ কী ক'রলাম! কেমন করে বাস ক'রবো এর সঙ্গে? শয্যার দিকে চেয়ে মনে হ'ল—এই শয্যায় নিরঞ্জনকে কেমন ক'রে সঙ্গ করবে? নিরঞ্জনকে একটা অপুষ্ট ভ্রূণ বলিয়া গোহের পশু বই আর কিছু সে মনে ক'রতে পারলো না।

বন্ধুদের অনুরোধে নিরঞ্জন একবার গিয়েছিল তাকে ডাকতে। বেয়ারার কাছে শুনে আর ডাকতে সাহস হ'ল না। ভাবলে সে "একী বাপু! মিথ্যি শান্ত শিষ্ট সুন্দির হ'য়ে বিয়েটা ক'রে এনেছি, স্বামীর সঙ্গে এ কী ব্যবহার! কিন্তু—মানে—কি আর উপায়! চিরদিনের খামখেয়ালী মেয়ে—ওর খেয়ালে বাধা দেবে কে?"

কালে অনেক দেরীতে মনটা কতকটা শান্ত ক'রে লেখা দুয়ার খুললে। তবু কল কয়ে নিরঞ্জনের পড়ে যাবার কল্পনায় কেঁপে উঠেছিল বুক।

বেয়ারা ঘরেই চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতেই একটা টেলিফোন এলো। টেলিফোন ক'রছেন ক'লকাতার একজন বড় ডাক্তার, তাঁর সঙ্গে লেখা পরিচয় ছিল, ক'লকাতার পশ্চিমের এক ধনীর বাড়ি পরিবারে চিকিৎসা ক'রছিল। ডাক্তার ব'লেন, মহারাজা [illegible] সুস্থ-সবল পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে চান। লেখাকে সঙ্গে যেতে হবে আর থাকতে হবে যত দিন না প্রসব হয়। দেরী পারবে কি?

অবশ্য পারবে। এ প্রস্তাবে লেখার অন্তর নাচিয়ে উঠলো। প্রসব হ'তে এখনো তিন মাস—লেখা বেন [illegible]।

[illegible] সে। ঠোক তিন মাস মাত্র, তবু তো এ তিন মাস সে নিরঞ্জনের [illegible] থেকে মুক্তি পেলো।

চট্‌পট্ তৈরী হ'য়ে নিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যায় সে চ'লে গেল। নিরঞ্জনকে যতদূর সম্ভব তার হাতের পেনেটরের ব্যবস্থা করবার উপদেশ দিয়ে গেল।

আর নিরঞ্জন ক্রমাগত পেনেটরের লোকজনকে তাড়াতে লাগলো—এই তিনি দিন বিধি আসবে ব'লে।

(১২)

রাজবাড়ীতে ব'সে লেখা তার নিত্য পরিচিত রাজভোগ খায়, বেড়িয়ে বেড়ায়, ঘুমায়, পড়াশুনা করে আর ভাবে। তার কাজ কিছুই নেই, কেবল বউরাণীকে দিনে দু'বার ঘুরে দেখা, আর তার খাওয়া ওষুধের তদারকি করা। এই দীর্ঘ খাল অবসরে সে অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে তার বর্তমান অবস্থার কথা ভাবতে লাগলো। নিরঞ্জনসমাজে নেই, তার সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের বিভীষিকা নেই। কাজেই নিরঞ্জনের চিন্তাটা ক্রমে সহনীয়

ভাবতে পারলে যে বিয়েটা যখন হ'য়েই গেছে তখন তার এ কেপামীর কোনও মানে নেই। [illegible] ব্যবহারই ক'রতে হবে, নইলে কেওড়াবেরীর আর সীমা থাকবে না।

[illegible] মনে হয় নিরঞ্জন এমন কী যে তার সঙ্গে ঘর করাই যাবে না। মনের মত স্বামী, যোগ্য স্বামী [illegible] সে ওয়ানক অনুগত ও অনুরাগী, লেখার কথা তার কাছে বেদবাক্যের অধিক। আর লেখা পড়া সে নিজেও অনেক বিষয়ে তার বিস্তর বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা আছে। লেখা তাকে হাতে নিয়ে গড়ে পিটে মানুষ ক'রে তুলবে যাতে সে লোকসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা পাবে না। চাই কি তাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবে। সেখানে লেখা পড়া বেশী না শিখেও হাতে কলমের কাজে উচ্চ পারদর্শিতা লাভের অনেক পথ আছে। সেখানে যদি সে টেকনিক্যাল শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে আসতে পারে তবে আর লেখার কোনও গ্লানির কারণ থাকবে না।

তার মনের যখন এমনি অবস্থা তখন সে তার বড়বউদির একখানা চিঠি পেলো। সে চিঠির অক্ষরে অক্ষরে সে দেখতে পেলো সেই হিংস্র নারীর পূর্ণ প্রতিকৃতি।

সুপ্রভা লিখেছেন,

"খবরের কাগজে তোর বিয়ের খবর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। যদি ভেবে থাকিস যে এই বিয়ে ক'রে দুই গালের চুণ-কালি ধুয়ে ফেলে ভদ্র-সমাজে উঠতে পারবি তবে ভুল ক'রেছিস। তোর বাপ ভাইয়ের মান মর্য্যাদার কথা না হয় ভুলেই গেলি, কিন্তু যে লেখা পড়া শিখেছিস তার মর্য্যাদাও—একটা পথের কুকুর সমাজে যার কোনও স্থান নেই তাকে বলিস স্বামী!

"মনেও ভাবিস নে যে তোর এই বিয়ে দেখে নিয়ে তোর এই স্বামীটিকে আমরা কেউ আমাদের পরিবারে স্থান দেব।"

জ্বলে উঠলো লেখার সর্বাঙ্গ এ চিঠি প'ড়ে। সে চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে তখনি চিঠি লিখলে,

"তোমার চিঠি তোমার চিরদিনের নোংরা মন ও মুখের উপযুক্ত চেহারা নিয়েছে। দশ মিনিটের জন্যে তুমি তাকে দেখ নি তাকে অমান বদনে পথের কুকুর বলতে বাধলো না।

"আর, এই যে দিনে না তুমিই বড় গলায় ব'লে গেছে আছে বিয়ে ক'রতে। পালিয়ে গেলে, নইলে ওতা লাথিয়ে মারতে ওকে। আর দু'দিনও ওর সইলো না, ওতা লাথিয়ে নির্দয় ভাবে বারালে তাকে।

"আজ সেই বিয়ে হ'য়ে গেছে ব'লে তবে এত রাগ কেন?

"সে যখন না পরিবারের তুমি একটি অনুগ্রহ সে পরিবারে স্থান পাবার জন্য আমি বা আমার স্বামী হেদিয়ে পড়বো না।"

কিছু দিন পরে জবাব এলো আরও হিংস্র, আরও তীব্র। চিঠির শেষ কথার উত্তরে সুপ্রভা লিখেছেন, "বিয়ের ওতার হাতে ছোরা খেয়েছে সে কথা জানতাম না। শুনে খুসী হ'লাম। কে এ মহৎ কাজ করিয়েছে জানলে তাকে বকশীস দিতাম। কিন্তু তুই যে ভেবেছিস আমি ওতা লাগিয়েছি এতে আমাকে [illegible]

বাহাদুরী দিয়েছিস। আমি তোর কাছ থেকে বিদেই মাত্রাতে চ'লে গেছি, যদি একবার [illegible] থাকলেও আমার সময় হ'ত না।

আজ লেখা জানে যে মতলবটি মিথ্যে দেখেন নি। ওতার আক্রমণ তিনি করেন নি। তখন সে প্রকৃত বিশ্বাস করে নি আর মিথ্যুক ব'লে তাকে গাল দিয়েছিল।

সুপ্রীতির চিঠিতে লেখার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠল। বিয়ে ক'রলে যদি কোনও অপ্রসন্নতার কাছে প্রকাশ হ'তে যায়, যাকো বা ব্যবহারে যদি কোনও অতৃপ্তি বা দুঃখের পরিচয় যায় তবে বউদির মত শুকনো হাসবে। তার সম্পূর্ণ চেষ্টা হবে সুখী হবার। কোনও রকম কিছুর ব্যবহার ক'রে সে এই ঘর ভাঙ্গতে হাসাবে না।

সুপ্রীতির একখানা চিঠি এলো কয়েক দিন পর। সে লিখেছে,

"এ কী ক'রলি তুই লেখা? এমন ক'রে নিজেকে বিসর্জন দেবার আগে আমাকে একবার জানালি না। নিশ্চয়ই তুই ভালবেসে বিয়ে ক'রেছিস এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না। যদি ভালবেসে থাকিস, তবে কিছু বলবার নেই।

"যাই হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তোর বিবাহিত জীবন সুখের হোক।"

এ চিঠিতে ত্রুটি ছিল—নিরঞ্জনকে লেখা ভালবাসতে পারে না ব'লে নিজেছে সুপ্রীতি। কেন না নিরঞ্জন সুপ্রীতির স্বামীর মত পণ্ডিত নয়। মনে হ'ল এ তার স্বামীভাগ্যের দর্প। নিরঞ্জন শুধু উচ্চ শিক্ষা পায় নি ব'লেই তাকে এত খাটো ক'রছে সুপ্রীতি। লেখা আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে নিরঞ্জনকে মানুষ ক'রে তুলে সে দেখাবে যে তার নিজের ভিতর আছে সে পরশ পাথর যাতে এ লোহাকে সে সোনা ক'রতে পারে।

এমনি ক'রে তিন বছর ঘুরে গেছে নিরঞ্জন তার কাছে শুধু সঙ্গীর হ'ল না, তার ভিতর [illegible] অনেক সম্ভাবনা। নিজেকেই সে তিরস্কার ক'রতে আরম্ভ ক'রলে [illegible] প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা পোষিয়েছে এতদিন ধ'রে। তার জীবনের কর্তব্যে দৃঢ় সংকল্প ও তৃপ্তিতের [illegible] ভিন্ন রঙ উঠলো তার মনে। ঘিরে গিয়ে তার জীবনের এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

(১৩)

লেখার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। সূতিকা প্রসবের পরেও একটু অসুখ ক'রে পড়ায় তার [illegible] দু'মাস থাকতে হ'ল, কিন্তু তখন রোগীর সুস্থ হ'লেও ডাক্তারের ছুটি হ'ল না। বধূর ঘাড়ে অভিভাবকের মন উঠলো না, তাঁর বিবেচনায় সে এখনও অসুস্থ, তাই লেখাকে থাকতেই হ'ল।

আর্থিক দায় তার এতে অনেকই হ'ল, কিন্তু প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো। কোনও কাজ নেই তার কেবল চায়ের বেলা বউয়ানীর নাড়ী টেপা আর তাকে খাওয়া দাওয়া ওষুধ খাওয়া প্রভৃতির তদারক করা—তা ছাড়া দিন রাত্রি অখণ্ড বিশ্রাম। লোকজনের সঙ্গে কথা কওয়া বড় বেশী হয় না। মাতা ও রাজপুরুষেরা তাকে দূর থেকেই [illegible] বেশীর ভাগ, অন্দরে মহিলারা আসে কথা কইতে। কিন্তু একে লেখার হিন্দীটা [illegible] হিন্দী উচ্চারণ বাঙ্গালীর—কথাবার্তার সুবিধা হ'য়ে ওঠে না। তা ছাড়া [illegible] ঘরে ঘরে

কতক সে জানে না ব'লে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে কখন কোথায় আদবের ত্রুটি হ'য়ে যায়। [illegible] ব'লেই সমীহ করে আর সমীহ করে ব'লেই প্রাণ খুলে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যে-কোনো চারিদিকে আদব কায়দার সাজসোজ পরে সর্বদা শক্ত সুখাস এঁটে টিপে চড়ে বেড়াতে হয়। এতে সে হাঁপিয়ে উঠে।

তাই বউরাণী মৃত হ'তেই সে বিলাসের আদেশ জানালে। মহারাণীর তাতে ঘোর আপত্তি! অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন লেখার কোথায় তকলিফ হচ্ছে কি না। তকলিফ তার কিছুই নেই কেবল অবাধে খিল কাজে রত হ'য়ে থাকা ছাড়া। তার এ বিলাসের কি যে প্রাপ্তি তা মহারাণীর বোঝবার কথা নয়।

লেখা ব'লে, "তকলিফ কিছুই নেই মহারাণী, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আছি, কিন্তু বউরাণী এখন সুস্থ হ'য়েছেন, এখন আর আমার থাকবার দরকার নেই—আমার কাজ প'ড়ে র'য়েছে, হাসপাতালের ছুটি ফুরোচ্ছে" —ইত্যাদি বলুন।

এসব তুচ্ছ কথা মহারাণী কানেই তোলেন না। লেখা যে এখান থেকে অন্য কাজে এইটাই তাঁর চলার সব অসুবিধার দুর্ভোগ। তিনি ছাড়লেন না। বউরাণীর শুশ্রূষার জন্য একজন বড় ডাক্তার মোতায়েন আছে এতে এঁদের যেন একটা গর্ববোধ ছিল। এত বড় ডাক্তার বিদায় ক'রলে যেন তাঁরা একটু খেলো হ'য়ে যাবেন।

এমনি ব'সে থাকে লেখা হতাশ ভাবে, দিন গোণে জেলখানার কয়েদীর মত আর দিনের বোঁটা বোঁটা টাকা গোণে মাত্র। তার মন যখন খুব ছটফটাচ্ছে তখন হঠাৎ একদিন এসে পড়লো বিরজন।

লেখা যেন হারানিধি পেলো। এতদিন প্রবাসে একলা প'ড়ে থেকে দেশের যে-কোনও লোক দেখলেই তো মনটা উল্লাসে ভরে ওঠে, সুতরাং অসীম সে বিরজন, যাকে নিয়ে সে ক'মাস ধরে শুধু স্বপ্নের জাল বুনেছে আর রঙ ক'রে মনে মনে ভালবাসবার সাধনা ক'রেছে।

তাই লেখা ভারী খুসী হ'য়ে গেল। বিরজনের উপর যে বিরক্তি নিয়ে সে মুখ ভ্যাঙা করেছিল, তার কিছু চিহ্নও তার মনে রইলো না। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের আপন জন ব'লে লেখা বুকে টেনে নিলে।

সে মহা ব্যস্ত হ'য়ে বিরজনের জন্য চায়ের জোগাড় ক'রতে লাগলো। ছুটোছুটি, লোক ডাকাডাকি ক'রে হৈ চৈ ক'রে সে বাড়ি ক'রে তুললে। সে গুন গুন ক'রে গাইতে লাগলো,

আজকে আমার সুর লেগেছে তুমুল
অনেক দিনের পর!

অবশেষে বিরজনের সামনে চা ও প্রাতরাশ পরিবেশন ক'রে লেখা হাসি মুখে তার সামনে বসে আর একটা গানের একটা কলি গাইলে,

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া?
কি হ'তো তাহলে কি বেশ তুমি পথ ভুলিয়া?

ব'লে, "কেন এলে বল তো—যাঁদের ছেঁড়া গল্পের মত ছুটে। আমার যে

লেখার এবার উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ যেন সম্ভবও ক'রলো না। সে প্রশান্ত

লাগলো—তবে সে গম্ভীর লেখার চিরন্তন অতি পুরাতন একটি ধাঁধা।

কিন্তু লেখা উল্লাসে এত তন্ময় যে নিয়ন্ত্রনের এ অভিনব ঔদাসীন্য সে লক্ষ্যই ক'রলো না।

লেখার প্রশ্নের উত্তরে নিয়ন্ত্রন মৃদু ব'লে, "যে পায়ে। মানে—একলা প'ড়ে আছি, কাজকর্ম নেই, ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসি।"

লেখা কিন্তু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আরও হেসে ব'লে, "তাই বুঝি বেড়াতে বেড়াতে পথ ভুলে একেবারে নিজের গোয়ালে ঢুকে পড়লে! এ মকভূমিতে এসেই বল্!"

অছিলে একথায় উত্তর দিতে নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা দীক্ষা বা চরিত্রে ঘুলোবার কথা নয়, তবুও সে কাট-খোট্টা যে জবাবটা দিলে তাতেই লেখা উল্লসিত হয়ে উঠলো।

নিয়ন্ত্রন বল্ল, "মানে তুমি আছ কি না!"

লেখার মনে হ'ল এই ক'টি কথার ভিতর ভালবাসার মহাসিন্ধু যেন উলমল ক'রছে! মনে হ'ল, এত ভালবাসে নিয়ন্ত্রন, তাকে লেখা এতখানি অবহেলা ক'রেছে এতদিন! লেখার উল্লাস ও তৃপ্তি এতটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো যে সে আসন ছেড়ে উঠে নিয়ন্ত্রনের মুখখানি ধ'রে তাকে দিলে একটা গভীর চুম্বন। আর অমনি সন্ধ্যার লাল হ'য়ে উঠলো সে এই অভাবনীয় উচ্ছ্বাস দেখিয়ে।

নিয়ন্ত্রনের খাওয়া হ'য়ে গেল। সে প্রশান্ত ভাবে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখ মুছে, রুমালটা আবার সযত্নে ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে, কিছুক্ষন এদিক ওদিক চাইলে, দু'একটা ফাঁকা কথা কইলে। লেখা কিন্তু কিন্তু প্রশ্নটি কিন্তু নিয়ন্ত্রন তার মুখের দিকে চাইলে না, চাইলে বিশ্বের আর সব

কথা বলতে বলতে নিজে সে ব'লে, "আমি ভিন্ন থাকতে আসি নি। মানে—আমরা [illegible] মাসে আমি আর, আর দুটি বই। তারা এখনে হ'সে আছে। আমি একবার এলাম—মানে—হয়ে —কিছু টাকার দরকার। যদি দিতে পার।"

তার এতখানি সমাদরের প্রত্যুত্তরে এই ঠাণ্ডা কাটখোট্টা কথা শুনে তারী দমে গেল। তবু সে মনকে বোঝালে যে নিয়ন্ত্রনের যা শিক্ষা দীক্ষা এতদিন হ'য়েছে তাতে ওর কাছে এর বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায় হবে। তাকে সব দিক দিয়েই মানুষ ক'রে তুলতে হবে, প্রেম ক'রতেও শেখাতে হবে।

গম্ভীর হ'য়ে সে শুধু, "কত টাকার দরকার?"

"হাজার খানেক যদি দিতে পার—"

কঠোর কণ্ঠে লেখা ব'লে, "হাজার টাকা! এত টাকা কী হবে?"

"মানে কাপড়ী বাড়ি এখন। লেখার থেকে আরও দূরে গিয়ে পড়েছে। বোধ হয় ক'লকাতা।

তেমনি ঠাণ্ডার ভাবেই লেখা ব'লে, "খুব তো বুদ্ধি তোমার। তিন বছরে বেড়াতে বেরিয়েছ বেশ যে, খুব ফুর্তি হয়েছে। আমার কাছে আগে লিখে জানা উচিত ছিল, টাকা দিতে পারবো কি না?"

নিরঞ্জন দুখভার ক'রে বুক উঁচু ক'রে ব'লে, "ভেবেছিলাম এত হাজার হাজার টাকা আছে এখানে, একটা হাজার টাকা দিতে অমত ক'রবেনা।" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'লে, "না খেয়ে মরে যাব, কী আর ক'রবো?"

লেখা কোনও উত্তর ক'রলে না। অনেক টাকার ছিল তার কাছে—সে উঠে গিয়ে এক হাজার টাকা বের ক'রে এনে দিলে, কোনও কথা ব'ললে না।

নিরঞ্জন সোল্লাসে টাকাগুলো নিয়ে পকেটে পুরলে, লেখার মুখের উপর যে মেঘ জমেছিল তার দিকে সে চাইলেও না। ব'লে, "এখন যাই তবে।" ব'লে তাড়াতাড়ি উঠলো। তার পর যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে ব'লে, "তোমার ফিরতে বোধ হয় মাস খানেক আছে—তার আগেই ফিরবো।"

লেখার মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে গেল। এক মাস নিরাপদে ব'লে নিরঞ্জনকে বেষ্টন ক'রে যে সব ঘর গড়ে তুলেছিল তাতে একটা প্রবল আঘাত লাগলো। যে নিরঞ্জনকে নিয়ে লেখা ঘর গ'ড়েছিল, জানতো সে যে সে মূর্খ বুদ্ধিহীন। কিন্তু জানতো সে লেখার নিতান্ত আপনার, যেখানে যে ঘাস ছিঁড়ে ভালবাসে, লেখায় সেবা ছাড়া তার জীবনের অন্য ব্রত বা সাধনা নেই। আজ লেখা দেখতে পেল তার সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি—একদিন পর লেখাকে দেখে এক দোটা আনন্দের উচ্ছ্বাস হ'ল না তার। এত খানি স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব সে যে লেখা কি ভাববে, কোথায় তার ব্যথা সে সম্বন্ধে কোনও চিন্তা বা কৌতূহলই তার নেই, সে চায় বেড়াতে, এই টাকা টাকা পেয়েই তার সব দরকার ফুরোলো।

এর পর সে সেখানে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠলো। মনের ভিতর এই নিরঞ্জন অবলম্বন আরও বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো। ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে কাজে ডুবে যাবার জন্য সে অধির হ'য়ে উঠলো।

তার যে আর এখানে থাকবার দরকার নেই একথা শ্বাশুড়িকে প্রবোধ করাতে অনেক বেগ পেতে হ'ল। শেষে তাঁর ওঠাপড়ায় অস্থির হ'য়ে মহারাণী শেষে আদেশ দিলেন বোম্বাই থেকে একটা ডাক্তার এনে লেখাকে বিদায় করা হোক।"

বোম্বাই ডাক্তার এসে তার ছুটী হ'ল।

(২৪)

যাবার টেলনে পরের পরিচিত কলকোলাহলের ভিতর বড় গাড়ী এসে দাঁড়াতে লেখার মনে হ'ল যেন পুনর্জীবন পেয়েছে। দীর্ঘ দিনের কয়েদী বন্ধ গারদ থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

বাড়ীতে এসে মনে হ'ল স্বর্গপুরী। ক'লকাতার অপ্রান্ত কোলাহলে, মোটর গাড়ী থেকে সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ শ্রেষ্ঠীর চীৎকার ও গর্জ্জন যেন তার কানে অহরহ বর্ষণ ক'রছে। এখানে এসে বাড়ীর প্রত্যেকটি আসবাব যেন তাকে প্রিয়জনের মত আলিঙ্গন ক'রে নিলে।

সেদিন ও পরদিন সে পরিপূর্ণ বিলাস উপভোগ ক'রে নিলে। তার মনের ভিতর যেন হাওয়া খেলে গেল দুদিন ধরে।

তার মনের ভিতর ঝলক দিয়ে গেল একবার প্রদ্যোতের কথা! এখন বাড়ী ঘরের আরাম ফেলে, প্রদ্যোত কেমন ক'রে আছে এতদিন তাই ভাবলে। মনের ভিতরটা একবার মোচড় দিয়ে উঠলো।

পরদিন সে রুবানিমুনে হাসপাতালে গেল। সেখানকার কাজ শেষ ক'রে সে যখন তার ঘরে এসে বসেছে তখন হাসপাতালের সিষ্টার এসে তার কাছে বসলে। চোখে দুটো গোল ক'রে সে নিম্ন স্বরে বল্লে, "ডাক্তার, তুমি তো ছিলে না, এদিকে ভীষণ কাণ্ড!"

চমকিত হ'য়ে লেখা বল্লে, "কী হ'য়েছে?"

সিষ্টার বল্লে, "কিছুদিন আগে একটা কেস এসেছিল। রাত্তিরে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে কারা সব একটা মেয়েকে ফেলে গিয়েছিল রক্তাক্ত বসনে, অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল আগ্নেয় অস্ত্রে ভ্রূণ হত্যা করতে গিয়ে মেয়েটির প্রাণ-সংশয় হ'য়েছে। অনেক চেষ্টায় সে একটু সুস্থ হ'য়েছিল, কিন্তু শেষে মারা যায়।

মরবার আগে স্যাবিট্রেট ডেকে মেয়েটার ডাইং ডিক্লারেশন নেওয়া হ'য়েছিল। সেই থেকে পুলিস রোজ রোজ এখানে আসছে, নার্স দের ডাক্তারদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

সিষ্টারের বিশ্বাস হ'য়েছে যে পুলিসের লোকের কথাবার্ত্তায় মনে হয় যে এই হাসপাতালের [illegible] শেষ রক্ষা ক'রতে না পেরে মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

লেখা তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, "তাতে আপনার বা আমার ভয় হবার কি আছে? যদি কেউ তা ক'রে থাকে তবে তার শাস্তি হওয়াই উচিত।"

"তা বটে, কিন্তু এই সন্দেহ নিয়ে নার্স আর পাইলের তারা যে অস্থির ক'রে তুলেছে। আপনি একবার পুলিসের সঙ্গে দেখা করলে ভাল হয়।"

লেখা বল্লে, "আচ্ছা দেখবো।"

সে বের হবার আগেই পুলিস ইন্সপেক্টার এসে তারই সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইলে।

ইন্সপেক্টার অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে লেখার সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিলে। সে হেসে বল্লে, "আপনার বিয়ের খবর কলকাতায় এক sensation হ'য়ে গেছে। আপনি তো ছিলেন না এখানে। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কত হৈ চৈ হ'ল। হাঁ, তিনি এখন আছেন কি এখানে?"

"না, তিনি কাশ্মীরে বেড়াতে গেছেন।"

[illegible] আর তিনি বেরিয়ে গেলেন।"

লেখা [illegible] গেলো না, সে মুখ তার ক'রে ব'লে, "আমার সঙ্গে সেখানে তিনি দেখা ক'রে গেছেন।"

"ও! সেখানে দেখা ক'রেছিল তাঁর সঙ্গে—কবে বলুন তো?

লেখা ব'লে, তার পর সে বলে, "এসব আমার personal কথায় আপনার কি দরকার? আপনি আমার কাছে যে জন্য এসেছেন তাই বলুন।"

ইনস্পেক্টারও গম্ভীর হ'য়ে ব'লে, "এই জন্যেই এসেছি" ব'লে সে মেয়েটি মৃত্যুকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বর্ণনা ক'রেছিল সেটা লেখাকে প'ড়তে দিলে।

প'ড়তে প'ড়তে লেখার মাথা বো ক'রে ঘুরে উঠলো, মুখ একবার ফ্যাকাসে, একবার কালো হ'য়ে উঠলো। প'ড়ে নীরবে সে কাগজখানা ইনস্পেক্টারকে ফিরিয়ে দিলে।

ইনস্পেক্টার বল্লে, "আপনাকে কষ্ট দিতে হ'চ্ছে ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু [illegible] ক'রে সেটা কয়েক কথায় উত্তর দিন। তার পর নিরঞ্জনের সঙ্গে আপনার আর দেখা হ'য়েছে?"

"না।"

"কোনও চিঠিপত্র, কি কোনও লোক পাঠায় নি আপনার কাছে?"

"না।"

"টাকা কড়ি চায় নি সে?"

"না। চাইবার কথাও না, কেন না সেখান থেকে সে এক হাজার টাকা [illegible] দিয়েছে।"

লেখার বসে থাকতেও কষ্ট হ'চ্ছিল। তার দু'হাতে মাথা চেপে ধ'রে সে ব'সে রইল।

তার অবস্থা দেখে ইনস্পেক্টার বল্লেন, "যাপ ক'রবেন। আপনার শরীর ভাল নেই। এখন তবে [illegible]

ইনস্পেক্টার চ'লে গেলে লেখা সংজ্ঞাহীন হ'য়ে প'ড়ে গেল।

লেখা যে dying declaration প'ড়েছিল তাতে মেয়েটির নাম ছিল। সে লেখার পরিচিত অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মেয়ে। সে ব'লেছে যে নিরঞ্জন থেকেই তার এ দশা হ'য়েছিল। দু'বছর থেকেই তার সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ছিল। গর্ভসঞ্চার প্রকাশ হতে নিরঞ্জন তাকে একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল—সেখানে কাকে সে চেনে না। তার গর্ভপাতের পর সে যন্ত্রণায় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিল—জ্ঞান হ'ল হাসপাতালে।

(১৮)

সংবিৎ পেয়ে লেখা উঠে সেই যে বাড়ী গেল, তার পর সে আর বাড়ী থেকে বের হ'ল না। নিজের ঘরে সে বন্ধ হ'য়ে থাকতো, কারও সঙ্গে দেখা ক'রতো না। কেবল পুলিসের লোক এসে যখন ঘরে তার দেখা করতে হ'ত।

সে মনে মনে একবার গর্বে ওঠে নিরঞ্জনের উপর নিষ্ফল আক্রোশে [illegible] বেঁকে ওঠে।

ভাবে সে, এই নিরঞ্জন! এত দিন তাকে জেনেও সে তাকে চিনতে পারে নি। ঐ মেয়েটি লেখার বিয়ের আগে তার বাড়ীতে অনেক দিন এসে তার সঙ্গে আলাপ ক'রেছে। এসে পর নিরঞ্জন তাকে প্রায়ই মোটর গাড়ী বের ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছে। লেখার কোনও সন্দেহ হয় নি। একদিন সে শুধু জেনেছিল যে নিরঞ্জন যেন পালাবার জন্য বড় বেশী ছট ফট করে, মোটর গাড়ী নিয়ে বেশী ঘন ঘন বেরিয়ে যায়। একটু বিরক্তই সে হয়েছিল তখন তার এই বাড়াবাড়িতে। কিন্তু আজ তার মনে হ'ল সে বুঝতে পেরেছে কেন প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে সে মোটর নিয়ে ছুটে বের হ'ত। সে যেত তার প্রণয়ের অভিসারে। মেয়েটি মরবার সময় যে বিবৃতি দিয়েছে তা যে এখন সম্পূর্ণ সত্য তাতে লেখার বিন্দু মাত্র সন্দেহ হ'ল না।

ঐ নিরঞ্জন! লেখা মরবার আগে খুঁজে পেলো না তাকে বিয়ে করে মরতে সৈন্য। এতবড় নরপশু সে! তাকে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা হ'ল।

কী ঘৃণা! কী গ্লানি! এই মামলা নিয়ে এখনি অনেক জানাজানি হ'য়ে গেছে, আদালতে যখন আসবে তখন তো আর জানাজানির বাকী থাকবে না! তারপর লেখা লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি ক'রে? ওঃ! এমন সর্বনাশ মানুষের হয়? নিজের পায়ে যে কুড়ুল মারে সে তো লেখার তুলনায় অত বুদ্ধিমান!

পুলিসের লোক প্রায় রোজই আসে। ডিটেক্‌টিভ পুলিস তদন্ত আরম্ভ করবার পর রোজ বার বার আসতে লাগলো, নিরঞ্জনের সন্ধানের নূতন আবিষ্কারের চেষ্টায়। বাড়ীতে তন্ন তন্ন ক'রে খানাতল্লাসী ক'রলে। যখন তারা আসে তখন তাদের প্রত্যেকটি কথা যেন বিষাক্ত ছুঁচের মত লেখার বুকে ঢুকে যায়। তাদের প্রত্যেকটি যেন লেখার বুকের উপর দিয়ে বশ্‌ বশ্‌ ক'রে চ'লে যায়।

একদিন নিরঞ্জনের আরও কীর্তি প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। জানা গেল সে যাবার আগে লেখার নাম জাল ক'রে কেটে ব্যাঙ্কে লেখার যে পাঁচ হাজার টাকা ছিল তা তুলে নিয়েছে।

পুলিসের কাছে সে আরও খবর পেলো যে নিরঞ্জনের প্রেমলীলার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ছিল। অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীতেই সে তাঁর অবৈতনিক সেবা করবার ওজুহাতে গিয়ে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করেছে। এও জানা গেল যে বছরখানেক আগে সে একটা বিয়েও ক'রেছিল গোপনে।

কার কত অনেক হতভাগিনীই নিরঞ্জনের ফাঁদে প'ড়েছিল। লেখার বরং সৌভাগ্য যে তার চরম সর্বনাশে আগেই তার শুভাবুদ্ধি সে জালে ছিদ্র কেটে তার মুক্তির পথ ক'রে দিয়েছিল।

নিরঞ্জনের এই বেপরোয়া জীবনে প্রথম বিঘ্ন হয়েছিল এই মেয়েটি। তার যখন জীবন ছুটে সে দেখলে তখন তাই নিরঞ্জন টাকাকড়ি সংগ্রহ ক'রে চম্পট দিলে।

সে পালালে বাঁচে, তাহলে লেখা, কিন্তু লেখার এ কী সর্বনাশ ক'রে গেল সে। তার সম্মান বা প্রতিষ্ঠার এক কোটাও তো রইলো না অবশেষ। নিরঞ্জনের স্ত্রী সে—এ গ্লানি নিয়ে কেমন করে বাঁচবে সে? যখনই যার চিঠিখানা যেবে তাকে তখন কোথায় মুখ লুকোবে।

এখন হিজিবিজি উল্টের পৃষ্ঠে শেষ ফুটোটির মত এলো প্রদোষের এই চিঠি।

আর সময় নেই, তাই ফিরে লেখা। প্রদোষ এসেছে। হায়, ছ' মাস আগে যদি আসতো।

কিন্তু তার আর চারা নেই। এ কালো মুখ সে প্রদোষকে দেখাতে পারবে না। প্রদোষ হয়তো সব এখনও শোনে নি—শুনলে তখন ওখন কি ভাববে সে লেখাকে? যদি সে এসে পরে সব শুনে? তার দৃষ্টি লেখা সইতে পারবে না।

প্রদোষের পাঠানো সেই ছড়ির ফাঁসটা সে সন্দেহে পরীক্ষা ক'রলে। তাহলে সে এই ঠিক। এই কাজটুকুই তার ক'রতে হবে।

ভাবনা চিন্তার শক্তি তার লোপ পেল, শুধু ভাবলে ক'রতে হবে। তার পর সে যা ক'রলে সে প্রায় স্বপ্নাবেশে।

দরজা একটা ধরি এনে সে তার বোলানো দড়ির সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধলে খাটের উপর চেয়ার চাপিয়ে। তার পর একটা ফাঁস বেঁধে গলায় প'রলে।

"লেখা—লেখা!" বলে কে ডাকে? প্রদোষ? মরণের মুখে এসে কি স্বপ্ন দেখছে লেখা?

দরজায় ঘা প'ড়ছে দমা দম—চীৎকার হ'চ্ছে "লেখা দোর খোল।"

তার পর প্রচণ্ড পদাঘাতে দুয়ার খুলে গেল। প্রদোষ লেখাকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। তাকে পরীক্ষা করে প্রদোষের মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

প্রদোষ এসেছিল লেখার সঙ্গে দেখা ক'রতে।

সে ডাক্তার ডাকতে নেমে বাড়ী এলো তখনি তার দাদা তাকে জানিয়ে দিলেন যে লেখা বিষে খ'য়েছে নিরঞ্জনকে। তখনি সে চটে ঘটে চিঠিখানা লিখে তাকে পাঠিয়ে দিলে।

পরের দিন সে শুনলে নিরঞ্জনকে নিয়ে মামলার বিস্তৃত খবর। তখনই তার মনে হ'ল যে লেখার এই দুর্দিনে তাকে অমনি শক্ত চিঠি লেখা সঙ্গত হয় নি। না জানি এই মামলায় লেখা কত আত্মগ্লানি ভোগ ক'রছে। তার উপর প্রদোষের এ চিঠি হ'য়েছে চরম নৃশংসতা।

তখনি সে ছুটে গেল তার ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যে।

বেয়ারাকে খবর দেবার কথা ব'লতে সে ব'লে যে লেখা তার দোর বন্ধ ক'রে আছে, হয়তো ঘুমোচ্ছে, কোনও কারণেই যেন তাকে না ডাকা হয়।

প্রদোষ বল্লে, "দোরের বাইরে, দোর থেকে বল যে প্রদোষবাবু এসেছেন—আপনার সঙ্গে দেখা ক'রবেন তিনি।"

তারা কথা ব'লছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। গ্রামের ডেপুটীর জানালা থেকে এক ঝলক লেখার খোলা জানালা দেখিয়ে চীৎকার ক'রে তখন বল্লেন, "কলার গাছ দিয়ে ঝুলে। উনি গলায় দড়ি দিয়েছেন।"

বিদ্যুতের প্রবোধ ও তার পিছু পিছু চাকর বাকর ছুটে গেল তোরণে। প্রবোধ ডাক্তারকে সমাদর ক'রে নেবে নীচে ডেকে নেয়।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় লেখা ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলো। তিন রাত তার শিয়রে ব'সে প্রবোধ তার শুশ্রূষা ক'রতে লাগলো।

তখনও লেখা খুব দুর্বল। তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। প্রবোধ সস্নেহে চোখ মুছিয়ে দিলে। লেখা ব'লে, "কেন তুমি বাঁচালে আমায়? আমার বেঁচে থেকে আর কি লাভ?"

প্রবোধ হেসে ব'লে, "তোমার খুব বেশী লাভ হয় তো হবে না, কিন্তু আমার হবে বড় লাভ।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা ব'লে, "ছ' মাস আগে যদি তুমি আসতে।"

"ছ' মাস কেন অনেক মাস আগে এসে আরও অনেক কষ্ট। কিন্তু আজ তো ভুলেছি। আজকের দিনটা ভুলে পুরোনো লোকসানের হিসাব টানতে রাজী নই আমি।"

"কী বলছ তুমি? এখন আর কী হবে? এখন—এখন তো আমি—পরস্ত্রী।" বলতে লেখা ভেঙে পড়লো।

"সেটা তোমার ভুল লেখা। তোমার সেই যে একটা বিয়ের মত হ'য়েছিল সেটা একবারে শূন্য, কেন না বিয়েতে বর তার আগেই বৌ ক'রে আর একটা বিয়ে ক'রে এসেছিলেন। এ বাড়ির বিয়েতে তোমার বা আমার কোনও লোকসান হয় নি।"

লেখার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, সাগ্রহে সে ব'লে, "সত্যি ব'লছ?"

"নিশ্চয়ই সত্যি। জজ সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত ক'রে এই মর্মে ডিক্রী করাতে হবে তার মুসাবিদা করিয়ে রেখেছি আমি।"

"ঠিক—ঠিক বলছ?" ত্রস্ত কণ্ঠে ব'লে লেখা।

"হ্যাঁ।"

"তাহলে—এই বার সত্যি তুমি আমায় প্রাণ বাঁচালে।"

প্রবোধ তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে ব'লছিল। লেখা দুই হাত বাড়িয়ে তার মুখ টেনে নিলে—প্রবোধ লেখাকে দিল এক দীর্ঘ গভীর চুম্বন। লেখা প্রবোধের দুই হাত নিজের গলায় বেষ্টন করিয়ে ব'লে—এই আমার কণ্ঠহার, এই আমার গলার দড়ি!

কাশ্মীরের স্মৃতি

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

কাশ্মীর সম্বন্ধে আজ একটা মজার কথা মনে হল। ১৯৩৬ সালে [illegible] তখন প্রত্যহ তিন বেলা কেন এক বেলাও পেট ভরে মুক্তির সহিত খেতে পেতাম না। এই পেটটাকে পরিপূর্ণ রাখার জন্য আজে জল মিশিয়ে খেতে হত। এরূপ দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে পিকাডেলীর একটি ঝকঝকে অশ্বাঙ্কিত চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করি এবং তাকে আমার কিছুটা স্বরচিত কাহিনী শুনাই। সেই লোকটি আমার সমস্ত কথা শুনে বলল, "মশাই, যদি আপনি কাশ্মীর সম্বন্ধে আমার গ্রাহকদের কিছু বলতে পারেন, তবে আপনাকে আমি পাঁচ পাউণ্ড দেব। কাশ্মীর আমি গিয়েছিলাম কিনা তাই মাই, সে সম্বন্ধে লোকটি আমাকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করল না। সে নিশ্চয় দেখেছিল ভারতবাসী হয়ে যখন এতগুলি টাকা রোজগার করেছে, অতএব এটা নিশ্চয় যে, সে নিজের দেশের এই দিকটা নিশ্চয়ই দেখেছে। কিন্তু কথা হল তখনও আমি কাশ্মীর দর্শন করি নাই অথবা সে সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হই নাই। এ দিকে হাতের কাছের পাঁচ পাউণ্ড ফেলে যাওয়া রীতিমত কষ্টকর। টপাটপ্ বক্তৃতা দেবে ঠিক করে ফেলাম আসছে রবিবার বিকেল পাঁচটায় কাশ্মীর সম্বন্ধে লেকচার দেব। ম্যানেজার তাতেই রাজী হল।

আমি আনকাম গাওয়ার ষ্ট্রীটে যে সকল ইণ্ডিয়ান বন্ধু করে অথবা যে সকল ইণ্ডিয়ান সেখানে যাওয়া আসা করে তাদের কাছে কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাব না উপরন্তু হাসি ঠাট্টা এবং বিদ্রূপ দ্বারাই আপ্যায়িত হব। সেজন্য তাদের কাছে না যাওয়াই ভাল হবে মনে করে লণ্ডনের একখানা টেলিফোন গাইড সংগ্রহ করে ভ্রমণ সম্বন্ধে কোন প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাই খুঁজতে আরম্ভ করলাম। দেখতে দেখতে ব্রেটেন এলোসিয়েসন্ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম পেলাম এবং দুপুর বেলায় খাওয়ার পর সেখানে ফোন করলাম। সেক্রেটারী জানালেন কাশ্মীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে আজই কালই যেন তাদের অফিসে যাই, কারণ আজই বিকালে একজন ভূগোল কাশ্মীর সম্বন্ধে একটি লেকচার দেবেন।

বিকাল সাড়ে [illegible] সময়। বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, কনকনে [illegible] ঠিক [illegible] মিনিট আগে পৌঁছলাম। ভূগোল মহাশয় তখনও লেকচার শুরু করেন নাই। শ্রোতার সংখ্যা আমাকে নিয়ে [illegible] ছয় জনের মধ্যে শুধু আমার পোষাকই খারাপ ছিল আর সকলের পোষাকই মূল্যবান এবং তাদের দেখলেই ধনী লোক বলেই মনে হত। এদের বসার চেয়ারগুলিও মূল্যবান। আর্মচেয়ার একটি মূল্যবান চেয়ারেই বসতে দেওয়া হয়, কিন্তু কেউ একটী ভ্রুক্ষেপও করে নাই!

লেকচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আরও কয়জন শ্রোতা এলেন। হয়ত তাঁরা [illegible] রিপোর্টার হবেন। তাদের পরিচয় সেক্রেটারীর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম না। এবার আমার পরম ভূগোল মহাশয় তাঁর লেকচার আরম্ভ করলেন। দেখলাম—কেমব্রিজ ইসলাম সম্বন্ধীয় লোকটি শুধু "ইসলাম বিপন্ন" একথাটাই বার বার বলতে আরম্ভ করলেন এবং ইসলাম যে বাস্তবিকই বিপন্ন তাই বলেই লেকচার শেষ করলেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে বক্তার কাছ হতে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হল না।

সভার শেষে বক্তা এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ কিন্তু চুপ করে থাকলেন না। চা-পানের সঙ্গে নানা রকমের কথা প্রসঙ্গ শুরু হতে লাগল। তখন ডুগান মহাশয় কথা বলা শুরু করলেন, "চীনারা তাদের দেশে ভূত্যের ভাবে রাজ্য করছে, এমন কি প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজে তাদের সৈন্যদের ছবি রাখতে বাধ্য করেছে। এদিকে রাশিয়ার জনসাধারণ বাস্তবিকই অবশ্য করে তারা এসে গেছে।"

ডুগান মহাশয় কাশ্মীরে হয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছেন। কাশ্মীরে এসেই তার পিলে চমকে যাবার উপক্রম কারণ এখানেও একদলের লোক দেখতে পেয়েছেন যারা আল্লা ছাড়াও আরও কিছুকে পূজা করে। এসব দেখে তার বক্তৃতা শেষ হবার পর সকলে এসে তার মাথাপিছু হয়েছে।

ডুগান লোকটির কথা শেষ হবার পরই আর একজন ইংরিশম্যান্ কাশ্মীরের সীমান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, তখন আমার বক্তব্য বিষয় নির্ধারণ করে ফেলি এবং সেই সম্পর্কে লেকচার দিয়ে পাঁচ পাউণ্ড পেয়েও ছিলাম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলাম তাহতে আসার পরই আমাকে সর্বপ্রথম কাশ্মীর দেখতেই হবে। ১৯০৬ সালের শেষের দিকে ভারতে ফিরে আসতেছিলাম এবং এরেই সর্বপ্রথম কাশ্মীর যাই ও সেখানকার বিষয়বস্তু চোখে দেখে হই

[illegible] পূর্বের উত্তর দিকে চীনের সিংকিয়াং প্রদেশ তিন চতুর্থাংশ অধিকার করে রয়েছে, বাকি এক চতুর্থাংশ [illegible] আফগানিস্থানের একটা পাহাড়, এই পাহাড় প্রস্থে কোথাও বার মাইল আর কোথাও তিন মাইল। এর পরই হল ফেডারেট রুশিয়ার তাজিকিস্থান।

শ্রীনগর হতে তাজিকিস্থানে যাবার একটি বন্ধুর পথ আছে। সেই পথটি আস্তর, গিলগিট, ইয়াসিন্ হয়ে ডুরাবত্ গিলিয়ারে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখান হতেই আরম্ভ হল আফগান রাজ্য। আফগান রাজ্যের কোন লোক এদিকে বাস করে না, প্রকৃত পক্ষে এটা হল বৃটিশের একটা তালাকী। বহুদিন পর্যন্ত হানটুরু কাশ্মীরেরই [illegible] যাবী [illegible] আফগানের একটা বাফার ষ্টেটের অংশ রেখে দিয়ে রুশিয়ার সংগে "পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যুদ্ধ [illegible] ইহাই ছিল বৃটিশের আসল উদ্দেশ্য। আফগান সরকারও যুদ্ধের রাজা ছাড়তে রাজী না হয়ে [illegible] বহুদিন গিলিয়ারে নিজের কর্তৃত্ব রেখে দিয়ে দুপয়সা রোজগারি করছে বটে কিন্তু আফগান সরকারের [illegible] হাসছে।

[illegible] ভাগে আফগানিস্থানের সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্ত নূতন করে নির্ণয় হয়ে গেছে। তাতে [illegible] বাদ পড়েছে। আব্-ই-পান্জা হতেই আরম্ভ হয়েছে বিবাদের স্থান। অবশ্য বিবাদটা কাগজের লেখায় এবং আফগান সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেজন্য সোভিয়েট সরকারের মাথা ঘামাবার দরকার নাই। যদি কোনদিন আফগান একটু শক্তিশালী হয়ে উঠে তবেই আব্-ই-পান্জা হতে পূর্বদিকে বিস্তারিত হানটুরু [illegible] দাবী করে বসল করবেই। কিন্তু সেই দাবী এবং দখল সবটাই নির্ভর করে "ইসলাম বিপদের উপর"। এখানে "ইসলাম" কথাটার ব্যাপক অর্থ রয়েছে। এই প্রবন্ধে তা বলার বিষয় নয় কারণ এখানে রাজনীতি নিয়ে কিছুই আলোচনা করা হচ্ছে না।

কিন্তু চিন্তা করার বিষয় হল পামীরের সম্বন্ধে। পামীরের কথা কাবুলে থাকার সময় অনেক কিছু শুনেছিলাম। সাড়ে বার হাজার ফুট উঁচে উঠে রুশিয়ানরা কেমন ভাবে গ্রাম স্থাপন করছে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের ঘাঁটি করছে

সুন্দর করে তৈরী করতে তাই বলে অনেকে হিংসায় মরে যাচ্ছিলেন। তারই প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ সরকার গিলগিটে একটি ঘাঁটি তৈরী করে এবং সেখানে যাতে যাতে সৈন্য রাখতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। সেই সৈন্যের দলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান হতে আফ্রিদান পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই।

কাশ্মীর থেকে একটি পাঠানের সঙ্গে পেশোয়ারে চায়ের দোকানে দেখা হয়। সে আমাকে বলেছিল, তবেই পাই বাংগালী স্ত্রীলোক বড়ই সুন্দরী কিন্তু যা চোখে দেখে এলাম তাও ঢেকে রাখা। যদি সেই স্ত্রীলোকগুলি স্বাধীনভাবে থাকে। প্রশ্ন করায় সেই পাঠানটি বলেছিল গিলগিটে ব্রিটিশ সৈন্যরা দলে সে কাজ করে এবং সেদিকের সিয়া শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের প্রায়ই দেখতে পেত। সে স্ত্রীলোকগুলি বড়ই সুন্দরী এবং যদি কোন দিন সুযোগ হয় তবে কয়েক গণ্ডা স্ত্রী সাথে সে নিয়ে আসবেই।

গিলগিটের চারদিকে যে সকল দৌড় ঝাপ করে তাদের শিয়া শ্রেণীর লোক, যারা মোগল, তাদের তুর্কস্থ কাশ্মীরিতে মিশ্রিত। ধর্মটা হল সিয়া। সেজন্য অন্যান্য কাশ্মীরিদের সঙ্গে এদের কোন রূপ সম্পর্ক নাই। সীমান্ত পাঠানরা যখন সিন্ধু নদীর তীর ধরে গিলগিটের দিকে আক্রমণ করল, গিলগিটের চারিদিকের মোগলরা তাদের সমর্থন করা ছাড়া আর অন্যান্য দেখল না। তবুও বলা যায় কাশ্মীর প্রেণীর ডোগরারা পর্বতবাসী পাঠানদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, কারণ পার্বত্য পাঠানরা তাদের স্ত্রীলোক অপহরণ করতে ভয় পায়। এদিকে মুসলীম লীগের বার্ষিক পরিচালিত সংবাদপত্রে শুনিতে পাওয়া যায় কাশ্মীর হিন্দু উদাসীরা পাঠানদের সমর্থন করছে। [illegible] প্রত্যেক লোক বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করব না কারণ গোড়া শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে পাঠানদের কি সম্পর্ক তা আমি ভাল করেই অবগত আছি।

এখান থেকে [illegible] বার মাইল উত্তরে পায়ে হেটে চলে যাই। সেখানে ঘোড়ার সহিস পাওয়া যায়। নিজেদের ঘোড়া দেখে অবাক হতে হয়েছিল। একজন কাশ্মীরি মুসলমান কে [illegible] সাহায্যে একটি পাহাড় পর্বত সঙ্কল্প হয়। পাহাড়টি বেয়েই সেটার গলা কেটে ফেলে। কাশ্মীরি ছেলেটির হয়ত তার কাজ দেখে দেখে নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন হাজরা তা দেখে ফেলে এবং ছেলেটির মাথায় ঘাঁটি ঘাড় এমনি ভাবে আঘাত করে যে সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। হাজরা শ্রেণীর মুসলমানরা পাহাড়কে [illegible] বলে মনে করে। সেই [illegible] যে হত্যা করে তাতে হত্যা বলে কোন পাপ নাই এটাই হল তাদের ধারণা। এ [illegible] আমার ভাগ্যে মিলন বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।

কাশ্মীর হতে আরও দুটি পথ চীনের দিকে গিয়েছে। একটী আসছে লেহ এবং অন্যটি আসছে শ্রীনগর হতে। উভয় পথ গ্রীষ্মকাল ব্যতীত বিপদসঙ্কুল হয়ে তাকলামাকানের দিকে চলেছে। [illegible] পথ ইয়ারকন্দ হতে খাসগড় গিয়েছে। ব্রীজ হতে হোয়াইট ওয়াটার পর্যন্ত চলেছে গিরিবর্ত্মের ভেতর দিয়ে [illegible] পরই আরম্ভ হয়েছে উক্ত পথ। চীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের ইহা [illegible] পথ। [illegible] আমদানীর আকাঙ্ক্ষা উভয়ই বজায় রয়েছে।

গিলগিট দিয়ে তাঘিকিস্তানে যে পথটি গিয়েছে সেই পথটির দিকে বৃটিশের তেমন দৃষ্টি [illegible] খাসগড় শ্রীনগর পথের দিকে কারণ এই পথ ধরে চীনারা কাশ্মীরে প্রায়ই ব্যবসা আসা করে এবং এদিক যে সকল লোক বাস করে তারা সকলেই সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকায় অধিবাসী ছিল। মৌলবী [illegible] উপায় এবং রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে উত্তম। একদিকে খাসগড়ী রুশোন এবং অন্যদিকে [illegible] যাতে এরা অন্য বিষয় করে সেদিকেও বৃটিশের লক্ষ্য ছিল এবং তাতে [illegible] কার্য [illegible] কথা হল সিংকিয়াংয়ের পলিটিসের উপরই সকল বিষয়ের নির্ভর করত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সিকিয়াং প্রদেশ সোভিয়েট রুশের প্রভাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং [illegible] সোভিয়েট ভাবাপন্ন হয়েও ছিলেন। সোভিয়েট প্রভাব বজায় থাকায় ব্রোয়াইট কারনালিজ [illegible] পক্ষে প্রায়ই বিপদজনক ছিল। পলিটিকেল ডাকাতি, রাহাজানি এবং হাঙ্গামা চলত, সেজন্য ভারতের [illegible] অধিবাসীরা একবার বৃটিশসরকারের কাছে আবেদনও করেছিল কিন্তু আবেদনের ফল কিছুই পায় নাই।

[illegible] করার পর চীনের সাথে রুশিয়ার যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি অনুযায়ী সোভিয়েট রুশিয়া সিকিমের প্রতি একটা [illegible] সরে পড়তে বাধ্য হয় এবং কমিউনিষ্টরাও সোভিয়েট রুশের মুখের জন্য তাদের [illegible] করতে পারে না। এর পর থেকে খাসড়ে [illegible] অনেকটা নিরাপদ হয়ে যায়। লোক বসবাস করার [illegible] আসা করতে থাকে।

[illegible] আফগানিস্থানের সংগে সোভিয়েট রুশের [illegible] উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং [illegible] চিত্রের বিশেষত্ব একেবারে কমে গেছে। চিত্রের ঠিক উত্তর পূর্ব দিকে সোভিয়েট রুশিয়ার [illegible] সাথে সীমান্ত গিয়ে মিলেছে বলে উচ্চতার দিক দিয়েও বেশী। সেদিক দিয়ে আদিম যুগের [illegible] করা সম্ভবপর হয় না। [illegible] চিত্রের উত্তর পূর্ব সীমান্ত পাঠানদের [illegible] এবং এখনও বন্ধ আছে। [illegible] কোন ইউরোপীয়ানকে সেদিকে গিয়ে পা [illegible] দেয় না। যদি [illegible] তবে তারা কোন [illegible] ফিরিয়ে দিয়ে কুয়েনলুন [illegible] চলে যাবে।

[illegible] যদি ভবিষ্যতে কোন [illegible] অথবা ইউরোপিয়ান যদি [illegible] সোভিয়েট রুশিয়া [illegible] করতে চায় তবে [illegible] বন্ধ। [illegible] চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের [illegible] প্রবেশ করে। ইটিশ্বর এই [illegible] ছিল। [illegible] কোটির কুংপানলাভ ইটিশকে সে ভরসা দিয়েছিল এবং কুংপানের সর্দার [illegible] সাহায্যের [illegible] এসেও ছিলেন। আমি তখন কাশ্মীরে [illegible] এবং কুংপানের সংগে পরিচিত [illegible]। [illegible] মোহাম্মদ তখন কাশ্মীর মহারাজের অতিথি কি ইটিশ রিজেন্সির অতিথি ছিলেন তা বলা [illegible] তবে তিনি কাশ্মীর ত্যাগ করেকমাস আগেই [illegible] গিয়েছিলেন।

[illegible] আছে তারমধ্যে যাইবার পাস্ [illegible] পাস এবং বড়দিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত [illegible] একটি মাত্র পাস্ যার কোন [illegible] নাই এবং যা কাশ্মীরের কেন্দ্র থেকে [illegible] হয়ে। এই [illegible] যদি [illegible] তবে তা উত্তর পশ্চিম যার দিয়েছিলেন, [illegible] হয়।

[illegible] নন্দিরানের দিকে এ সব [illegible] চিন্তা করার মত কিছুই ছিল না। [illegible] কাশ্মীরকে আমরা কর্দমাক্ত বলি, সেখানে গিয়ে যারা আমরা কিছু দেখতে [illegible] হয়, যার কথা লোকে বলে শেষ করতে পারে না, লেক্টাটস্ বোট হাউস কথা আমরা মনে করতেই [illegible] তাই কাজল কি? সেটা আমার ব্যক্তিগত দোষ না [illegible] অন্তত না। [illegible] ঘরে বসে [illegible] তখন দেখা যায় [illegible] বাগচীর [illegible] [illegible] এই অবস্থা [illegible] তিনি বললেন, [illegible] দেখে [illegible] [illegible] কেবলমাত্র [illegible] তবে কাশ্মীরের [illegible] [illegible] ভাবটা মনের মধ্যে [illegible] [illegible] তুলনা [illegible] তা কি [illegible]?" আমিও ভাবলাম, তাই ত!